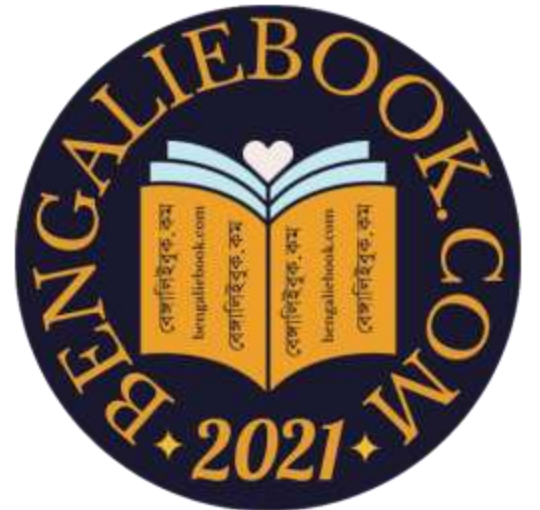


প্রবন্ধ

শিক্ষা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



সূচিপত্র

• শিক্ষার হেরফের	2
• শিক্ষা-সংস্কার	16
• শিক্ষাসমস্যা	22
• জাতীয় বিদ্যালয়	41
• সংযোজন	64
• পরিশিষ্ট	185

শিক্ষার হ্রাসের

রাজসাহী অ্যাসোসিয়েশনে পঠিত

[আমাদের বঙ্গসাহিত্যে নানা অভাব আছে সন্দেহ নাই; দর্শন বিজ্ঞান এবং বিবিধ শিক্ষণীয় বিষয় এ পর্যন্ত বঙ্গভাষায় যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশিত হয় নাই; এবং সেই কারণে রীতিমত শিক্ষালাভ করিতে হইলে বিদেশীয় ভাষার সাহায্য গ্রহণ করা ব্যতীত উপায়ান্তর দেখা যায় না। কিন্তু আমার অনেক সময় মনে হয় সেজন্য আক্ষেপ পরে করিলেও চলে, আপাতত শিশুদের পাঠ্যপুস্তক দুই চারিখানি না পাইলে নিতান্ত অচল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বর্ণবোধ, শিশুশিক্ষা এবং নীতিপুস্তকের অভাব নাই, কিন্তু তাহাকে আমি শিশুদিগের পাঠ্যপুস্তক বলি না।

পৃথিবীর পুস্তকসাধারণকে পাঠ্যপুস্তক এবং অপাঠ্যপুস্তক, প্রধানত এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। টেক্সট বুক কমিটি হইতে যে-সকল গ্রন্থ নির্বাচিত হয় তাহাকে শেষোক্ত শ্রেণীতে গণ্য করিলে অন্যায় বিচার করা হয় না।

কেহ-বা মনে করেন আমি শুদ্ধমাত্র পরিহাস করিতেছি। কমিটি দ্বারা দেশের অনেক ভালো হইতে পারে; তেলের কল, সুরকির কল, রাজনীতি এবং বারোয়ারি পূজা কমিটির দ্বারা চালিত হইতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু এ পর্যন্ত এ দেশে সাহিত্য সম্পর্কীয় কোনো কাজ কমিটির দ্বারা সুসম্পন্ন হইতে দেখা যায় নাই। মা সরস্বতী যখন ভাগের মা হইয়া দাঁড়ান তখন তাঁহার সদগতি হয় না। অতএব কমিটি-নির্বাচিত গ্রন্থগুলি যখন সর্বপ্রকার সাহিত্যরসবর্জিত হইয়া দেখা দেয় তখন কাহার দোষ দিব। আখমাড়া কলের মধ্য দিয়া যে-সকল ইক্ষুদণ্ড বাহির হইয়া আসে তাহাতে কেহ রসের প্রত্যাশা করে না; 'সুকুমারমতি'হীনবুদ্ধি শিশুরাও নহে।

অতএব, কমিটিকে একটি অবশ্যম্ভাবী অদৃষ্টবিড়ম্বনাস্বরূপ জ্ঞান করিয়া তৎসম্বন্ধে কোনো প্রসঙ্গ উত্থাপন না করিলেও সাধারণত বিদ্যালয়ে ব্যবহার্য পুস্তকগুলিকে পাঠ্যপুস্তক-শ্রেণী হইতে বহির্ভূত করা যাইতে পারে। ব্যাকরণ, অভিধান, ভূগোলবিবরণ এবং নীতিপাঠ পৃথিবীর পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না, তাহারা কেবলমাত্র শিক্ষাপুস্তক।]

যতটুকু অত্যাৱশ্যক কেবল তাহারই মধ্যে কারারুদ্ধ হইয়া থাকা মানবজীবনের ধর্ম নহে। আমরা কয়ৎপরিমাণে আবশ্যকশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া থাকি এবং কয়ৎপরিমাণ স্বাধীন। আমাদের দেহ সাড়ে তিন হাতের মধ্যে বদ্ধ, কিন্তু তাই বলিয়া ঠিক সেই সাড়ে তিন হাত পরিমাণ গৃহ নির্মাণ করিলে চলে না। স্বাধীন চলাফেরার জন্য অনেকখানি স্থান রাখা আবশ্যক, নতুবা আমাদের স্বাস্থ্য এবং আনন্দের ব্যাঘাত হয়। শিক্ষা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। যতটুকু কেবলমাত্র শিক্ষা অর্থাৎ অত্যাৱশ্যক তাহারই মধ্যে শিশুদিগকে একান্ত নিবদ্ধ রাখিলে কখনোই তাহাদের মন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে না। অত্যাৱশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হইতে পারে না—বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে সে অনেকটা পরিমাণে বালক থাকিয়াই যায়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের হাতে কিছুমাত্র সময় নাই। যত শীঘ্র পারি বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া পাস দিয়া কাজে প্রবিষ্ট হইতে হইবে। কাজেই শিশুকাল হইতে উর্ধ্বশ্বাসে দ্রুতবেগে, দক্ষিণে বামে দৃকপাত না করিয়া পড়া মুখস্থ করিয়া যাওয়া ছাড়া আর কোনো কিছুই সময় পাওয়া যায় না। সুতরাং ছেলেদের হাতে কোনো শখের বই দেখিলেই সেটা তৎক্ষণাৎ ছিনাইয়া লইতে হয়।

শখের বই জুটিবেই বা কোথা হইতে। বাংলায় সেরূপ গ্রন্থ নাই। এক রামায়ণ মহাভারত আছে, কিন্তু ছেলেদের এমন করিয়া বাংলা শেখানো হয় না যাহাতে তাহারা আপন ইচ্ছায় ঘরে বসিয়া কোনো বাংলা কাব্যের যথার্থ স্বাদ গ্রহণ করিতে পারে। আবার দুর্ভাগারা ইংরেজিও এতটা জানে না যাহাতে ইংরেজি বাল্যগ্রন্থের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে। বিশেষত শিশুপাঠ্য ইংরেজি গ্রন্থ এরূপ খাস শিক্ষার হেরফের ইংরেজি, তাহাতে এত ঘরের গল্প ঘরের কথা যে, বড়ো বড়ো বি. এ. এম. এ.-দের পক্ষেও তাহা সকল সময় সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তগম্য হয় না।

কাজেই বিধির বিপাকে বাঙালির ছেলের ভাগ্যে ব্যাকরণ অভিধান এবং ভূগোলবিবরণ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। বাঙালির ছেলের মতো এমন হতভাগ্য আর কেহ নাই। অন্য দেশের ছেলেরা যে-বয়সে নবোদগত দন্তে আনন্দমনে ইক্ষু চর্বণ করিতেছে, বাঙালির ছেলে তখন ইক্ষুলের বেঞ্চির উপর কোঁচাসমেত দুইখানি শীর্ণ খর্ব চরণ দোদুল্যমান করিয়া শুদ্ধমাত্র বেত হজম করিতেছে, মাষ্টারের কটু গালি ছাড়া তাহাতে আর কোনোরূপ মসলা মিশানো নাই।

তাহার ফল হয় এই, হজমের শক্তিটা সকল দিক হইতে হ্রাস হইয়া আসে। যথেষ্ট খেলাধুলা এবং উপযুক্ত আহারাভাবে বঙ্গসন্তানের শরীরটা যেমন অপুষ্ট থাকিয়া যায়, মানসিক পাকযন্ত্রটাও তেমনি পরিণতি লাভ করিতে পারে না। আমরা যতই বি. এ. এম. এ. পাস করিতেছি, রাশি রাশি বই গিলিতেছি, বুদ্ধিবৃত্তিটা তেমন বেশ বলিষ্ঠ এবং পরিপক্ব হইতেছে না। তেমন মুঠা করিয়া কিছু ধরিতে পারিতেছি না, তেমন আদ্যোপান্ত কিছু গড়িতে পারিতেছি না, তেমন জোরের সহিত কিছু দাঁড় করাইতে পারিতেছি না। আমাদের মতামত কথাবার্তা এবং আচার-অনুষ্ঠান ঠিক সাবালকের মতো নহে। সেইজন্য আমরা অত্যাঙ্কি আড়ম্বর এবং আশ্ফালনের দ্বারা আমাদের মানসিক দৈন্য ঢাকিবার চেষ্টা করি।

ইহার প্রধান কারণ, বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা-কিছু নিতান্ত আবশ্যিক তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমন করিয়া কোনোমতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু বিকাশলাভ হয় না। হাওয়া খাইলে পেট ভরে না, আহার করিলে পেট ভরে, কিন্তু আহারটি রীতিমত হজম করিবার জন্য হাওয়া খাওয়ার দরকার। তেমনই একটা শিক্ষাপুস্তককে রীতিমত হজম করিতে অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তকের সাহায্য আবশ্যিক। আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে; গ্রহণশক্তি ধারণাশক্তি চিন্তাশক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে বললাভ করে।

কিন্তু এই মানসিকশক্তি-হ্রাসকারী নিরানন্দ শিক্ষার হাত বাঙালি কী করিয়া এড়াইবে, কিছুতেই ভাবিয়া পাওয়া যায় না।

এক তো, ইংরেজি ভাষাটা অতিমাত্রায় বিজাতীয় ভাষা। শব্দবিন্যাস পদবিন্যাস সম্বন্ধে আমাদের ভাষার সহিত তাহার কোনোপ্রকার মিল নাই। তাহার পরে আবার ভাববিন্যাস এবং বিষয়-প্রসঙ্গও বিদেশী। আগাগোড়া কিছুই পরিচিত নহে, সুতরাং ধারণা জন্মিবার পূর্বেই মুখস্থ অঙ্গস্ত করিতে হয়। তাহাতে না চিবাইয়া গিলিয়া খাইবার ফল হয়। হয়তো কোনো-একটা শিশুপাঠ্য রীডারে haymaking সম্বন্ধে একটা আখ্যান আছে, ইংরেজ ছেলের নিকট সে-ব্যাপারটা অত্যন্ত পরিচিত, এইজন্য বিশেষ আনন্দদায়ক; অথবা snowball খেলায় Charlie এবং Katie র মধ্যে যে কিরূপ বিবাদ ঘটয়াছিল তাহার ইতিহাস ইংরেজ-সন্তানের নিকট অতিশয় কৌতুকজনক, কিন্তু আমাদের ছেলেরা যখন বিদেশী ভাষায় সেগুলো পড়িয়া যায় তখন তাহাদের মনে কোনোরূপ স্মৃতির উদ্রেক হয় না, মনের সম্মুখে ছবির মতো কিছু দেখিতে পায় না, আগাগোড়া অন্ধভাবে হাতড়াইয়া চলিতে হয়।

আবার নীচের ক্লাসে সে-সকল মাস্টার পড়ায় তাহারা কেহ এট্রেন্স পাস, কেহ বা এট্রেন্স ফেল, ইংরেজি ভাষা ভাব আচার ব্যবহার এবং সাহিত্য তাহাদের নিকট কখনোই সুপরিচিত নহে। তাহারাই ইংরেজির সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় সংঘটন করাইয়া থাকে। তাহারা না জানে ভালো বাংলা, না জানে ভালো ইংরেজি; কেবল তাহাদের একটা সুবিধা এই যে, শিশুদিগকে শিখানো অপেক্ষা ভুলানো ঢের সহজ কাজ, এবং তাহাতে তাহারা সম্পূর্ণ কৃতকার্যতা লাভ করে।

বেচারাদের দোষ দেওয়া যায় না। Horse is a noble animal—বাংলায় তর্জমা করিতে গেলে বাংলারও ঠিক থাকে না, ইংরেজিও ঘোলাইয়া যায়। কথাটা কেমন করিয়া প্রকাশ করা যায়। ঘোড়া একটি মহৎ জন্তু, ঘোড়া অতি উঁচুদরের জানোয়ার, ঘোড়া জন্তুটা খুব ভালো—কথাটা কিছুতেই তেমন মনঃপূতরকম হয় না, এমন স্থলে গোঁজামিলন দেওয়াই সুবিধা। আমাদের প্রথম ইংরেজি শিক্ষায় এইরূপ কত গোঁজামিলন চলে তাহার আর সীমা নাই। ফলত অল্পবয়সে আমরা যে ইংরেজিটুকু শিখি তাহা এত যৎসামান্য এবং এত ভুল যে, তাহার ভিতর হইতে কোনোপ্রকারের রস আকর্ষণ করিয়া লওয়া বালকদের পক্ষে অসম্ভব হয়—কেহ তাহা প্রত্যাশাও করে না। মাস্টারও বলে ছাত্রও বলে, আমার রসে কাজ নাই, টানিয়া-বুনিয়া কোনোমতে একটা অর্থ বাহির করিতে পারিলে এ যাত্রা বাঁচিয়া যাই, পরীক্ষায় পাস হই; আপিসে চাকরি জোটে। সচরাচর যে-অর্থটা বাহির হয় তৎসম্বন্ধে শঙ্করাচার্যের এই বচনটি খাটে :

অর্থমনর্থং ভাবর নিত্যং

নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্।

অর্থকে অনর্থ বলিয়া জানিয়া, তাহাতে সুখও নাই এবং সত্যও নাই।

তবে ছেলেদের ভাগ্যে বাকি রহিল কী। যদি কেবল বাংলা শিখিত তবে রামায়ণ মহাভারত পড়িতে পাইত; যদি কিছুই না শিখিত তবে খেলা করিবার অবসর থাকিত, গাছে চড়িয়া, জলে বাঁপাইয়া, ফুল ছিঁড়িয়া প্রকৃতি জননীর উপর সহস্র দৌরাত্ম্য করিয়া শরীরের পুষ্টি, মনের উল্লাস এবং বাল্যপ্রকৃতির পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিত। আর ইংরেজি শিখিতে গিয়া না হইল শেখা না হইল খেলা, প্রকৃতির সত্যরাজ্যে প্রবেশ করিবারও অবকাশ থাকিল না, সাহিত্যের কল্পনারাজ্যে প্রবেশ করিবারও দ্বার রুদ্ধ রহিল। অন্তরে এবং বাহিরে যে-দুইটি উদার এবং উন্মুক্ত বিহারক্ষেত্র আছে, মনুষ্য যেখান হইতে জীবনবল এবং স্বাস্থ্য সঞ্চয় করে, যেখানে নানা

বর্ণ নানা রূপ নানা গন্ধ, বিচিত্র গতি এবং গীতি, প্রীতি ও প্রফুল্লতা সর্বদা হিল্লোলিত হইয়া আমাদের সর্বাস্বেদন এবং সম্পূর্ণ বিকশিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে সেই দুই মাতৃভূমি হইতে নির্বাসিত করিয়া হতভাগ্য শিশুদিগকে কোন্ বিদেশী কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। ঈশ্বর যাহাদের জন্য পিতামাতার হৃদয়ে স্নেহ সঞ্চয় করিয়াছেন, জননীর কোল কোমল করিয়া দিয়াছেন, যাহারা আকারে ক্ষুদ্র তবু সমস্ত গৃহের সমস্ত শূন্য অধিকার করিয়াও তাহাদের খেলার জন্য যথেষ্ট স্থান পায় না তাহাদিগকে কোথায় বাল্য যাপন করিতে হয়; বিদেশী ভাষার ব্যাকরণ এবং অভিধানের মধ্যে। যাহার মধ্যে জীবন নাই, আনন্দ নাই, অবকাশ নাই, নবীনতা নাই, নড়িয়া বসিবার এক তিল স্থান নাই, তাহারই অতি শুষ্ক কঠিন সংকীর্ণতার মধ্যে। ইহাতে কি সে-ছেলের কখনো মানসিক পুষ্টি, চিত্তের প্রসার, চরিত্রের বলিষ্ঠতা লাভ হইতে পারে। সে কি একপ্রকার পাণ্ডুবর্ণ রক্তহীন শীর্ণ অসম্পূর্ণ হইয়া থাকে না। সে কি বয়ঃপ্রাপ্তিকালে নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া কিছু বাহির করিতে পারে, নিজের বল খাটাইয়া বাধা অতিক্রম করিতে পারে, নিজের স্বাভাবিক তেজে মস্তক উন্নত করিয়া রাখিতে পারে। সে কি কেবল মুখস্থ করিতে, নকল করি এবং গোলামি করিতে শেখে না।

এক বয়স হইতে আর-এক বয়স পর্যন্ত একটা যোগ আছে। যৌবন যে বাল্যকাল হইতে ক্রমশ পরিণত হইয়া উঠে এ কথা নূতন করিয়া বলাই বাহুল্য। যৌবনে সহসা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াই যখন যাহা আবশ্যিক অমনি যে হাতের কাছে পাওয়া যায় তাহা নহে—জীবনের যথার্থ নির্ভরযোগ্য এবং একান্ত আবশ্যিক জিনিস হস্তপদের মতো আমাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া উঠিতে থাকে। তাহারা কোনো প্রস্তুত সামগ্রীর মতো নহে যে, প্রয়োজনের সময়ে অথবা আকারে বাজার হইতে কিনিতে পারা যাইবে।

চিন্তাশক্তি এবং কল্পনাশক্তি জীবনযাত্রা নির্বাহের পক্ষে দুইটি অত্যাৱশ্যক শক্তি তাহাতে অঙ্গ সন্দেহ নাই। অর্থাৎ যদি মানুষের মতো মানুষ হইতে হয় তবে ঐ দুটা পদার্থ জীবন হইতে বাদ দিলে চলে না। অতএব বাল্যকাল হইতে চিন্তা ও কল্পনার চর্চা না করিলে কাজের সময় যে তাহাকে হাতের কাছে পাওয়া যাইবে না এ কথা অতি পুরাতন।

কিন্তু আমাদের বর্তমান শিক্ষায় সে পথ একপ্রকার রুদ্ধ। আমাদের বহুকাল পর্যন্ত শুদ্ধমাত্র ভাষাশিক্ষায় ব্যাপ্ত থাকিতে হয়। পূর্বেই বলিয়াছি ইংরেজি এতই বিদেশীয় ভাষা এবং আমাদের শিক্ষকেরা সাধারণত এত অল্পশিক্ষিত যে, ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ভাব আমাদের মনে

সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। এইজন্য ইংরেজি ভাবের সহিত ক্রিয়ৎপরিমাণে পরিচয় লাভ করিতে আমাদের দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হয় এবং ততক্ষণ আমাদের চিন্তাশক্তি নিজের উপযুক্ত কোনো কাজ না পাইয়া নিতান্ত নিশ্চেষ্টভাবে থাকে। এট্রেন্স এবং ফাস্ট-আর্টস পর্যন্ত কেবল চলনসই রকমের ইংরেজি শিখিতেই যায়; তার পরেই সহসা বি. এ. ক্লাসে বড়ো বড়ো পুঁথি এবং গুরুতর চিন্তাসাধ্য প্রসঙ্গ আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দেওয়া হয়—তখন সেগুলো ভালো করিয়া আয়ত্ত করিবার সময়ও নাই শক্তিও নাই—সবগুলো মিলাইয়া এক-একটা বড়ো বড়ো তাল পাকাইয়া একেবারে এক-এক গ্রাসে গিলিয়া ফেলিতে হয়।

যেমন যেমন পড়িতেছি অমনি সঙ্গে সঙ্গে ভাবিতেছি না, ইহার অর্থ এই যে, স্তূপ উঁচা করিতেছি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নির্মাণ করিতেছি না। ইঁটসুরকি, কড়িবরগা, বালিচুন, যখন পর্বতপ্রমাণ উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে এমন সময় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে হুকুম আসিল একটা তেতালার ছাদ প্রস্তুত করো। অমনি আমরা সেই উপকরণ স্তূপের শিখরে চড়িয়া দুই বৎসর ধরিয়া পিটাইয়া তাহার উপরিভাগ কোনোমতে সমতল করিয়া দিলাম, কতকটা ছাদের মতো দেখিতে হইল। কিন্তু ইহাকে কি অট্টালিকা বলে। ইহার মধ্যে বায়ু এবং আলোক প্রবেশ করিবার কি কোনো পথ আছে, ইহার মধ্যে মনুষ্যের চিরজীবনের বাসযোগ্য কি কোনো আশ্রয় আছে, ইহা কি আমাদের বহিঃসংসারের প্রখর উত্তাপ এবং অনাবরণ হইতে রীতিমত রক্ষা করিতে পারে, ইহার মধ্যে কি কোনো একটা শৃঙ্খলা সৌন্দর্য এবং সুষমা দেখিতে পাওয়া যায়।

মালমসলা যাহা জড়ো হইতেছে তাহা প্রচুর তাহার আর সন্দেহ নাই; মানসিক অট্টালিকা নির্মাণের উপযুক্ত এত ইঁট পাটকেল পূর্বে আমাদের আয়ত্তের মধ্যে ছিল না। কিন্তু সংগ্রহ করিতে শিখিলেই যে নির্মাণ করিতে শেখা হইল ধরিয়া লওয়া হয়, সেইটেই একটা মস্ত ভুল। সংগ্রহ এবং নির্মাণ যখন একই সঙ্গে অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতে থাকে তখনই কাজটা পাকা রকমের হয়।

অর্থাৎ সংগ্রহযোগ্য জিনিসটা যখনই হাতে আসে তখনই তাহার ব্যবহারটি জানা, তাহার প্রকৃত পরিচয়টি পাওয়া, জীবনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের আশ্রয়স্থলটি গড়িয়া তোলাই রীতিমত শিক্ষা। মানুষ এক দিকে বাড়িতেছে আর তাহার বিদ্যা আর এক দিকে জমা হইতেছে, খাদ্য এক দিকে ভাণ্ডারকে ভারাক্রান্ত করিতেছে, পাকযন্ত্র আর-এক দিকে আপনার জারকরসে আপনাকে জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে—আমাদের দেশে এই একপ্রকার অভূতপূর্ব কাণ্ড চলিতেছে।

অতএব ছেলে যদি মানুষ করিতে চাই, তবে ছেলেবেলা হইতেই তাহাকে মানুষ করিতে আরম্ভ করিতে হইবে, নতুবা সে ছেলেই থাকিবে, মানুষ হইবে না। শিশুকাল হইতেই কেবল স্মরণশক্তির উপর সমস্ত ভর না দিয়া সঙ্গে সঙ্গে যথাপরিমাণে চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তির স্বাধীন পরিচালনার অবসর দিতে হইবে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কেবলই লাঙল দিয়া চাষ এবং মই দিয়া ঢেলাভাঙা, কেবলই ঠেঙা লাঠি, মুখস্থ এবং একজামিন-আমাদের এই 'মানব-জনম' আমাদের পক্ষে আমাদের এই দুর্লভ ক্ষেত্রে সোনা ফলাইবার পক্ষে, যথেষ্ট নহে। এই শুষ্ক ধূলির সঙ্গে এই অবিশ্রাম কর্ষণ-পীড়নের সঙ্গে রস থাকা চাই। কারণ মাটি যত সরস থাকে ধান তত ভালো হয়। তাহার উপর আবার এক-একটা বিশেষ সময় আসে যখন ধান্যক্ষেত্রের পক্ষে বৃষ্টি বিশেষরূপে আবশ্যিক। সে-সময়টি অতিক্রম হইয়া গেলে হাজার বৃষ্টি হইলেও আর তেমন সুফল ফলে না, বয়োবিকাশেরও তেমনই একটা বিশেষ সময় আছে যখন জীবন্ত ভাব এবং নবীন কল্পনাসকল জীবনের পরিণতি এবং সরসতা সাধনের পক্ষে অত্যাবশ্যিক। ঠিক সেই সময়টিতে যদি সাহিত্যের আকাশ হইতে খুব এক পশলা বর্ষণ হইয়া যায় তবে 'ধন্য রাজা পুণ্য দেশ'। নবোদ্ভিন্ন হৃদয়াকুরগুলি যখন অন্ধকার মাতৃভূমি হইতে বিপুল পৃথিবী এবং অনন্ত নীলাম্বরের দিকে প্রথম মাথা তুলিয়া দেখিতেছে, প্রচ্ছন্ন জন্মান্তঃপুরের দ্বারদেশে আসিয়া বহিঃসংসারের সহিত তাহার নূতন পরিচয় হইতেছে, যখন নবীন বিস্ময়, নবীন প্রীতি, নবীন কৌতূহল চারি দিকে আপন শীর্ষ প্রসারণ করিতেছে, তখন যদি ভাবের সমীরণ এবং চিরানন্দলোক হইতে আলোক এবং আশীর্বাদধারা নিপতিত হয়, তবেই তাহার সমস্ত জীবন যথাকালে সফল সরস এবং পরিণত হইতে পারে; কিন্তু সেই সময় যদি কেবল শুষ্ক ধূলি এবং তপ্ত বালুকা, কেবল নীরস ব্যাকরণ এবং বিদেশী অভিধান তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে তবে পরে মুষলধারায় বর্ষণ হইলেও যুরোপীয় সাহিত্যের নব নব জীবন্ত সত্য, বিচিত্র কল্পনা এবং উন্নত ভাবসকল লইয়া দক্ষিণে বামে ফেলাছড়া করিলেও সে আর তেমন সফলতা লাভ করিতে পারে না, সাহিত্যের অন্তর্নিহিত জীবনীশক্তি আর তাহার জীবনের মধ্যে তেমন সহজভাবে প্রকাশ করিতে পারে না।

আমাদের নীরস শিক্ষায় জীবনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ অতীত হইয়া যায়। আমরা বাল্য হইতে কৈশোর এবং কৈশোর হইতে যৌবনে প্রবেশ করি কেবল কতকগুলো কথার বোঝা টানিয়া।

সরস্বতীর সাম্রাজ্যে কেবলমাত্র মজুরি করিয়া মরি, পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড বাঁকিয়া যায় এবং মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হয় না। যখন ইংরেজি ভাষারাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করি তখন আর সেখানে তেমন যথার্থ অন্তরঙ্গের মতো বিহার করিতে পারি না। যদি বা ভাবগুলা একরূপ বুঝিতে পারি কিন্তু সেগুলাকে মর্মস্থলে আকর্ষণ করিয়া লইতে পারি না; বক্তৃতায় এবং লেখায় ব্যবহার করি, কিন্তু জীবনের কার্যে পরিণত করিতে পারি না।

এইরূপে বিশ-বাইশ বৎসর ধরিয়া আমরা যে-সকল ভাব শিক্ষা করি আমাদের জীবনের সহিত তাহার একটা রাসায়নিক মিশ্রণ হয় না বলিয়া আমাদের মনের ভারি একটা অদ্ভুত চেহারা বাহির হয়। শিক্ষিত ভাবগুলি কতক আটা দিয়া জোড়া থাকে, কতক কালক্রমে ঝরিয়া পড়ে। অসভ্যেরা যেমন গায়ে রঙ মাখিয়া উলকি পরিয়া পরম গর্ব অনুভব করে, স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের উজ্জ্বলতা এবং লাভ্য আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, আমাদের বিলাতি বিদ্যা আমরা সেইরূপ গায়ের উপর লেপিয়া দস্তভরে পা ফেলিয়া বেড়াই, আমাদের যথার্থ আন্তরিক জীবনের সহিত তাহার অল্পই যোগ থাকে। অসভ্য রাজারা যেমন কতকগুলো সস্তা বিলাতি কাচখণ্ড পুঁতি প্রভৃতি লইয়া শরীরের যেখানে সেখানে ঝুলাইয়া রাখে এবং বিলাতি সাজসজ্জা অযথাস্থানে বিন্যাস করে, বুঝিতেও পারে না কাজটা কিরূপ অদ্ভুত এবং হাস্যজনক হইতেছে, আমরাও সেইরূপ কতকগুলো সস্তা চকচকে বিলাতি কথা লইয়া ঝলমল করিয়া বেড়াই এবং বিলাতি বড়ো বড়ো ভাবগুলি লইয়া হয়তো সম্পূর্ণ অযথাস্থানে অসংগত প্রয়োগ করি, আমরা নিজেও বুঝিতে পারি না অজ্ঞাতসারে কী একটা অপূর্ব প্রহসন অভিনয় করিতেছি এবং কাহাকেও হাসিতে দেখিলে তৎক্ষণাৎ যুরোপীয় ইতিহাস হইতে বড়ো বড়ো নজির প্রয়োগ করিয়া থাকি।

বাল্যকাল হইতে যদি ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাবশিক্ষা হয় এবং ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জীবনযাত্রা নিয়মিত হইতে থাকে তবেই আমাদের সমস্ত জীবনের মধ্যে একটা যথার্থ সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে, আমরা বেশ সহজ মানুষের মতো হইতে পারি এবং সকল বিষয়ের একটা যথাযথ পরিমাণ ধরিতে পারি।

যখন আমরা একবার ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখি যে, আমরা যে-ভাবে জীবন-নির্বাহ করিব আমাদের শিক্ষা তাহার আনুপাতিক নহে; আমরা যে-গৃহে আমৃত্যুকাল বাস করিব সে-গৃহের উন্নতচিত্র আমাদের পাঠ্যপুস্তকে নাই; যে-সমাজের মধ্যে আমরা গণ্য জন্ম যাপন করিতে হইবে সেই সমাজের কোনো উচ্চ আদর্শ আমাদের নূতন শিক্ষিত সাহিত্যের মধ্যে লাভ করি

না; আমাদের পিতা মাতা আমাদের সুহৃৎ বন্ধু, আমাদের ভ্রাতা ভগ্নীকে তাহার মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখি না; আমাদের দৈনিক জীবনের কার্যকলাপ তাহার বর্ণনার মধ্যে কোনো স্থান পায় না; আমাদের আকাশ এবং পৃথিবী, আমাদের নির্মল প্রভাত এবং সুন্দর সন্ধ্যা, আমাদের পরিপূর্ণ শস্যক্ষেত্র এবং দেশলক্ষ্মী স্রোতস্বিনীর কোনো সংগীত তাহার মধ্যে ধ্বনিত হয় না; তখন বুঝিতে পারি আমাদের শিক্ষার সহিত আমাদের জীবনের তেমন নিবিড় মিলন হইবার কোনো স্বাভাবিক সম্ভাবনা নাই; উভয়ের মাঝখানে একটা ব্যবধান থাকিবেই থাকিবে; আমাদের শিক্ষা হইতে আমাদের জীবনের সমস্ত আবশ্যিক অভাবের পূরণ হইতে পারিবেই না। আমাদের সমস্ত জীবনের শিকড় যেখানে, সেখান হইতে শত হস্ত দূরে আমাদের শিক্ষার বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইতেছে, বাধা ভেদ করিয়া যেটুকু রস নিকটে আসিয়া পৌঁছিতেছে সেটুকু আমাদের জীবনের শুষ্কতা দূর করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। আমরা যে-শিক্ষায় আজন্মকাল যাপন করি, সে-শিক্ষা কেবল যে আমাদেরকে কেরানিগিরি অথবা কোনো একটা ব্যবসায়ের উপযোগী করে মাত্র, যে সিঁদুকের মধ্যে আমাদের আপিসের শামলা এবং চাদর ভাঁজ করিয়া রাখি সেই সিঁদুকের মধ্যেই যে আমাদের সমস্ত বিদ্যাকে তুলিয়া রাখিয়া দিই, আটপৌরে দৈনিক জীবনে তাহার যে কোনো ব্যবহার নাই, ইহা বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীগুণে অবশ্যসম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে। এজন্য আমাদের ছাত্রদিগকে দোষ দেওয়া অন্যায়। তাহাদের গ্রন্থজগৎ এক প্রান্তে আর তাহাদের বসতি-জগৎ অন্যপ্রান্তে, মাঝখানে কেবল ব্যাকরণ-অভিধানের সেতু। এইজন্য যখন দেখা যায় একই লোক এক দিকে যুরোপীয় দর্শন বিজ্ঞান এবং ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অন্য দিকে চিরকুসংস্কারগুলিকে সযত্নে পোষণ করিতেছেন, এক দিকে স্বাধীনতার উজ্জ্বল আদর্শ মুখে প্রচার করিতেছেন, অন্য দিকে অধীনতার শত সহস্র লুতাতস্তপাশে আপনাকে এবং অন্যকে প্রতি মুহূর্তে আচ্ছন্ন ও দুর্বল করিয়া ফেলিতেছেন, এক দিকে বিচিত্রভাবপূর্ণ সাহিত্য স্বতন্ত্রভাবে সম্ভোগ করিতেছেন, অন্য দিকে জীবনকে ভাবের উচ্চশিখরে অধিরুদ্ধ করিয়া রাখিতেছেন না, কেবল ধনোপার্জন এবং বৈষয়িক উন্নতি সাধনেই ব্যস্ত, তখন আর আশ্চর্য বোধ হয় না। কারণ, তাহাদের বিদ্যা এবং ব্যবহারের মধ্যে একটা সত্যকার দুর্ভেদ্য ব্যবধান আছে, উভয়ে কখনো সুসংলগ্নভাবে মিলিত হইতে পায় না।

তাহার ফল হয় এই, উভয়ে উভয়ের প্রতি উত্তরোত্তর বাম হইতে থাকে। যেটা আমাদের শিক্ষিত বিদ্যা, আমাদের জীবন ক্রমাগতই তাহার প্রতিবাদ করিয়া চলাতে সেই বিদ্যাটার প্রতিই আগাগোড়া অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা জন্মিতে থাকে। মনে হয়, ও জিনিসটা কেবল ভুয়া এবং সমস্ত যুরোপীয় সভ্যতা ঐ ভুয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের যাহা আছে তাহা সমস্তই সত্য এবং আমাদের শিক্ষা যেরূপে পথ নির্দেশ করিয়া দিতেছে সেদিকে সভ্যতা নামক একটি মায়াবিনী মহামিথ্যার সাম্রাজ্য। আমাদের অদৃষ্টক্রমে বিশেষ কারণবশতই যে আমাদের শিক্ষা আমাদের নিকট নিষ্ফল হইয়া উঠিয়াছে তাহা না মনে করিয়া আমরা স্থির করি, উহার নিজের মধ্যে স্বভাবতই একটা বৃহৎ নিষ্ফলতার কারণ বর্তমান রহিয়াছে। এইরূপে আমাদের শিক্ষাকে আমরা যতই অশ্রদ্ধা করিতে থাকি আমাদের শিক্ষাও আমাদের জীবনের প্রতি ততই বিমুখ হইতে থাকে, আমাদের চরিত্রের উপর তাহার সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না—এইরূপে আমাদের শিক্ষার সহিত জীবনের গৃহবিচ্ছেদ ক্রমশ বাড়িয়া উঠে, প্রতিমুহূর্তে পরস্পর পরস্পরকে সুতীর পরিহাস করিতে থাকে এবং অসম্পূর্ণ জীবন ও অসম্পূর্ণ শিক্ষা লইয়া বাঙালির সংসারযাত্রা দুই-ই সঙের প্রহসন হইয়া দাঁড়ায়।

এইরূপে জীবনের এক-তৃতীয়াংশকাল যে-শিক্ষায় যাপন করিলাম তাহা যদি চিরকাল আমাদের জীবনের সহিত অসংলগ্ন হইয়া রহিল এবং অন্য শিক্ষালাভের অবসর হইতেও বঞ্চিত হইলাম, তবে আর আমরা কিসের জোরে একটা যথার্থ্য লাভ করিতে পারিব।

আমাদের এই শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্য সাধনই এখনকার দিনের সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু এ মিলন কে সাধন করিতে পারে। বাংলাভাষা, বাংলাসাহিত্য। যখন প্রথম বঙ্কিমবাবুর বঙ্গদর্শন একটি নূতন প্রভাতের মতো আমাদের বঙ্গদেশে উদিত হইয়াছিল তখন দেশের সমস্ত শিক্ষিত অন্তর্জগৎ কেন এমন একটি অপূর্ব আনন্দে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল। যুরোপের দর্শনে বিজ্ঞানে ইতিহাসে যাহা পাওয়া যায় না এমন কোনো নূতন তত্ত্ব নূতন আবিষ্কার বঙ্গদর্শন কি প্রকাশ করিয়াছিল। তাহা নহে। বঙ্গদর্শনকে অবলম্বন করিয়া একটি প্রবল প্রতিভা আমাদের ইংরেজি শিক্ষা ও আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যবর্তী ব্যবধান ভাঙিয়া দিয়াছিল—বহুকাল পরে প্রাণের সহিত ভাবের একটি আনন্দ সম্মিলন সংঘটন করিয়াছিল, প্রবাসীকে গৃহের মধ্যে আনিয়া আমাদের গৃহকে উৎসবে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। এতদিন মথুরায় কৃষ্ণ রাজত্ব করিতেছিলেন, বিশ পঁচিশ বৎসর কাল দ্বারীর সাধ্যসাধন করিয়া তাঁহার সুদূর সাক্ষাৎলাভ হইত,

বঙ্গদর্শন দৌত্য করিয়া তাঁহাকে আমাদের বৃন্দাবনধামে আনিয়া দিল। এখন আমাদের গৃহে, আমাদের সমাজে, আমাদের অন্তরে একটা নূতন জ্যোতি বিকীর্ণ হইল। আমরা আমাদের ঘরের মেয়েকে সূর্যমুখী কমলমণিরূপে দেখিলাম, চন্দ্রশেখর এবং প্রতাপ বাঙালি পুরুষকে একটা উচ্চতর ভাবলোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল, আমাদের প্রতিদিনের ক্ষুদ্র জীবনের উপরে একটি মহিমরশ্মি নিপতিত হইল।

বঙ্গদর্শন সেই যে এক অনুপম নূতন আনন্দের আশ্বাদ দিয়া গেছে তাহার ফল হইয়াছে এই যে, আজকালকার শিক্ষিত লোকে বাংলা ভাষার ভাব প্রকাশ করিবার জন্য উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছে। এটুকু বুঝিয়াছে যে, ইংরেজি আমাদের পক্ষে কাজের ভাষা কিন্তু ভাবের ভাষা নহে। প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে যে, যদিও আমরা শৈশবাবধি এত একান্ত যত্নে একমাত্র ইংরেজি ভাষা শিক্ষা করি, তথাপি আমাদের দেশীয় বর্তমান স্থায়ী সাহিত্য যাহা-কিছু তাহা বাংলা ভাষাতেই প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার প্রধান কারণ, বাঙালি কখনোই ইংরেজি ভাষার সহিত তেমন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ভাবে পরিচিত হইতে পারে না যাহাতে সাহিত্যের স্বাধীন ভাবোচ্ছ্বাস তাহার মধ্যে সহজে প্রকাশ করিতে পারে। যদি বা ভাষার সহিত তাহার তেমন পরিচয় হয় তথাপি বাঙালির ভাব ইংরেজের ভাষায় তেমন জীবন্তরূপে প্রকাশিত হয় না। যে-সকল বিশেষ মাধুর্য, বিশেষ স্মৃতি আমাদিগকে প্রকাশচেষ্টায় উত্তেজিত করে, যে-সকল সংস্কার পুরুষানুক্রমে আমাদের সমস্ত মনকে একটা বিশেষ গঠন দান করিয়াছে, তাহা কখনোই বিদেশী ভাষার মধ্যে যথার্থ মুক্তি লাভ করিতে পারে না।

অতএব আমাদের শিক্ষিত লোকেরা যখনই ভাব প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন তখনই বাংলা ভাষা অবলম্বন করিতে তাঁহাদের একটা কাতরতা জন্মে। কিন্তু হায় অভিমানিনী ভাষা, সে কোথায়। সে কি এত দীর্ঘকাল অবহেলার পর মুহূর্তের আহ্বানে অমনি তৎক্ষণাৎ তাহার সমস্ত সৌন্দর্য, তাহার সমস্ত গৌরব লইয়া একজন শিক্ষাভিমानी গর্বোদ্ধত পুরুষের নিকট আত্মসমর্পণ করিবে। হে সুশিক্ষিত, হে আর্য, তুমি কি আমাদের এই সুকুমারী সুকোমলা তরুণী ভাষার যথার্থ মর্যাদা জানো। ইহার কটাক্ষে যে উজ্জ্বল হাস্য, যে অশ্রুপ্লান করুণা, যে প্রখর তেজস্ফুলিঙ্গ, যে স্নেহ প্রীতি ভক্তি স্ফুরিত হয় তাহার গভীর মর্ম কি কখনো বুঝিয়াছ, হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছ। তুমি মনে করো, আমি যখন মিল স্পেন্সার পড়িয়াছি, সব কটা পাস করিয়াছি,

আমি যখন এমন একজন স্বাধীন চিন্তাশীল মেধাবী যুবাপুরুষ, যখন হতভাগ্য কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাগণ আপন কুমারী কন্যা এবং যথাসর্বস্ব লইয়া আমার দ্বারে আসিয়া সাধ্যসাধনা করিতেছে, তখন ঐ অশিক্ষিত সামান্য গ্রাম্য লোকদিগের ঘরের তুচ্ছ ভাষাটার উচিত ছিল আমার ইঙ্গিতমাত্রে আমার শরণাপন্ন হইয়া কৃতকৃতার্থ হওয়া। আমি যে ইংরেজি পড়িয়া বাংলা লিখি ইহা অপেক্ষা বাংলার সৌভাগ্য কী হইতে পারে। আমি যখন ইংরেজি ভাষায় আমার অনায়াসপ্রাপ্য যশ পরিহার করিয়া আমার এত বড়ো বড়ো ভাব এই দরিদ্র দেশে হেলায় বিসর্জন দিতেছি, তখন জীর্ণবস্ত্র দীন পাহুগণ রাজাকে দেখিলে যেমন সসম্মুখে পথ ছাড়িয়া দেয়, তেমনই আমার সম্মুখ হইতে সমস্ত তুচ্ছ বাধাবিপত্তির শশব্যস্ত হইয়া সরিয়া যাওয়া উচিত ছিল। একবার ভাবিয়া দেখো আমি তোমাদের কত উপকার করিতে আসিয়াছি, আমি তোমাদিগকে পোলিটিক্যাল ইকনমি সম্বন্ধে দুইচারি কথা বলিতে পারিব, জীবরাজ্য হইতে আরম্ভ করিয়া সমাজ এবং আধ্যাত্মিক জগৎ পর্যন্ত এভোল্যুশনের নিয়ম কিরূপে কার্য করিতেছে তৎসম্বন্ধে আমি যাহা শিখিয়াছি তাহা তোমাদের নিকট হইতে সম্পূর্ণ গোপন করিব না, আমার ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক প্রবন্ধের ফুটনোটে নানা ভাষার দুর্লভ গ্রন্থ হইতে নানা বচন ও দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া দেখাইতে পারিব, এবং বিলাতি সাহিত্যের কোন্ পুস্তক সম্বন্ধে কোন্ সমালোচক কী কথা বলেন তাহাও বাঙালির অগোচর থাকিবে না। কিন্তু যদি তোমাদের এই জীর্ণচীর অসম্পূর্ণ ভাষা আদেশমাত্র অগ্রসর হইয়া আমাকে সমাদর করিয়া না লয় তবে আমি বাংলায় লিখিব না, আমি ওকালতি করিব, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইব, ইংরেজি খবরের কাগজে লীডার লিখিব, তোমাদের যে কত ক্ষতি হইবে তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

বঙ্গদেশের পরম দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার এই লজ্জাশীলা অথচ তেজস্বিনী নন্দিনী বঙ্গভাষা অগ্রবর্তিনী হইয়া এমন-সকল ভালো ভালো ছেলের সমাদর করে না এবং ভালো ছেলেরাও রাগ করিয়া বাংলাভাষার সহিত কোনো সম্পর্ক রাখে না। এমন কি, বাংলায় চিঠিও লেখে না, বন্ধুদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে যতটা পারে বাংলা হাতে রাখিয়া ব্যবহার করে এবং বাংলাগ্রন্থ অবজ্ঞাভরে অন্তঃপুরে নির্বাসিত করিয়া দেয়। ইহাকে বলে লঘু পাপে গুরু দণ্ড।

পূর্বে বলিয়াছি, আমাদের বাল্যকালের শিক্ষায় আমরা ভাষার সহিত ভাব পাই না, আবার বয়স হইলে ঠিক তাহার বিপরীত ঘটে, যখন ভাব জুটিতে থাকে তখন ভাষা পাওয়া যায় না। এ কথাও পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাবশিক্ষা একত্র অবিচ্ছেদ্যভাবে বৃদ্ধি

পায় না বলিয়াই যুরোপীয় ভাবের যথার্থ নিকট সংসর্গ আমরা লাভ করি না এবং সেইজন্যই আজকাল আমাদের অনেক শিক্ষিত লোকে যুরোপীয় ভাবসকলের প্রতি অনাদর প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অন্যদিকেও তেমনই ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আপনার মাতৃভাষাকে দৃঢ়-সম্বন্ধরূপে পান নাই বলিয়া মাতৃভাষা হইতে তাঁহারা দূরে পড়িয়া গেছেন এবং মাতৃভাষার প্রতি তাঁহাদের একটি অবজ্ঞা জন্মিয়া গেছে। বাংলা তাঁহারা জানেন না সে কথা স্পষ্টরূপে স্বীকার না করিয়া তাঁহারা বলেন, “বাংলায় কি কোনো ভাব প্রকাশ করা যায়। এ ভাষা আমাদের মতো শিক্ষিত মনের উপযোগী নহে।” প্রকৃত কথা, আঙুর আয়ত্তের অতীত হইলে তাহাকে টক বলিয়া উপেক্ষা, আমরা অনেক সময় অজ্ঞাতসারে করিয়া থাকি।

যে দিক হইতে যেমন করিয়াই দেখা যায়, আমাদের ভাব ভাষা এবং জীবনের মধ্যকার সামঞ্জস্য দূর হইয়া গেছে। মানুষ বিচ্ছিন্ন হইয়া নিষ্ফল হইতেছে, আপনার মধ্যে একটি অখণ্ড ঐক্যলাভ করিয়া বলিষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না, যখন যেটি আবশ্যিক তখন সেটি হাতের কাছে পাইতেছে না। একটি গল্প আছে, একজন দরিদ্র সমস্ত শীতকালে অল্প অল্প ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া যখন শীতবস্ত্র কিনিতে সক্ষম হইত তখন গ্রীষ্ম আসিয়া পড়িত, আবার সমস্ত গ্রীষ্মকাল চেষ্টা করিয়া যখন লঘুবস্ত্র লাভ করিত তখন অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি দেবতা যখন তাহার দৈন্য দেখিয়া দয়ার্দ্র হইয়া বর দিতে চাহিলেন তখন সে কহিল, “আমি আর কিছু চাহি না, আমার এই হেরফের ঘুচাইয়া দাও। আমি যে সমস্ত জীবন ধরিয়া গ্রীষ্মের সময় শীতবস্ত্র এবং শীতের সময় গ্রীষ্মবস্ত্র লাভ করি এইটে যদি একটু সংশোধন করিয়া দাও তাহা হইলেই আমার জীবন সার্থক হয়।”

আমাদেরও সেই প্রার্থনা। আমাদের হেরফের ঘুচিলেই আমরা চরিতার্থ হই। শীতের সহিত শীতবস্ত্র, গ্রীষ্মের সহিত গ্রীষ্মবস্ত্র কেবল একত্র করিতে পারিতেছি না বলিয়াই আমাদের এত দৈন্য, নহিলে আছে সকলই; এখন আমরা বিধাতার নিকট এই বর চাহি, আমাদের ক্ষুধার সহিত অন্ন, শীতের সহিত বস্ত্র, ভাবের সহিত ভাষা, শিক্ষার সহিত জীবন কেবল একত্র করিয়া দাও। আমরা আছি যেন;

পানীমে মীন পিয়াসি
শুনত শুনত লাগে হাসি।

আমাদের পানীও আছে পিয়াসও আছে, দেখিয়া পৃথিবীর লোক হাসিতেছে, এবং আমাদের চক্ষে অশ্রু আসিতেছে, কেবল আমরা পান করিতে পারিতেছি না।

শিক্ষা-সংস্কার

যাঁহারা খবরের কাগজ পড়েন তাঁহারা জানেন, ইংলণ্ডে ফ্রান্সে শিক্ষা সম্বন্ধে খুব একটা গোলমাল চলিতেছে। শিক্ষা লইয়া আমরাও নিশ্চিত নাই, তাহাও কাহারো অবিদিত নাই।

এমন সময়ে 'স্পীকার' নামক বিখ্যাত ইংরেজি সাপ্তাহিক-পত্রে আইরিশ শিক্ষা-সংস্কার সম্বন্ধে যে প্রস্তাব আলোচিত হইয়াছে, তাহা আমাদের মনোযোগপূর্বক চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয়।

যুরোপের যে-যুগকে অন্ধকার যুগ বলে, যখন বর্বর আক্রমণের ঝড়ে রোমের বাতি নিবিয়া গেল, সেই সময়ে যুরোপের সকল দেশের মধ্যে কেবলমাত্র আয়রলণ্ডেই বিদ্যার চর্চা জাগিয়াছিল। তখন যুরোপের ছাত্রগণ আয়রলণ্ডের বিদ্যালয়ে আসিয়া পড়াশুনা করিত। সপ্তম শতাব্দীতে যখন বহুতর বিদ্যার্থী এখানে আসিয়া জুটিয়াছিল, তখন তাহারা আহাৰ বাসা পুঁথি এবং শিক্ষা বিনামূল্যেই পাইত। কতকটা আমাদের দেশের টোলার মতো আর কি।

যুরোপের অধিকাংশ দেশেই আইরিশ বৈরাগিগণ বিদ্যা এবং খৃষ্টধর্মের নির্বাণপ্রায় শিখা আবার উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। ফ্রান্সের রাজা শার্লমান অষ্টম শতাব্দীতে পারিস-যুনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাভার বিখ্যাত আইরিশ পণ্ডিত ক্লেমেন্সের হাতে দিয়াছিলেন। এরূপ আরো অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

প্রাচীন আইরিশ বিদ্যালয়ে যদিচ লাতিন, গ্রীক এবং হিব্রু শেখানো হইত, তবু সেখানে শিখাইবার ভাষা ছিল আইরিশ। গণিতজ্যোতিষ, ফলিতজ্যোতিষ এবং তখনকার কালে যে-সকল বিজ্ঞান প্রচলিত ছিল তাহা আইরিশ ভাষা দ্বারাই শেখানো হইত, সুতরাং এ ভাষার পারিভাষিক শব্দের দৈন্য ছিল না।

যখন দিনেমার এবং ইংরেজরা আয়রলণ্ড আক্রমণ করে, তখন এই-সকল বিদ্যালয়ে আগুন লাগাইয়া বিপুলসংখ্যে পুঁথিপত্র জ্বলাইয়া দেওয়া হয় এবং অধ্যাপক ও ছাত্রগণ হত ও বিন্ধিগু হইতে থাকে। কিন্তু আয়রলণ্ডের যে যে স্থান এই-সকল উৎপাত হইতে দূরে থাকিয়া ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত দেশীয় রাজাদের অধীন ছিল, সে-সকল স্থানের বড়ো বড়ো বিদ্যাগারে শিক্ষাকার্য সম্পূর্ণ আইরিশ প্রণালীতেই নির্বাহিত হইত। অবশেষে এলিজাবেথের কালে লড়াই

হইয়া যখন সমস্ত সম্পত্তি অপহৃত হইল, তখন আয়রলণ্ডের স্বায়ত্ত্ববিদ্যা ও বিদ্যালয় একেবারে নষ্ট করিয়া দেওয়া হইল।

এইরূপে আয়রলণ্ডবাসীরা জ্ঞানচর্চা হইতে বঞ্চিত হইয়া রহিল, তাহাদের ভাষা নিকৃষ্টসমাজের ভাষা বলিয়া অবজ্ঞা প্রাপ্ত হইতে থাকিল। অবশেষে ঊনবিংশ শতাব্দীতে 'ন্যাশনাল ইন্সকুল' প্রণালীর সূত্রপাত হইল। জ্ঞানপিপাসু আইরিশগণ এই প্রণালীর দোষগুলি বিচারমাত্র না করিয়া ব্যগ্রভাবে ইহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইল। কেবল একজন বড়োলোক-টুয়ামের আর্চবিশপ জন ম্যাকহেল-এই প্রণালীর বিরুদ্ধে আপত্তি প্রকাশ করেন এবং ইহার দ্বারা ভবিষ্যতে যে অমঙ্গল হইবে তাহা ব্যক্ত করেন।

আইরিশদিগকে জোর করিয়া স্যাকসনের ছাঁচে ঢালা এবং ইংরেজ করিয়া তোলাই ন্যাশনাল ইন্সকুল-প্রণালীর মতলব ছিল। ফলে এই চেষ্টার ব্যর্থতা প্রমাণ হইল। ভালোই বলো আর মন্দই বলো, প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে এমন ভিন্ন রকম করিয়া গড়িয়াছেন যে, এক জাতকে ভিন্ন জাতের কাঠামোর মধ্যে পুরিতে গেলে সমস্ত খাপছাড়া হইয়া যায়।

যে-সময়ে এই শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্তন করা হয়, তখন আয়রলণ্ডের শতকরা আশিজন লোক আইরিশ ভাষায় কথা কহিত। যদি শিক্ষা দেওয়াই ন্যাশনাল বোর্ডের উদ্দেশ্য হইত, তবে আইরিশ ছাত্রদিগকে আগে নিজের ভাষায় পড়িতে শুনিত শিখাইয়া তাহার পরে সেই মাতৃভাষার সাহায্যে তাহাদিগকে বিদেশী ভাষা শিক্ষা দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাহা না করিয়া নানাপ্রকার কঠিন শাস্তি দ্বারা বালকদিগকে তাহাদের মাতৃভাষা ব্যবহার করিতে একেবারে নিরস্ত করিয়া দেওয়া হইল।

শুধু ভাষা নয়, আইরিশ ইতিহাস পড়ানো বন্ধ হইল; আইরিশ ভূবৃত্তান্তও ভালো করিয়া শেখানো হইত না। ছেলেরা বিদেশের ইতিহাস ও ভূবৃত্তান্ত শিখিয়া নিজের দেশের সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিত।

ইহার ফল যেমন হওয়া উচিত, তাহাই হইল। মানসিক জড়তা সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত হইয়া গেল। আইরিশ-ভাষী ছেলেরা বুদ্ধি এবং জিজ্ঞাসা লইয়া বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিল আর বাহির হইল পঙ্গু মন এবং জ্ঞানের প্রতি বিতৃষ্ণা লইয়া।

ইহার কারণ, এ শিক্ষাপ্রণালী কলের প্রণালী, ইহাতে মন খাটে না, ছেলেরা তোতাপাখি বনিয়া যায়।

এই প্রাথমিক শিক্ষার পর মাধ্যমিক শিক্ষা (Intermediate Education)। আটশ বৎসর ধরিয়া আয়রলণ্ডে সেই মাধ্যমিক শিক্ষার পরখ করা হইয়াছে। তাহার ফলস্বরূপ বিদ্যাশিক্ষা সেখানে একেবারে দলিত হইয়া গেল। পরীক্ষাফলের প্রতি অতিমাত্র লোভ করিয়া করিয়া কলেজে শেখাইবার চেষ্টা হয় না, কেবল গেলাইবার আয়োজন হয়। ইহাতে হাজার হাজার আইরিশ ছাত্রের স্বাস্থ্য নষ্ট এবং বুদ্ধি বন্ধ্যা হইয়া যাইতেছে। অতিশ্রমের দ্বারা অকালে তাহাদের মন জীর্ণ হইয়া যায় এবং বিদ্যার প্রতি তাহাদের অনুরাগ থাকে না।

এই বিদ্যাবিভ্রাটের প্রতিকারস্বরূপ আইরিশ জাতি কি প্রার্থনা করিতেছে। তাহারা বিপ্লব বাধাইতে চায় না, দেশের বিদ্যাশিক্ষার ভার তাহারা নিজের হাতে চালাইতে চায়। ব্যয়ের জন্যও কর্তৃপক্ষকে বেশি ভাবিতে হইবে না। শিক্ষাব্যয়ের জন্য আয়রলণ্ডের যে বরাদ্দ নির্দিষ্ট হইতেছে, তাহা অতি যৎসামান্য। ইংলণ্ডে পুলিশ এবং আদালতে যে খরচ হয় তাহার প্রত্যেক পাউণ্ডের হারে বিদ্যাশিক্ষায় আট পাউণ্ড খরচ হইয়া থাকে। আর আয়রলণ্ডে যেখানে অপরাধের সংখ্যা তুলনায় অত্যন্ত কম, সেখানে প্রত্যেক পুলিশ ও আদালতের বরাদ্দের প্রত্যেক পাউণ্ডের অনুপাতে বিদ্যাশিক্ষায় তেরো শিলিং চার পেন্স মাত্র ব্যয় ধরা হইয়াছে।

ঠিক একটা দেশের সঙ্গে অন্য দেশের সকল অংশে তুলনা হইতেই পারে না। আয়রলণ্ডের শিক্ষারীতি যে ভাবে চলিয়াছিল, ভারতবর্ষেও যে ঠিক সেই ভাবেই চলিয়াছে তাহা বলা যায় না, কিন্তু আয়রলণ্ডের শিক্ষাসংকটের কথা আলোচনা করিয়া দেখিলে একটা গভীর জায়গায় আমাদের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়।

বিদ্যাশিক্ষায় আমাদেরও মন খাটিতেছে না—আমাদেরও শিক্ষাপ্রণালীতে কলের অংশ বেশি। যে-ভাষায় আমাদের শিক্ষা সমাধা হয়, সে-ভাষায় প্রবেশ করিতে আমাদের অনেক দিন লাগে। ততদিন পর্যন্ত কেবল দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া হাতুড়ি পেটা এবং কুলুপ-খোলার তত্ত্ব অভ্যাস করিতেই প্রাণান্ত হইতে হয়। আমাদের মন তেরো-চোদ্দো বছর বয়স হইতেই জ্ঞানের আলোক এবং ভাবের রস গ্রহণ করিবার জন্য ফুটিবার উপক্রম করিতে থাকে, সেই সময়েই অহরহ যদি তাহার উপর বিদেশী ভাষার ব্যাকরণ এবং মুখস্থবিদ্যার শিলাবৃষ্টিবর্ষণ হইতে থাকে, তবে তাহা পুষ্টিলাভ করিবে কী করিয়া। প্রায় বছর কুড়ি বয়স পর্যন্ত মারামারির পর ইংরেজি ভাষায় আমাদের স্বাধীন অধিকার জন্মে, কিন্তু ততদিন আমাদের মন কী খোরাকে বাঁচিয়াছে। আমরা কী ভাবিতে পাইয়াছি, আমাদের হৃদয় কী রস আকর্ষণ করিয়াছে, আমাদের কল্পনাবৃত্তি সৃষ্টিকার্য চর্চার জন্য কী উপকরণ লাভ করিয়াছে। যাহা গ্রহণ করি, তাহা সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ

করিতে থাকিলে তবেই ধারণাটা পাকা হয়। পরের ভাষায় গ্রহণ করাও শক্ত প্রকাশ করাও কঠিন। এইরূপে রচনা করিবার চর্চা না থাকাতে যাহা শিখি তাহাতে আমাদের অধিকার দৃঢ় হইতেই পারে না। □□□ মুখস্থ করিয়া শেখা এবং লেখা, দুয়ের কাজ চালাইয়া দিতে হয়। যে-বয়সে মন অনেকটা পরিমাণে পাকিয়া যায়, সে-বয়সের লাভ পুরালাভ নহে। যে-কাঁচাবয়সে মন অজ্ঞাতসারে আপনার খাদ্য শোষণ করিতে পারে, তখনই সে জ্ঞান ও ভাবকে আপনার রক্তমাংসের সহিত পূর্ণভাবে মিশাইয়া নিজেকে সজীব সবল সক্ষম করিয়া তোলে। সেই সময়টাই আমাদের মাঠে মারা যায়। সে-মাঠ শস্যশূন্য অনূর্বর নীরস মাঠ। সেই মাঠে আমাদের বুদ্ধি ও স্বাস্থ্য কত যে মরিয়াছে তাহার হিসাব কে রাখে।

এইরূপ শিক্ষাপ্রণালীতে আমাদের মন যে অপরিণত থাকিয়া যায়, বুদ্ধি যে সম্পূর্ণ স্ফূর্তি পায় না, সে কথা আমাদের স্বীকার করিতে হইবে। আমাদের পাণ্ডিত্য অল্প কিছু দূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়, আমাদের উদ্ভাবনাশক্তি শেষ পর্যন্ত পৌঁছে না, আমাদের ধারণাশক্তির বলিষ্ঠতা নাই। আমাদের ভাবাচিন্তা আমাদের লেখাপড়ার মধ্যে সেই ছাত্র-অবস্থার ক্ষীণতাই বরাবর থাকিয়া যায়; আমরা নকল করি, নিজের খুঁজি, এবং স্বাধীন মত বলিয়া যাহা প্রচার করি, তাহা হয় কোনো-না কোনো মুখস্থ বিদ্যার প্রতিধ্বনি, নয় একটা ছেলেমানুষি ব্যাপার। হয় মানসিক ভীর্ণতাবশত আমরা পদচিহ্ন মিলাইয়া চলি, নয় অজ্ঞতার স্পর্ধাবশত বেড়া ডিঙাইয়া চলিতে থাকি। কিন্তু আমাদের বুদ্ধির যে স্বাভাবিক খর্বতা আছে, এ কথা কোনো মতেই স্বীকার্য নহে। আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর ত্রুটি সত্ত্বেও আমরা অল্প সময়ের মধ্যে যতটা মাথা তুলিতে পারিয়াছি, সে আমাদের নিজের গুণে।

আর একটি কথা। শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গে যদি আর-কোনো অবান্তর উদ্দেশ্য ভিতরে ভিতরে থাকিয়া যায় তবে তাহাতে বিকার জন্মায়। আইরিশকে স্যাকসন করিবার চেষ্টায় তাহার শিক্ষাকেই মাটি করা হইয়াছে। কর্তৃপক্ষ আজকাল আমাদের শিক্ষার মধ্যে পোলিটিক্যাল মতলবকে সাঁধ করাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা বুঝা কঠিন নহে। সেইজন্য তাঁহারা শিক্ষাব্যাপারে দেশীয় লোকের স্বাধীনতা নানা দিক হইতে খর্ব করিতে উদ্যত হইয়াছেন। শিক্ষাকে তাঁহারা শাসনবিভাগের আপিসভুক্ত করিয়া লইতে চান। এখন হইতে অনভিজ্ঞ ডাইরেক্টরের পরীক্ষিত, অনভিজ্ঞ ম্যাকমিলান কোম্পানির রচিত, অতি সংকীর্ণ, অতি দরিদ্র এবং বিকৃত বাংলার পাঠ্যগ্রন্থ পড়িয়া বাঙালির ছেলেকে মানুষ হইতে হইবে এবং বিদ্যালয়ের

বইগুলি এমন ভাবে প্রস্তুত ও নির্বাচিত হইবে যাহাতে নিরপেক্ষ উদার জ্ঞানচর্চা পোলিটিক্যাল প্রয়োজনসিদ্ধির কাছে খণ্ডিত হইয়া যায়।

শুধু তাই নয়। ডিসিপ্লিনের যন্ত্রটাতে যে-পরিমাণ পাক দিলে ছেলেরা সংযত হয়, তাহার চেয়ে পাক বাড়াইবার চেষ্টা দেখা যাইতেছে, ইহাতে তাহাদিগকে নিঃসত্ত্ব করা হইবে। ছেলেদের মধ্যে ছেলেমানুষের চাঞ্চল্য যে স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর তাহা স্বদেশের সম্বন্ধে ইংরেজ ভালোই বোঝে। তাহারা জানে, এই চাঞ্চল্যকে দমন না করিয়া যদি নিয়মিত করিয়া পুষ্ট করা যায়, তবে ইহাই একদিন চরিত্র এবং বুদ্ধির শক্তিরূপে সঞ্চিত হইবে। এই চাঞ্চল্যকে একেবারে দলিত করাই কাপুরুষতাসৃষ্টির প্রধান উপায়। ছেলেদের যাহারা যথার্থ হিতৈষী, তাহারা এই চাঞ্চল্যের মধ্যে প্রকৃতির শুভ উদ্দেশ্য স্বীকার করে, তাহারা ইহাকে উপদ্রব বলিয়া গণ্য করে না। এইজন্য বালোচিত চাপল্যের নানাবিধ উৎপাতকে বিজ্ঞলোকেরা সন্মুখে রক্ষা করেন। ইংলণ্ডে এই ক্ষমাগুণের চর্চা যথেষ্ট দেখা যায়—এমন-কি, আমাদের কাছে তাহা অতিরিক্ত বলিয়া মনে হয়।

নিজে চিন্তা করিবে, নিজে সন্ধান করিবে, নিজে কাজ করিবে, এমনতরো মানুষ তৈরি করবার প্রণালী এক, আর পরের হুকুম মানিয়া চলিবে, পরের মতের প্রতিবাদ করিবে না, ও পরের কাজে জোগানদার হইয়া থাকিবে মাত্র, এমন মানুষ তৈরির বিধান অন্যরূপ। আমরা স্বভাবত স্বজাতিকে স্বাতন্ত্র্যের জন্য প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করিব, সে কথা বলাই বাহুল্য। ইংলণ্ডের যখন সুদিন ছিল, তখন ইংলণ্ডও কোনো জাতিসম্বন্ধেই এই আদর্শে বাধা দিত না—ভারতবর্ষে শিক্ষানীতি সম্বন্ধে মেকলের মন্তব্য তাহার প্রমাণ। এখন কালের পরিবর্তন হইয়াছে; এইজন্যই শিক্ষার আদর্শ লইয়া কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে স্বদেশভক্তদের বিরোধ অবশ্যস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। আমরা বিদ্যালয়ের সাহায্যে এ দেশে তাঁবেদারির চিরস্থায়ী ভিত্তি পত্তন করিতে কিছুতেই রাজি হইতে পারি না। কাজেই, সময় উপস্থিত হইয়াছে, এখন বিদ্যাশিক্ষাকে যেমন করিয়া হউক নিজের হাতে গ্রহণ করিতেই হইবে।

গবর্নমেন্ট-প্রতিষ্ঠিত সেনেটে সিঙিকিটে বাঙালি থাকিলেই যে বিদ্যাশিক্ষার ভার আমাদের নিজের হাতে রহিল, তাহা আমি মনে করি না। গবর্নমেন্টের আমাদের কাছে জবাবদিহি না থাকিয়া দেশের লোকের কাছে জবাবদিহি থাকা চাই। আমরা গবর্নমেন্টের সম্মতির অধীনে যখন বাহ্যস্বাতন্ত্র্যের একটা বিড়ম্বনা লাভ করি, তখনই আমাদের বিপদ সব চেয়ে বেশি। তখন প্রসাদলব্ধ সেই মিথ্যা স্বাতন্ত্র্যের মূল্য যাহা দিতে হয়, তাহাতে মাথা বিকাইয়া যায়। বিশেষত

দেশীলোককে দিয়াই দেশের মঙ্গল দলন করা গবর্মেণ্টের পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন নহে, নইলে এ দেশের দুর্গতি কিসের। অতএব, চাকরির অধিকার নহে, মনুষ্যত্বের অধিকারের যোগ্য হইবার প্রতি যদি লক্ষ রাখি, তবে শিক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাভাব্য-চেষ্টার দিন আসিয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেশের লোককে শিশুকাল হইতে মানুষ করিবার সদুপায় যদি নিজে উদ্ভাবন এবং তাহার উদ্যোগ যদি নিজে না করি, তবে আমরা সর্বপ্রকারে বিনাশপ্রাপ্ত হইব-অল্পে মরিব, স্বাস্থ্যে মরিব, বুদ্ধিতে মরিব, চরিত্রে মরিব-ইহা নিশ্চয়। বস্তুত আমরা প্রত্যহই মরিতেছি অথচ তাহার প্রতিকারের উপযুক্ত চেষ্টামাত্র করিতেছি না, তাহার চিন্তামাত্র যথার্থরূপে আমাদের মনেও উদয় হইতেছে না, এই যে নিবিড় মোহাবৃত নিরুদ্যম ও চরিত্রবিকার-বাল্যকাল হইতে প্রকৃত শিক্ষা ব্যতীত কোনো অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের দ্বারা ইহা নিবারণের কোনো উপায় নাই

বর্তমানকালে যে একটিমাত্র সাধক যুরোপে গুরুর আসনে বসিয়া নিরন্তর অরণ্যে রোদন করিয়া মরিতেছেন সেই টল্‌স্টয় রুশিয়ার শিক্ষানীতি সম্বন্ধে যে-কথা বলিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করি।

It seems to me that it is now specially important to do what is right quietly and persistently, not only without asking permission from Government, but consciously avoiding its participation. The strength of the Government lies in the people's ignorance, and the Government knows this, and will therefore always oppose true enlightenment. It is time we realized that fact. And it is most undesirable to let the Government, while it is spreading darkness, pretend to be busy with the enlightenment of the people. It is doing this now by means of all sorts of pseudo educational establishment which it controls; schools, high schools, universities, academies, and all kinds of committees and congresses. But good is good and enlightenment is enlightenment, only when it is quite good and quite enlightened and not when it is toned down to meet the requirements of Delyanof's or Dournovo's circulars. And I am extremely sorry when I see valuable, disinterested, and self-sacrificing efforts spent unprofitably. It is strange to see good, wise people spending their strength in a struggle against the Government, but carrying on this struggle on the basis of whatever laws the Government itself likes to make.

শিক্ষাসমস্যা

জাতীয় শিক্ষাপরিষদের সভ্য আমার কয়েকজন শ্রদ্ধেয় সুহৃদ এই পরিষদের ইন্সকুল-বিভাগের একটি গঠনে পত্রিকা তৈরি করিবার জন্য আমার উপরে ভার দিয়াছিলেন।

তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে বসিয়া দেখিলাম কাজটি সহজ নহে। কেননা গোড়ায় জানা উচিত এই সংকল্পিত বিদ্যালয়ের কারণবীজটি কী, ইহার মূলে কোন্ ভাব আছে। আমার তাহা জানা নাই।

আমাদের শাস্ত্রে বলে, বাসনাই জন্মপ্রবাহের কারণ—বস্তুপুঞ্জের আকস্মিক সংঘটনই জন্মের হেতু নহে। যদি বাসনার ছেদ হয় তবে গোড়া কাটা পড়িয়া জন্মমৃত্যুর অবসান হইয়া যায়।

তেমনি বলা যাইতে পারে ভাব জিনিসটাই সকল অনুষ্ঠানের গোড়ায়। যদি ভাব না থাকে তবে নিয়ম থাকিতে পারে, টাকা থাকিতে পারে, কমিটি থাকিতে পারে কিন্তু কর্মের শিকড় কাটা পড়িয়া তাহা শুকাইয়া যায়।

তাই গোড়াতেই মনে প্রশ্ন উদয় হয় যে, জাতীয় শিক্ষাপরিষৎটি কোন্ ভাবের প্রেরণায় জন্মগ্রহণ করিতেছে। দেশে সম্প্রতি যে-সকল বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা আছে, তাহার মধ্যে কোন্ ভাবের অভাব ছিল যাহাতে সেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতেছিল না এবং প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে সেই ভাবটিকে কোথায় স্থান দেওয়া হইতেছে।

জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ শুধু যদি কারুবিদ্যালয়-স্থাপনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইত তাহা হইলে বুঝিতাম যে, একটা বিশেষ সংকীর্ণ প্রয়োজন সাধন করাই ইহার উদ্দেশ্য। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে সাধারণত দেশের সমস্ত শিক্ষার প্রতি পরিষৎ দৃষ্টি রাখিতে চান তখন এই জিজ্ঞাসা মনে উঠে যে কোন্ ভাবে এই শিক্ষাকার্য চলিবে। কোন্ নিয়মে চলিবে এবং কী কী বই পড়ানো হইবে সে-সমস্ত বাহিরের কথা।

ইহার উত্তরে যদি কেহ বলেন “জাতীয়” ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে, তবে প্রশ্ন উঠিবে শিক্ষা সম্বন্ধে জাতীয় ভাব বলিতে কী বুঝায়। “জাতীয়” শব্দটার কোনো সীমা নির্দেশ হয় নাই, হওয়াও শক্ত। কোনটা জাতীয় এবং কোনটা জাতীয় নহে শিক্ষা সুবিধা ও সংস্কার অনুসারে ভিন্ন লোকে তাহা ভিন্ন রকমে স্থির করেন।

অতএব শিক্ষাপরিষদের মূল ভাবটি সম্বন্ধে গোড়াতেই দেশের লোক সকলে মিলিয়া একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার। ইংরেজ সরকারের প্রতি রাগ করিয়া আমরা এই কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছি এ কথা এক মুহূর্তের জন্য মনে স্থান দিতে পারি না। দেশের অন্তঃকরণ একটা-কিছু অভাব বোধ করিয়াছিল, একটা-কিছু চায়, সেইজন্যই আমরা দেশের সেই ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে একত্র হইয়াছি এই কথাই সত্য।

আমরা চাই—কিন্তু কী চাই তাহা বাহির করা যে সহজ তাহা মনে করি না। এই সম্বন্ধে সত্য আবিষ্কারের পরেই আমাদের উদ্ধার নির্ভর করে। যদি ভুল করি, যেটা হাতের কাছেই আছে, আমরা যেটাতে অভ্যস্ত, জড়ত্ববশত যদি সেইটেকেই সত্য মনে করি তবে বড়ো বড়ো নাম আমাদের বিফলতা হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না।

এইজন্য শিক্ষাপরিষদের প্রতিষ্ঠাতাগণ যখন উদ্যোগে প্রবৃত্ত আছেন তখন দেশের সর্বসাধারণের তরফ হইতে নিজের চিত্ত নিজের অভাব বুঝিবার জন্য একটা আলোচনা হওয়া উচিত।

সেই আলোচনাকে জাগাইয়া তোলাই আমার এই রচনার প্রধান উদ্দেশ্য। এই উপলক্ষে, যে-ভাবটি আমার মনের সম্মুখে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে দেশের দরবারে উপস্থিত করা আমার কর্তব্য। যদি শিক্ষিত সমাজের প্রচলিত সংস্কারের সঙ্গে ইহার বিরোধ বাধে তবে ইহা গ্রাহ্য হইবে না, জানি। যদি গ্রাহ্য না হয় তবে আপনাদের একটা সুবিধা আছে—আপনারা সমস্তটাকে কবিকল্পনার আকাশকুসুম বলিয়া অতি সংক্ষেপেই বর্জন করিতে পারিবেন এবং আমিও ব্যর্থ কবিদের সান্ত্বনাস্থল “পস্তারিটি” অর্থাৎ কোনো একটা অনির্দিষ্ট উত্তরকালের মধ্যে আমার অনাদৃত প্রস্তাবটির ভাবী সদগতি কল্পনা করিয়া আশ্বাস-লাভের চেষ্টা করিব। কিন্তু তৎপূর্বে আজ আপনাদের নিকট বহুল পরিমাণে ধৈর্য ও ক্ষমা সানুনয়ে প্রার্থনা করি।

ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাস্টার এই কারখানার একটা অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাস্টারেরও মুখ চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাস্টার-কলও তখন মুখ বন্ধ করেন, ছাত্ররা দুই-চার পাত কলে ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ি ফেরে। তার পর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হইয়া তাহার উপরে মার্ক পড়িয়া যায়।

কলের একটা সুবিধা, ঠিক মাপে ঠিক ফরমাশ-দেওয়া জিনিসটা পাওয়া যায়—এক কলের সঙ্গে আর-এক কলের উৎপন্ন সামগ্রীর বড়ো-একটা তফাত থাকে না, মার্কী দিবার সুবিধা হয়।

কিন্তু এক মানুষের সঙ্গে আর-এক মানুষের অনেক তফাত। এমন-কি, একই মানুষের একদিনের সঙ্গে আর-একদিনের ইতর-বিশেষ ঘটে।

তবু মানুষের কাছ হইতে মানুষ যাহা পায় কলের কাছ হইতে তাহা পাইতে পারে না। কল সম্মুখে উপস্থিত করে কিন্তু দান করে না—তাহা তেল দিতে পারে কিন্তু আলো জ্বলাইবার সাধ্য তাহার নাই।

যুরোপে মানুষ সমাজের ভিতরে থাকিয়া মানুষ হইতেছে, ইন্সকুল তাহার কথঞ্চিৎ সাহায্য করিতেছে। লোকে যে-বিদ্যা লাভ করে সে-বিদ্যাটা সেখানকার মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন নহে—সেইখানেই তাহার চর্চা হইতেছে, সেইখানেই তাহার বিকাশ হইতেছে—সমাজের মধ্যে নানা আকারে নানা ভাবে তাহার সঞ্চারণ হইতেছে, লেখাপড়ায় কথাবার্তায় কাজেকর্মে তাহা অহরহ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে। সেখানে জনসমাজ যাহা কালে কালে নানা ঘটনায় নানা লোকের দ্বারায় লাভ করিয়াছে, সঞ্চয় করিয়াছে এবং ভোগ করিতেছে তাহাই বিদ্যালয়ের ভিতর দিয়া বালকদিগকে পরিবেশনের একটা উপায় করিয়াছে মাত্র।

এইজন্য সেখানকার বিদ্যালয় সমাজের সঙ্গে মিশিয়া আছে, তাহা সমাজের মাটি হইতেই রস টানিতেছে এবং সমাজকেই ফলদান করিতেছে।

কিন্তু বিদ্যালয় যেখানে চারি দিকের সমাজের সঙ্গে এমন এক হইয়া মিশিতে পারে নাই, যাহা বাহির হইতে সমাজের উপরে চাপাইয়া দেওয়া, তাহা শুষ্ক তাহা নির্জীব। তাহার কাছ হইতে যাহা পাই তাহা কষ্টে পাই, এবং সে-বিদ্যা প্রয়োগ করিবার বেলা কোনো সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে না। দশটা হইতে চারটে পর্যন্ত যাহা মুখস্থ করি, জীবনের সঙ্গে, চারি দিকের মানুষের সঙ্গে, ঘরের সঙ্গে তাহার মিল দেখিতে পাই না। বাড়িতে বাপমা-ভাইবন্ধুরা যাহা আলোচনা করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে তাহার যোগ নাই, বরঞ্চ অনেক সময়ে বিরোধ আছে। এমন অবস্থায় বিদ্যালয় একটা এঞ্জিন মাত্র হইয়া থাকে—তাহা বস্তু জোগায়, প্রাণ জোগায় না।

এইজন্য বলিতেছি, যুরোপের বিদ্যালয়ের অবিকল বাহ্য নকল করিলেই আমরা যে সেই একই জিনিস পাইব এমন নহে। এই নকলে সেই বেঞ্চি, সেই টেবিল সেইপ্রকার কার্যপ্রণালী সমস্তই ঠিক মিলাইয়া পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা আমাদের পক্ষে বোঝা হইয়া উঠে।

পূর্বে যখন আমরা গুরুর কাছে বিদ্যা পাইতাম শিক্ষকের কাছে নহে, মানুষের কাছে জ্ঞান চাহিতাম কলের কাছে নয়, তখন আমাদের শিক্ষার বিষয় এত বিচিত্র ও বিস্তৃত ছিল না এবং তখন আমাদের সমাজে প্রচলিত ভাব ও মতের সঙ্গে পুঁথির শিক্ষার কোনো বিরোধ ছিল না। ঠিক সেদিনকে আজ ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিলে সে-ও একটা নকল হইবে মাত্র, তাহার বাহ্য আয়োজন বোঝা হইয়া উঠিবে, কোনো কাজেই লাগিবে না।

অতএব আমাদের এখনকার প্রয়োজন যদি আমরা ঠিক বুঝি তবে এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে বিদ্যালয় ঘরের কাজ করিতে পারে; যাহাতে পাঠ্যবিষয়ের বিচিত্রতার সঙ্গে অধ্যাপনার সজীবতা মিশিতে পারে; যাহাতে পুঁথির শিক্ষাদান এবং হৃদয়-মনকে গড়িয়া তোলা দুই ভারই বিদ্যালয় গ্রহণ করে। দেখিতে হইবে আমাদের দেশে বিদ্যালয়ের সঙ্গে বিদ্যালয়ের চতুর্দিকের যে বিচ্ছেদ, এমন-কি, বিরোধ আছে তাহার দ্বারা যেন ছাত্রদের মন বিক্ষিপ্ত হইয়া না যায় ও এইরূপে বিদ্যাশিক্ষাটা যেন কেবল দিনের মধ্যে কয়েকঘণ্টা মাত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া উঠিয়া বাস্তবিকতাসম্পর্কশূন্য একটা অত্যন্ত গুরুপাক অ্যাবস্ট্রাক্ট ব্যাপার হইয়া না দাঁড়ায়।

বিদ্যালয়ে ঘর বানাইলে তাহা বোর্ডিংইস্কুল আকার ধারণ করে। এই বোর্ডিংইস্কুল বলিতে যে-ছবি মনে জাগিয়া উঠে তাহা মনোহর নয়—তাহা বারিক, পাগলাগারদ, হাসপাতাল বা জেলেরই একগোষ্ঠীভুক্ত।

অতএব বিলাতের নজির একেবারে ছাড়িতে হইবে, কারণ, বিলাতের ইতিহাস, বিলাতের সমাজ আমাদের নহে। আমাদের দেশের লোকের মনকে কোন্ আদর্শ বহুদিন মুগ্ধ করিয়াছে আমাদের দেশের হৃদয়ে রসসঞ্চার হয় কিসে তাহা ভালো করিয়া বুঝিতে হইবে।

বুঝিবার বাধা যথেষ্ট আছে। আমরা ইংরেজি ইস্কুলে পড়িয়াছি, যে দিকে তাকাই ইংরেজের দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের সামনে প্রত্যক্ষ। ইহার আড়ালে, আমাদের দেশের ইতিহাস, আমাদের স্বজাতির হৃদয়, অস্পষ্ট হইয়া আছে। আমরা ন্যাশনাল পতাকাটাকে উচ্ছে তুলিয়া যখন স্বাধীন চেষ্টায় কাজ করিব বলিয়া কোমর বাঁধিয়া বসি তখনো বিলাতের বেড়ি কোমরবন্ধ হইয়া আমাদের কাছে বাঁধিয়া ফেলে, আমাদের নজিরের বাহিরে নড়িতে দেয় না।

আমাদের একটা মুশকিল এই যে, আমরা ইংরেজি বিদ্যা ও বিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি সমাজকে অর্থাৎ সেই বিদ্যা ও বিদ্যালয়কে তাহার যথাস্থানে দেখিতে পাই না। আমরা ইহাকে সজীব লোকালয়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া জানি না। এইজন্য সেই বিদ্যালয়ের এ দেশী

প্রতিকল্পটিকে কেমন করিয়া আমাদের জীবনের সঙ্গে মিলাইয়া লইতে হইবে তাহাই জানি না অথচ ইহাই জানা সব চেয়ে প্রয়োজনীয়। বিলাতের কোন্ কলেজে কোন্ বই পড়ানো হয় এবং তাহার নিয়ম কী ইহা লইয়া তর্কবিতর্কে কালক্ষেপ করা সময়ের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার নহে।

এ সম্বন্ধে আমাদের হাড়ের মধ্যে একটা অন্ধ সংস্কার প্রবেশ করিয়াছে। যেমন তিব্বতি মনে করে যে, লোক ভাড়া করিয়া তাহাকে দিয়া একটা মন্ত্রলেখা চাকা চালাইলেই পুণ্যলাভ হয় তেমনি আমরাও মনে করি, কোনোমতে একটা সভা স্থাপন করিয়া কমিটির দ্বারা যদি সেটা চালাইয়া যাই তবেই আমরা ফললাভ করিব। বস্তুত সেই স্থাপন করাটাই যেন লাভ। আমরা অনেকদিন হইল একটা বিজ্ঞানসভা স্থাপন করিয়াছি, তাহার পরে বৎসরে বৎসরে বিলাপ করিয়া আসিয়াছি—দেশের লোকে বিজ্ঞানশিক্ষায় উদাসীন। কিন্তু একটা বিজ্ঞানসভা স্থাপন করা এক, আর দেশের লোকের চিত্তকে বিজ্ঞানশিক্ষায় নিবিষ্ট করা আর। সভা ফাঁদিলেই তাহার পরে দেশের লোক বিজ্ঞানী হইয়া উঠিবে এরূপ মনে করা ঘোর কলিযুগের কল-নিষ্ঠার পরিচয়।

আসল কথা, মানুষের মন পাইতে হইবে, তাহা হইলে যেটুকু আয়োজন করা যায় সেইটুকুই পুরা ফল দেয়। ভারতবর্ষ যখন শিক্ষা দিত তখন মন পাইয়াছিল কী করিয়া সে কথাটা ভাবিয়া দেখা চাই—বিদেশী যুনিভার্সিটির ক্যালেন্ডার খুলিয়া তাহার রস বাহির করিবার জন্য তাহাতে পেনসিলের দাগ দিতে নিষেধ করিব না কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই বিচারটাও উপেক্ষার বিষয় নহে। কী শিখাইব তাহা ভাবিবার বটে কিন্তু যাহাকে শিখাইব তাহার সমস্ত মনটা কী করিয়া পাওয়া যাইতে পারে সে-ও কম কথা নয়।

একদিন তপোবনে ভারতবর্ষের গুরুগৃহ ছিল এইরূপ একটা পুরাণকথা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। অবশ্য তপোবনের যে একটা পরিষ্কার ছবি আমাদের মনে আছে তাহা নহে এবং তাহা অনেক অলৌকিকতার কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

যে কালে, এই-সকল আশ্রম সত্য ছিল সে কালে তাহারা ঠিক কিরূপ ছিল তাহা লইয়া তর্ক করিব না, করিতে পারিব না। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, এই-সকল আশ্রমে যাহারা বাস করিতেন তাহারা গৃহী ছিলেন এবং শিষ্যগণ সন্তানের মতো তাহাদের সেবা করিয়া তাহাদের নিকট হইতে বিদ্যা গ্রহণ করিতেন। এই ভাবটাই আমাদের দেশের টোলেও আজ কতকটা পরিমাণে চলিয়া আসিয়াছে।

এই টোলের প্রতি লক্ষ করিলেও দেখা যাইবে, চতুষ্পাঠীতে কেবলমাত্র পুঁথির পড়াটাই সব চেয়ে বড়ো জিনিস নয়, সেখানে চারি দিকেই অধ্যয়ন-অধ্যাপনার হাওয়া বহিতেছে। গুরু নিজেও ঐ পড়া লইয়াই আছেন; শুধু তাই নয়, সেখানে জীবনযাত্রা নিতান্ত সাধাসিধা; বৈষয়িকতা বিলাসিতা মনকে টানাছেঁড়া করিতে পারে না, সুতরাং শিক্ষাটা একেবারে স্বভাবের সঙ্গে মিশ খাইবার সময় ও সুবিধা পায়। যুরোপের বড়ো বড়ো শিক্ষাগারেও যে এই ভাবটি নাই সে কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে।

প্রাচীন ভারতবর্ষের মতে, যতদিন অধ্যয়নের কাল ততদিন ব্রহ্মচর্যপালন এবং গুরুগৃহে বাস আবশ্যিক।

ব্রহ্মচর্যপালন বলিতে যে কৃচ্ছ্রসাধন বুঝায় তাহা নহে। সংসারের মাঝখানে যাহারা থাকে তাহারা ঠিক স্বভাবের পথে চলিতে পারে না। নানা লোকের সংঘাতে নানা দিক হইতে নানা ঢেউ আসিয়া অনেক সময়ে অনাবশ্যকরূপে তাহাদিগকে চঞ্চল করিতে থাকে—যে সময়ে যে-সকল হৃদয়বৃত্তি ভ্রণ অবস্থায় থাকিবার কথা তাহারা কৃত্রিম আঘাতে অকালে জন্মগ্রহণ করে; ইহাতে কেবলই শক্তির অপব্যয় হয় এবং মন দুর্বল এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ে।

অথচ জীবনের আরম্ভকালে বিকৃতির সমস্ত কৃত্রিম কারণ হইতে স্বভাবকে প্রকৃতিস্থ রাখা নিতান্তই আবশ্যিক। প্রবৃত্তির অকালবোধন এবং বিলাসিতার উগ্র উত্তেজনা হইতে মনুষ্যত্বের নবোদগমের অবস্থাকে স্নিগ্ধ করিয়া রক্ষা করাই ব্রহ্মচর্য পালনের উদ্দেশ্য।

বস্তুত এই স্বভাবের নিয়মের মধ্যে থাকা বালকদের পক্ষে সুখের অবস্থা। ইহাতে তাহাদের পূর্ণ বিকাশের সহায়তা করে, ইহাতেই তাহারা যথার্থভাবে স্বাধীনতার আনন্দ লাভ করিতে পায়। ইহাতে তাহাদের নবাস্কুরিত নির্মল সতেজ মন সমস্ত শরীরের মধ্যে দীপ্তির সঞ্চারণ করে।

ব্রহ্মচর্যপালনের পরিবর্তে আজকাল নীতিপাঠের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। যে-কোনো উপলক্ষে ছাত্রদিগকে নীতি-উপদেশ দিতে হইবে, দেশের অভিভাবকদের এইরূপ অভিপ্রায়।

ইহাও ঐ কলের ব্যাপার। নিয়মিত প্রত্যহ খানিকটা করিয়া সালসা খাওয়ানোর মতো খানিকটা নীতি-উপদেশ—ইহা একটা বরাদ্দ; শিশুকে ভালো করিয়া তুলিবার এই একটা বাঁধা উপায়।

নীতি-উপদেশ জিনিসটা একটা বিরোধ। ইহা কোনোমতেই মনোরম হইতে পারে না। যাহাকে উপদেশ দেওয়া হয় তাহাকে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। উপদেশ হয় তাহার মাথা ডিঙাইয়া চলিয়া যায়, নয় তাহাকে আঘাত করে। ইহাতে যে কেবল চেষ্টা ব্যর্থ হয়

তাহা নয়, অনেক সময় অনিষ্ট করে। সৎকথাকে বিরস ও বিফল করিয়া তোলা মনুষ্যসমাজের যেমন ক্ষতিকর এমন আর কিছুই নয়—অথচ অনেক ভালো লোক এই কাজে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন, ইহা দেখিয়া মনে আশঙ্কা হয়।

সংসারে কৃত্রিম জীবনযাত্রায় হাজার রকমের অসত্য ও বিকৃতি যেখানে প্রতিমুহূর্তে রুচি নষ্ট করিয়া দিতেছে সেখানে ইচ্ছুলে দশটা-চারটের মধ্যে গোটাকতক পুঁথির বচনে সমস্ত সংশোধন করিয়া দিবে ইহা আশাই করা যায় না। ইহাতে কেবল ভুরি ভুরি ভানের সৃষ্টি হয়, এবং নৈতিক জ্যাঠামি যাহা সকল জ্যাঠামির অধম, তাহা সুবুদ্ধির স্বাভাবিকতা ও সৌকুমার্য নষ্ট করিয়া দেয়।

ব্রহ্মচর্যপালনের দ্বারা ধর্মসম্বন্ধে সুরূচিকে স্বাভাবিক করিয়া দেওয়া হয়—উপদেশ দেওয়া নহে, শক্তি দেওয়া হয়। নীতিকথাকে বাহ্যভূষণের মতো জীবনের উপরে চাপাইয়া দেওয়া নহে, জীবনকেই ধর্মের সঙ্গে গড়িয়া তোলা এবং এইরূপে ধর্মকে বিরুদ্ধপক্ষে দাঁড় না করাইয়া তাহাকে অন্তরঙ্গ করিয়া দেওয়া হয়। অতএব জীবনের আরম্ভে মনকে চরিত্রকে গড়িয়া তুলিবার সময় উপদেশ নহে, অনুকূল অবস্থা এবং অনুকূল নিয়মই সকলের চেয়ে বেশি আবশ্যিক।

শুধু এই ব্রহ্মচর্যপালন নয়, তাহার সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির আনুকূল্য থাকা চাই। শহর ব্যাপারটা মানুষের কাজের প্রয়োজনেই তৈরি হইয়াছে; তাহা আমাদের স্বাভাবিক আবাস নয়। ইঁটকাঠপাথরের কোলে ভূমিষ্ঠ হইয়া আমরা মানুষ হইব, বিধাতার এমন বিধান ছিল না। আপিসের কাছে এবং এই আপিসের শহরের কাছে পুষ্পপল্লব চন্দ্রসূর্যের কোনো দাবি নাই, তাহা সজীব সরস বিশ্বপ্রকৃতির বক্ষ হইতে ছিনাইয়া লইয়া আমরাগকে তাহার উত্তপ্ত জঠরের মধ্যে গিলিয়া পরিপাক করিয়া ফেলে। যাহারা ইহাতেই অভ্যস্ত এবং যাহারা কাজের নেশায় বিহ্বল তাহারা এ সম্বন্ধে কোনো অভাবই অনুভব করে না—তাহারা স্বভাব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বৃহৎ জগতের সংস্রব হইতে প্রতিদিনই দূরে চলিয়া যায়।

কিন্তু কাজের ঘূর্ণির মধ্যে ঘাড়মুড় ভাঙিয়া পড়িবার পূর্বে, শিখিবার কালে বাড়িয়া উঠিবার সময়ে, প্রকৃতির সহায়তা নিতান্তই চাই। গাছপালা, স্বচ্ছ আকাশ, মুক্তবায়ু, নির্মল জলাশয়, উদার দৃশ্য, ইহারা বেঞ্চি এবং বোর্ড, পুঁথি এবং পরীক্ষার চেয়ে কম আবশ্যিক নয়।

চিরদিন উদার বিশ্বপ্রকৃতির ঘনিষ্ঠসংস্রবে থাকিয়াই ভারতবর্ষের মন গড়িয়া উঠিয়াছে। জগতের জড়-উদ্ভিদ-চেতনের সঙ্গে নিজেকে একান্তভাবে ব্যাপ্ত করিয়া দেওয়া ভারতবর্ষের স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষের তপোবনে দ্বিজবটুগণ এই মন্ত্র আবৃত্তি করিয়াছেন-

যো দেবোহগ্নৌ যোহপসু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।

য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি বিশ্বভুবনে আবিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি ওষধিতে যিনি বনস্পতিতে সেই দেবতাকে নমস্কার করি, নমস্কার করি।

অগ্নি বায়ু জলস্থল বিশ্বকে বিশ্বাত্মা দ্বারা সহজে পরিপূর্ণ করিয়া দেখিতে শেখাই যথার্থ শেখা। এই শিক্ষা শহরের ইস্কুলে ঠিকমত সম্ভবে না; সেখানে বিদ্যাশিক্ষার কারখানাঘরে জগৎকে আমরা একটা যন্ত্র বলিয়াই শিখিতে পারি।

কিন্তু এখনকার দিনের কাজের লোকেরা এ-সকল কথা মিষ্টসিঁজম বা ভাবকুহেলিকা বলিয়া উড়াইয়া দিবেন, অতএব ইহা লইয়া সমস্ত আলোচনাটাকে অশ্রদ্ধাভাজন করিবার প্রয়োজন নাই।

তথাপি, খোলা আকাশ খোলা বাতাস এবং গাছপালা মানবসন্তানের শরীরমনের সুপরিণতির জন্য যে অত্যন্ত দরকার এ কথা বোধ হয় কেজো লোকেরাও একেবারেই উড়াইয়া দিতে পারিবেন না। বয়স যখন বাড়িবে, আপিস যখন টানিবে, লোকের ভিড় যখন ঠেলিয়া লইয়া বেড়াইবে, মন যখন নানা মতলবে নানা দিকে ফিরিবে তখন বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ হৃদয়ের যোগ অনেকটা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। তাহার পূর্বে যে জলস্থল-আকাশবায়ুর চিরন্তন ধাত্রীক্রোড়ের মধ্যে জন্মিয়াছি, তাহার সঙ্গে যথার্থভাবে পরিচয় হইয়া যাক, মাতৃস্তন্যের মতো তাহার অমৃতরস আকর্ষণ করিয়া লই, তাহার উদার মন্ত্র গ্রহণ করি, তবেই সম্পূর্ণরূপে মানুষ হইতে পারিব। বালকদের হৃদয় যখন নবীন আছে, কৌতুহল যখন সজীব এবং সমুদয় ইন্দ্রিয়শক্তি যখন সতেজ তখনই তাহাদিগকে মেঘ ও রৌদ্রের লীলাভূমি অবারিত আকাশের তলে খেলা করিতে দাও-তাহাদিগকে এই ভূমার আলিঙ্গন হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়ো না। স্নিগ্ধনির্মল প্রাতঃকালে সূর্যোদয় তাহাদের প্রত্যেক দিনকে জ্যোতির্ময় অঙ্গুলির দ্বারা উদ্ঘাটিত করুক এবং সূর্যাস্তদীপ্ত সৌম্যগন্তীর সায়াহ্ন তাহাদের দিবাবসানকে নক্ষত্রখচিত অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে নিমীলিত করিয়া দিক। তরুলতার শাখাপল্লবিত নাট্যশালায় ছয়

অন্ধে ছয় ঋতুর নানারসবিচিত্র গীতিনাট্যাভিনয় তাহাদের সম্মুখে ঘটিতে দাও। তাহারা গাছের তলায় দাঁড়াইয়া দেখুক, নববর্ষা প্রথমযৌবরাজ্যে অভিষিক্ত রাজপুত্রের মতো তাহার পুঞ্জ পুঞ্জ সজলনিবিড় মেঘ লইয়া আনন্দগর্জনে চিরপ্রত্যাশী বনভূমির উপরে আসন্নবর্ষণের ছায়া ঘনাইয়া তুলিতেছে; এবং শরতে অল্পপূর্ণা ধরিত্রীর বক্ষে শিশিরে সিঁধিত, বাতাসে চঞ্চল নানাবর্ণে বিচিত্র, দিগন্তব্যাপ্ত শ্যামল সফলতার অপরিাপ্ত বিস্তার স্বচক্ষে দেখিয়া তাহাদিগকে ধন্য হইতে দাও। হে প্রবীণ অভিভাবক, হে বিষয়ী, তুমি কল্পনাবৃত্তিকে যতই নিজীব, হৃদয়কে যতই কঠিন করিয়া থাক, দোহাই তোমার, এ কথা অন্তত লজ্জাতেও বলিয়ো না যে, ইহার কোনো আবশ্যক নাই; তোমার বালকদিগকে বিশাল বিশ্বের মধ্য দিয়া বিশ্বজননীর প্রত্যক্ষলীলাস্পর্শ অনুভব করিতে দাও—তাহা তোমার ইনস্পেক্টরের তদন্ত এবং পরীক্ষকের প্রশ্নপত্রিকার চেয়ে যে কত বেশি কাজ করে তাহা অন্তরে অনুভব কর না বলিয়াই তাহাকে নিতান্ত উপেক্ষা করিয়ো না।

মন যখন বাড়িতে থাকে তখন তাহার চারি দিকে একটা বৃহৎ অবকাশ থাকা চাই। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সেই অবকাশ বিশালভাবে বিচিত্রভাবে সুন্দর ভাবে বিরাজমান। কোনোমতে সাড়ে নয়টা-দশটার মধ্যে তাড়াতাড়ি অল্প গিলিয়া বিদ্যাশিক্ষার হরিণবাড়ির মধ্যে হাজিরা দিয়া কখনোই ছেলেদের প্রকৃতি সুস্থভাবে বিকাশ লাভ করিতে পারে না। শিক্ষাকে দেয়াল দিয়া ঘিরিয়া, গেট দিয়া রুদ্ধ করিয়া, দরোয়ান দিয়া পাহারা বসাইয়া, শাস্তি দ্বারা কণ্টকিত করিয়া, ঘণ্টা দ্বারা তাড়া দিয়া মানবজীবনের আরম্ভে এ কী নিরানন্দের সৃষ্টি করা হইয়াছে। শিশু যে অ্যাল্জেব্রা না কষিয়াই, ইতিহাসের তারিখ না মুখস্থ করিয়াই মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে সেজন্য সে কি অপরাধী। তাই সে হতভাগ্যদের নিকট হইতে তাহাদের আকাশ বাতাস তাহাদের আনন্দ অবকাশ সমস্ত কাড়িয়া লইয়া শিক্ষাকে সর্বপ্রকারেই তাহাদের পক্ষে শাস্তি করিয়া তুলিতে হইবে? না জানা হইতে ক্রমে ক্রমে জানিবার আনন্দ পাইবে বলিয়াই কি শিশুরা অশিক্ষিত হইয়া জন্মগ্রহণ করে না। আমাদের অক্ষমতা ও বর্বরতা-বশত জ্ঞানশিক্ষাকে যদি আমরা আনন্দজনক করিয়া না তুলিতে পারি তবু চেষ্টা করিয়া, ইচ্ছা করিয়া, নিতান্ত নিষ্ঠুরতাপূর্বক নিরপরাধ শিশুদের বিদ্যাগারকে কেন আমরা কারাগারের আকৃতি দিই। শিশুদের জ্ঞানশিক্ষাকে বিশ্বপ্রকৃতির উদার রমণীয় অবকাশের মধ্য দিয়া উন্মোচিত করিয়া তোলাই বিধাতার অভিপ্রায় ছিল। সেই অভিপ্রায় আমরা যে পরিমাণে ব্যর্থ করিতেছি সেই পরিমাণেই

ব্যর্থ হইতেছি। হরিণবাড়ির প্রাচীর ভাঙিয়া ফেলো—মাতৃগর্ভের দশমাসে পণ্ডিত হইয়া উঠে নাই বলিয়া শিশুদের প্রতি সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান করিয়ো না, তাহাদিগকে দয়া করো।

তাই আমি বলিতেছি, শিক্ষার জন্য এখনো আমাদের বনের প্রয়োজন আছে এবং গুরুগৃহও চাই। বন আমাদের সজীব বাসস্থান এবং গুরু আমাদের সহৃদয় শিক্ষক। এই বনে, এই গুরুগৃহে আজও বালকদিগকে ব্রহ্মচর্যপালন করিয়া শিক্ষা সমাধা করিতে হইবে। কালে আমাদের অবস্থার যতই পরিবর্তন হইয়া থাক্, এই শিক্ষানিয়মের উপযোগিতার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই, কারণ এ নিয়ম মানবচরিত্রের নিত্যসত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত।

অতএব, আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন করিতে হয় তবে লোকালয় হইতে দূরে নির্জনে মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা করা চাই। সেখানে অধ্যাপকগণ নিভৃতে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিবেন এবং ছাত্রগণ সেই জ্ঞানচর্চার যজ্ঞক্ষেত্রের মধ্যেই বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে।

যদি সম্ভব হয় তবে এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে খানিকটা ফসলের জমি থাকা আবশ্যিক; এই জমি হইতে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় আহাৰ্য সংগ্রহ হইবে, ছাত্ররা চাষের কাজে সহায়তা করিবে। দুধ-ঘি প্রভৃতির জন্য গোরু থাকিবে এবং গোপালনে ছাত্রদিগকে যোগ দিতে হইবে। পাঠের বিশ্রামকালে তাহারা স্বহস্তে বাগান করিবে, গাছের গোড়া খুঁড়িবে, গাছে জল দিবে, বেড়া বাঁধিবে; এইরূপে তাহারা প্রকৃতির সঙ্গে কেবল ভাবের নহে, কাজের সম্বন্ধও পাতাইতে থাকিবে।

অনুকূল ঋতুতে বড়ো বড়ো ছায়াময় গাছের তলায় ছাত্রদের ক্লাস বসিবে। তাহাদের শিক্ষার কতক অংশ অধ্যাপকের সহিত তরুশ্রেণীর মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে সমাধা হইবে। সন্ধ্যার অবকাশ তাহারা নক্ষত্রপরিচয়ে, সংগীতচর্চায়, পুরাণকথা ও ইতিহাসের গল্প শুনিয়া যাপন করিবে।

অপরাধ করিলে ছাত্রগণ আমাদের প্রাচীন প্রথা অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত পালন করিবে। শাস্তি পরের নিকট হইতে অপরাধের প্রতিফল, প্রায়শ্চিত্ত নিজের দ্বারা অপরাধের সংশোধন। দণ্ডস্বীকার করা যে নিজেরই কর্তব্য এবং না করিলে যে গ্লানিমোচন হয় না এই শিক্ষা বাল্যকাল হইতেই হওয়া চাই—পরের নিকটে নিজেকে দণ্ডনীয় করিবার হীনতা মানুষ্যোচিত নহে।

যদি অভয় পাই তবে এই প্রসঙ্গে সাহসে ভর করিয়া আর-একটা কথা বলিয়া রাখি। এই বিদ্যালয়ে বেঞ্চি টেবিল চৌকির প্রয়োজন নাই। আমি ইংরেজি সামগ্রীর বিরুদ্ধে গোঁড়ামি করিয়া

এই কথা বলিতেছি এমন কেহ যেন না মনে করেন। আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের বিদ্যালয়ে অনাবশ্যককে খর্ব করিবার একটা আদর্শ সর্বপ্রকারে স্পষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে। চৌকি টেবিল ডেস্ক সকল মানুষের সকল সময়ে জোটা সহজ নহে, কিন্তু ভূমিতল কেহ কাড়িয়া লইবে না। চৌকি টেবিলে সত্যসত্যই ভূমিতলকে কাড়িয়া লয়। এমন দশা ঘটে যে, ভূমিতল ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলে সুখ পাই না, সুবিধা হয় না। ইহা একটা প্রকাণ্ড ক্ষতি। আমাদের দেশ শীতের দেশ নহে, আমাদের বেশভূষা এমন নয় যে আমরা নীচে বসিতে পারি না, অথচ পরদেশের অভ্যাস আমরা আসবাবের বাহুল্য সৃষ্টি করিয়া কষ্ট বাড়াইতেছি। অনাবশ্যককে যে-পরিমাণে অত্যাৱশ্যক করিয়া তুলিব সেই পরিমাণে আমাদের শক্তির অপব্যয় ঘটিবে। অথচ ধনী যুরোপের মতো আমাদের সম্বল নাই; তাহার পক্ষে যাহা সহজ আমাদের পক্ষে তাহা ভার। কোনো-একটা সৎকর্মের অনুষ্ঠান করিতে গেলেই গোড়াতে ঘরবাড়ি ও আসবাবপত্রের হিসাব খতাইয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিতে হয়। এই হিসাবের মধ্যে অনাবশ্যকের দৌরাত্ম্য বারো-আনা। আমরা কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারি না, আমরা মাটির ঘরে কাজ আরম্ভ করিব, আমরা নীচে আসন পাতিয়া সভা করিব। এ কথা বলিতে পারিলে আমাদের অর্ধেক ভার লাঘব হইয়া যায় অথচ কাজের বিশেষ তারতম্য হয় না। কিন্তু যে দেশে শক্তির সীমা নাই, যে দেশে ধন কানায় কানায় ভরিয়া উপচিয়া পড়িতেছে সেই দেশের আদর্শে সমস্ত কাজের পত্তন না করিলে আমাদের লজ্জা দূর হয় না, আমাদের কল্পনা তৃপ্ত হয় না। ইহাতে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তির অধিকাংশই আয়োজনে নিঃশেষিত হইয়া যায়, আসল জিনিসকে খোরাক জোগাইতে পারি না। যতদিন মেঝেতে খড়ি পাতিয়া হাত পাকাইয়াছি ততদিন পাঠশালা স্থাপন করিতে আমাদের ভাবনা ছিল না, এখন বাজারে স্নেট-পেনসিলের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে কিন্তু পাঠশালা হওয়াই মুশকিল। সকল দিকেই ইহা দেখা যাইতেছে। পূর্বে আয়োজন যখন অল্প ছিল, সামাজিকতা অধিক ছিল; এখন আয়োজন বাড়িয়া চলিয়াছে এবং সামাজিকতায় ভাঁটা পড়িতেছে। আমাদের দেশে একদিন ছিল যখন আসবাবকে আমরা ঐশ্বর্য বলিতাম কিন্তু সভ্যতা বলিতাম না; কারণ তখন দেশে যাঁহারা সভ্যতার ভাণ্ডারী ছিলেন তাঁহাদের ভাণ্ডারে আসবাবের প্রচুর্য ছিল না। তাঁহারা দারিদ্র্যকে সুভদ্র করিয়া সমস্ত দেশকে সুস্থ-স্নিগ্ধ রাখিয়াছিলেন। অন্তত শিক্ষার দিনে যদি আমরা এই আদর্শে মানুষ হইতে পারি তবে আর কিছু না হউক হাতে আমরা কতকগুলি

ক্ষমতা লাভ করি—মাটিতে বসিবার ক্ষমতা, মোটা পরিবার মোটা খাইবার ক্ষমতা, যথাসম্ভব অল্প আয়োজনে যথাসম্ভব বেশি কাজ চালাইবার ক্ষমতা—এগুলি কম ক্ষমতা নহে, এবং ইহা সাধনার অপেক্ষা রাখে। সুগমতা, সরলতা, সহজতাই যথার্থ সভ্যতা—বহু আয়োজনের জটিলতা বর্বরতা। বস্তুত তাহা গলদঘর্ম অক্ষমতার স্তূপাকার জঞ্জাল। কতকগুলো জড়বস্তুর অভাবে মনুষ্যত্বের সম্ভ্রম যে নষ্ট হয় না বরঞ্চ অধিকাংশ স্থলেই স্বাভাবিক দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠে এ শিক্ষা শিশুকাল হইতে বিদ্যালয়ে লাভ করিতে হইবে—নিষ্ফল উপদেশের দ্বারা নহে, প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা; এই নিতান্ত সহজ কথাকে সকল প্রকারে সাক্ষাৎভাবে ছেলেদের কাছে স্বাভাবিক করিয়া দিতে হইবে। এ শিক্ষা নইলে শুধু যে আমরা নিজের হাতকে, পা-কে, ঘরের মেঝেকে, মাটিকে অবজ্ঞা করিতে অভ্যস্ত হইব তাহা নহে, আমাদের পিতা-পিতামহকে ঘৃণা করিব এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের সাধনার মাহাত্ম্য যথার্থভাবে অনুভব করিতেই পারিব না।

এইখানে কথা উঠিবে, বাহিরের চিকনচাকনকে যদি তুমি খাতির করিতে না চাও তবে ভিতরের জিনিসটাকে বিশেষভাবে মূল্যবান করিয়া তুলিতে হইবে—সে-মূল্য দিবার সাধ্য কি আমাদের আছে। প্রথমেই জ্ঞানশিক্ষার আশ্রম স্থাপন করিতে হইলে গুরুর প্রয়োজন। শিক্ষক কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেই জোটে কিন্তু গুরু তো ফরমাশ দিলেই পাওয়া যায় না।

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের সংগতি যাহা আছে, তাহার চেয়ে বেশি আমরা দাবি করিতে পারি না এ কথা সত্য। অত্যন্ত প্রয়োজন হইলেও সহসা আমাদের পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের আসনে যাঞ্জবক্ষ্য ঋষির আমদানি করা কাহারো আয়ত্তাধীন নহে। কিন্তু এ কথাও বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে, আমাদের যে সংগতি আছে অবস্থাদোষে তাহার পুরাটা দাবি না করিয়া আমরা সম্পূর্ণ মূলধন খাটাইতে পারি না এমন ঘটনাও ঘটে। ডাকের টিকিট লেফাফায় আঁটিবার জন্যই যদি জলের ঘড়া ব্যবহার করি তবে তাহার অধিকাংশ জলই অনাবশ্যক হয়; আবার স্নান করিতে হইলে সেই ঘড়ার জলই সম্পূর্ণ নিঃশেষ করা যায়; একই ঘড়ার উপযোগিতা ব্যবহারের গুণে কমে বাড়ে। আমরা যাঁহাকে ইস্কুলের শিক্ষক করি তাঁহাকে এমন করিয়া ব্যবহার করি যাহাতে তাঁহার হৃদয়মনের অতি অল্প অংশই কাজে খাটে—ফোনোগ্রাফ যন্ত্রের সঙ্গে একখানা বেত এবং কতটা পরিমাণ মগজ জুড়িয়া দিলেই ইস্কুলের শিক্ষক তৈরি করা যাইতে পারে। কিন্তু এই শিক্ষককেই যদি গুরুর আসনে বসাইয়া দাও তবে স্বভাবতই তাঁহার হৃদয়মনের শক্তি সমগ্রভাবে শিষ্যের প্রতি ধাবিত হইবে। অবশ্য, তাঁহার যাহা

সাধ্য তাহার চেয়ে বেশি তিনি দিতে পারিবেন না, কিন্তু তাহার চেয়ে কম দেওয়াও তাঁহার পক্ষে লজ্জাকর হইবে। একপক্ষ হইতে যথার্থভাবে দাবি না উত্থাপিত হইলে অন্যপক্ষে সম্পূর্ণ শক্তির উদ্‌বোধন হয় না। আজ ইস্কুলের শিক্ষকরূপে দেশের যেটুকু শক্তি কাজ করিতেছে, দেশ যদি অন্তরের সঙ্গে প্রার্থনা করে তবে গুরুরূপে তাহার চেয়ে অনেক বেশি শক্তি খাটিতে থাকিবে।

আজকাল প্রয়োজনের নিয়মে শিক্ষকের গরজ ছাত্রের কাছে আসা, কিন্তু স্বভাবের নিয়মে শিষ্যের গরজ গুরুর কাছে লাভ করা। শিক্ষক দোকানদার, বিদ্যাদান তাঁহার ব্যবসায়। তিনি খরিদারের সন্মানে ফেরেন। ব্যবসাদারের কাছে লোকে বস্তু কিনিতে পারে কিন্তু তাহার পণ্যতালিকার মধ্যে স্নেহ শ্রদ্ধা নিষ্ঠা প্রভৃতি হৃদয়ের সামগ্রী থাকিবে এমন কেহ প্রত্যাশা করিতে পারে না! এই প্রত্যাশা অনুসারেই শিক্ষক বেতন গ্রহণ করেন ও বিদ্যাবস্তু বিক্রয় করেন—এইখানে ছাত্রের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক শেষ। এইরূপ প্রতিকূল অবস্থাতেও অনেক শিক্ষক দেনাপাওয়ানার সম্বন্ধ ছাড়াইয়া উঠেন—সে তাঁহাদের বিশেষ মাহাত্ম্য গুণে। এই শিক্ষকই যদি জানেন যে তিনি গুরুর আসনে বসিয়াছেন—যদি তাঁহার জীবনের দ্বারা ছাত্রের মধ্যে জীবন সঞ্চার করিতে হয়, তাহার জ্ঞানের দ্বারা তাহার জ্ঞানের বাতি জ্বালিতে হয়, তাঁহার স্নেহের দ্বারা তাহার কল্যাণসাধন করিতে হয়, তবেই তিনি গৌরবলাভ করিতে পারেন—তবে তিনি এমন জিনিস দান করিতে বসেন যাহা পণ্যদ্রব্য নহে, যাহা মূল্যের অতীত; সুতরাং ছাত্রের নিকট হইতে শাসনের দ্বারা নহে, ধর্মের বিধানে স্বভাবের নিয়মে তিনি ভক্তিগ্রহণের যোগ্য হইতে পারেন। তিনি জীবিকার অনুরোধে বেতন লইলেও তাহার চেয়ে অনেক বেশি দিয়া আপন কর্তব্যকে মহিমাম্বিত করেন। এবারে বাংলাদেশের বিদ্যালয়গুলির পরে রাজচক্রের শনির দৃষ্টি পড়িবামাত্র কত প্রবীণ এবং নবীন শিক্ষক জীবিকালুপ্ত শিক্ষকবৃন্দের কলঙ্ককালিমা নির্লজ্জভাবে সমস্ত দেশের সম্মুখে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কাহারো অগোচর নাই। তাঁহারা যদি গুরুর আসনে থাকিতেন তবে পদগৌরবের খাতিরে এবং হৃদয়ের অভ্যাসবশতই ছোটো ছোটো ছেলেদের উপরে কন্‌স্টেবলি করিয়া নিজের ব্যবসায়কে এরূপ ঘৃণ্য করিয়া তুলিতে পারিতেন না। এই শিক্ষা-দোকানদারির নীচতা হইতে দেশের শিক্ষককে ও ছাত্রগণকে কি আমরা রক্ষা করিব না। কিন্তু এ-সকল বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া বোধ করি বৃথা হইতেছে। বোধ হয় গোড়ার কথাতেই অনেকের আপত্তি আছে। আমি জানি অনেকের মত এই যে, লেখাপড়া শিখাইবার জন্য ঘর হইতে ছাত্রদিগকে দূরে পাঠানো তাহাদের পক্ষে হিতকর নহে।

এ সম্বন্ধে প্রথম বক্তব্য এই যে, লেখাপড়া শেখানো বলিতে আমরা আজকাল যাহা বুঝি তাহার জন্য বাড়ির গলির কাছে যে-কোনো-একটা সুবিধামত ইন্সকুল এবং তাহার সঙ্গে বড়ো-জোর একটা প্রাইভেট টিউটার রাখিলেই যথেষ্ট। কিন্তু এইরূপ লেখাপড়া করে যেই গাড়িঘোড়া চড়ে সেই শিক্ষার দীনতা ও কার্পণ্য মানবসন্তানের পক্ষে যে অযোগ্য তাহা আমি একপ্রকার ব্যক্ত করিয়াছি।

দ্বিতীয় কথা এই, শিক্ষার জন্য বালকদিগকে ঘর হইতে দূরে পাঠানো উচিত নহে এ কথা মানিতে পারি যদি ঘর তেমনি হয়। কামার কুমার তাঁতী প্রভৃতি শিল্পীগণ ছেলেদিগকে নিজের কাছে রাখিয়াই মানুষ করে, তাহার কারণ তাহারা যেটুকু শিক্ষা দিতে চায় তাহা ঘরে রাখিয়াই ভালোরূপে চলিতে পারে। শিক্ষার আদর্শ আর-একটু উন্নত হইলে ইন্সকুলে পাঠাইতে হয়, তখন এ কথা কেহ বলে না যে, বাপ-মায়ের কাছে শেখানোই সর্বাপেক্ষা শ্রেয়; কেননা, নানা কারণে তাহা সম্ভবপর হয় না। শিক্ষার আদর্শকে আরো যদি উচ্চে তুলিতে পারি, যদি কেবল পরীক্ষাফললোলুপ পুঁথির শিক্ষার দিকে না তাকাইয়া থাকি, যদি সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের ভিত্তি স্থাপনকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলিয়া স্থির করি, তবে তাহার ব্যবস্থা ঘরে এবং স্কুলে করা সম্ভবই হয় না।

সংসারে কেহ বা বণিক, কেহ বা উকিল, কেহ বা ধনী জমিদার, কেহ বা আর-কিছু। ইহাদের প্রত্যেকের ঘরের রকমসকম আবহাওয়া স্বতন্ত্র। ইহাদের ঘরে ছেলেরা শিশুকাল হইতে বিশেষ একটা ছাপ পাইতে থাকে।

জীবনযাত্রার বৈচিত্র্যে মানুষের আপনি যে একটা বিশেষত্ব ঘটে তাহা অনিবার্য এবং এইরূপে এক-একটা ব্যবসায়ের বিশেষ আকারপ্রকার লইয়া মানুষ এক-একটা কোঠায় বিভক্ত হইয়া যায়, কিন্তু বালকেরা সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্বে অজ্ঞাতসারে তাহাদের অভিভাবকদের ছাঁচে তৈরি হইতে থাকা তাহাদের পক্ষে কল্যাণকর নহে।

উদাহরণস্বরূপ দেখা যাক ধনীর ছেলে। ধনীর ঘরে ছেলে জন্মগ্রহণ করে বটে কিন্তু ধনীর ছেলে বলিয়া বিশেষ একটা-কিছু লইয়া কেহ জন্মায় না। ধনীর ছেলে এবং দরিদ্রের ছেলে কোনো প্রভেদ লইয়া আসে না। জন্মের পরদিন হইতে মানুষ সেই প্রভেদ নিজের হাতে তৈরি করিয়া তুলিতে থাকে।

এমন অবস্থায় বাপ-মায়ের উচিত ছিল, গোড়ায় সাধারণ মনুষ্যত্বে পাকা করিয়া তাহার পরে আবশ্যকমতে ছেলেকে ধনীর সন্তান করিয়া তোলা। কিন্তু তাহা ঘটে না, সে সম্পূর্ণরূপে

মানবসন্তান হইতে শিখিবার পূর্বেই ধনীর সন্তান হইয়া উঠে, ইহাতে দুর্লভ মানবজন্মের অনেকটাই তাহার অদৃষ্টে বাদ পড়িয়া যায়, জীবনধারণের অনেক রসাস্বাদের ক্ষমতাই তাহার বিলুপ্ত হয়। প্রথমেই তো বন্ধুডানা খাঁচার পাখির মতো বাপ-মা ধনীর ছেলেকে হাত-পা সত্ত্বেও একেবারে পঙ্গু করিয়া ফেলেন। তাহার চলিবার জো নাই, গাড়ি চাই; সামান্য বোঝাটুকু বহিবার জো নাই, মুটে চাই; নিজের কাজ চালাইবার জো নাই, চাকরও চাই। শুধু যে শারীরিক ক্ষমতার অভাবে এরূপ ঘটে তাহা নহে, লোকলজ্জায় সে-হতভাগ্য সুস্থ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সত্ত্বেও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া থাকে। যাহা সহজ তাহা তাহার পক্ষে কষ্টকর, যাহা স্বাভাবিক তাহা তাহার পক্ষে লজ্জাকর হইয়া উঠে। দলের লোকের মুখ চাহিয়া তাহাকে যে-সকল অনাবশ্যক শাসনে বদ্ধ হইতে হয় তাহাতে সে সহজ মনুষ্যের বহুতর অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। পাছে তাহাকে কেহ ধনী না মনে করে এইটুকু লজ্জা সে সহিতে পারে না, ইহার জন্য পর্বতপ্রমাণ ভার তাহাকে বহন করিতে হয় এবং এই ভারে পৃথিবীতে সে পদে পদে আবদ্ধ হইয়া থাকে। তাহাকে কর্তব্য করিতে হইলেও এই-সকল ভার বহিয়া করিতে হয়, আরাম করিতে হইলেও এই-সকল ভার লইয়া করিতে হয়, ভ্রমণ করিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে এই-সকল ভার টানিয়া বেড়াইতে হয়। সুখ যে মনে, আয়োজনে নহে, এই সরল সত্যটুকু তাহাকে সর্বপ্রকার চেষ্টার দ্বারা ভুলিতে দিয়া তাহাকে সহস্রবিধ জড়পদার্থের দাসানুদাস করিয়া তোলা হয়। নিজের সামান্য প্রয়োজনগুলিকে সে এত বাড়াইয়া তোলে যে, তাহার পক্ষে ত্যাগস্বীকার অসাধ্য হয়, কষ্টস্বীকার করা অসম্ভব হইয়া উঠে। জগতে এতবড়ো বন্দী এতবড়ো পঙ্গু আর কেহ নাই। তবু কি বলিতে হইবে, এই-সকল অভিভাবক, যাহারা কৃত্রিম অক্ষমতাকে গর্বের সামগ্রী করিয়া দাঁড় করাইয়া পৃথিবীর শস্যক্ষেত্রগুলিকে কাঁটার গাছে ছাইয়া ফেলিল তাহারই সন্তানদের হিতৈষী। যাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছাপূর্বক বিলাসিতাকে বরণ করিয়া লয় তাহাদিগকে বাধা দেওয়া কাহারো সাধ্য নয়—কিন্তু শিশুরা, যাহারা ধূলামাটিকে ঘৃণা করে না, যাহারা রৌদ্রবৃষ্টিবায়ুকে প্রার্থনা করে, যাহারা সাজসজ্জা করাইতে গেলে পীড়া বোধকরে, নিজের সমস্ত ইন্দ্রিয় চালনা করিয়া জগৎকে প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখাতেই যাহাদের সুখ, নিজের স্বভাবে স্থিতি করিয়া যাহাদের লজ্জা নাই, সংকোচ নাই, অভিমান নাই, তাহাদিগকে চেষ্টার দ্বারা বিকৃত করিয়া দিয়া চিরদিনের

মতো অকর্মণ্য করিয়া দেওয়া কেবল পিতামাতার দ্বারাই সম্ভব-সেই পিতামাতার হাত হইতে এই নিরপরাধগণকে রক্ষা করো।

আমরা জানি, অনেকের ঘরে বালকবালিকা সাহেবিয়ানায় অভ্যস্ত হইতেছে। তাহারা আয়ার হাতে মানুষ হয়, বিকৃত হিন্দুস্থানি শেখে, বাংলা ভুলিয়া যায় এবং বাঙালির ছেলে বাংলাসমাজ হইতে যে শত সহস্র ভাবসূত্রে আজন্মকাল বিচিত্র রস আকর্ষণ করিয়া পরিপুষ্ট হয় সেই-সকল সজাতীয় নাড়ির যোগ হইতে তাহারা বিচ্ছিন্ন হয়-অথচ ইংরেজি সমাজের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ থাকে না। তাহারা অরণ্য হইতে উৎপাটিত হইয়া বিলাতি টিনের টবের মধ্যে বড়ো হইতেছে। আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি এই শ্রেণীর একটি ছেলে দূরহইতে কয়েকজন দেশীভাবাপন্ন আত্মীয়কে দেখিয়া তাহার মাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছে-Mamma Mamma, look, lots of Babus are coming। বাঙালির ছেলের এমন দুর্গতি আর কী হইতে পারে। বড়ো হইয়া স্বাধীন রুচি ও প্রবৃত্তি-বশত যাহারা সাহেবি চাল অবলম্বন করে তাহারা করুক, কিন্তু তাহাদের শিশু-অবস্থায় যে-সকল বাপ-মা বহু অপব্যয়ে ও বহু অপচেষ্টায় সন্তানদিগকে সকল সমাজের বাহির করিয়া দিয়া স্বদেশে অযোগ্য এবং বিদেশে অগ্রাহ্য করিয়া তুলিতেছে, সন্তানদিগকে কেবলমাত্র কিছুকাল নিজের উপার্জনের নিতান্ত অনিশ্চিত আশ্রয়ের মধ্যে বেষ্টন করিয়া রাখিয়া ভবিষ্যৎ দুর্গতির জন্য বিধিমতে প্রস্তুত করিতেছে, এই-সকল অভিভাবকদের নিকট হইতে বালকগণ দূরে থাকিলেই কি অত্যন্ত দুশ্চিন্তার কারণ ঘটবে।

আমি শেষোক্ত দৃষ্টান্তটি যে দিলাম তাহার একটু কারণ আছে। সাহেবিয়ানায় যাঁহারা অভ্যস্ত নন, এই দৃষ্টান্ত তাঁহাদিগকে প্রবলভাবে আঘাত করিবে। তাঁহারা নিশ্চয়ই মনে মনে ভাবিবেন, লোকে কেন এটুকু বুঝিতে পারে না-কেন সমস্ত ভবিষ্যৎ ভুলিয়া কেবল নিজের কতকগুলো বিকৃত অভ্যাসের অন্ধতায় ছেলেদের এমন সর্বনাশ করিতে বসে।

কিন্তু মনে রাখিবেন, যাঁহারা সাহেবিয়ানায় অভ্যস্ত তাঁহারা এই কাণ্ড অতি সহজেই করিয়া থাকেন, তাঁহারা সন্তানদের যে কোনোপ্রকার অভ্যাসদোষ ঘটাইতেছেন তাহা মনেও করিতে পারেন না। ইহাতে এইটুকু বোঝা উচিত, আমাদের নিজেদের মধ্যে যে-সকল বিশেষ বিকৃতি আছে তাহার সম্বন্ধে আমরা অনেকটা অচেতন; তাহা আমাদের কাছে এত বেশি পাইয়া বসিয়াছে যে, তাহাতে করিয়া আর-কাহারো অনিষ্ট অসুবিধা হইলেও আমরা উদাসীন থাকি। আমরা মনে করি, পরিবারের মধ্যে নানাপ্রকার রোষ দ্বেষ অন্যায় পক্ষপাত বিবাদ বিরোধ নিন্দা গ্লানি

কুঅভ্যাস কুসংস্কারের প্রাদুর্ভাব থাকিলেও পরিবার হইতে দূরে থাকাই ছেলেদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বিপদ। আমরা যাহার মধ্যে মানুষ হইয়াছি তাহারই মধ্যে আর কেহ মানুষ হইলে ক্ষতি আছে, এ কথা আমাদের মনেও আসে না। কিন্তু মানুষ করিবার আদর্শ যদি খাঁটি হয়, যদি ছেলেকে আমাদের মতোই চলনসই কাজের লোক করাকেই আমরা যথেষ্ট না মনে করি, তবে এ কথা আমাদের মনে উদয় হইবেই যে, ছেলেদিগকে শিক্ষাকালে এমন জায়গায় রাখা কর্তব্য যেখানে তাহারা স্বভাবের নিয়মে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়া ব্রহ্মচর্যপালনপূর্বক গুরুর সহবাসে জ্ঞানলাভ করিয়া মানুষ হইয়া উঠিতে পারে।

ক্রমকে গর্ভের মধ্যে এবং বীজকে মাটির মধ্যে নিজের উপযুক্ত খাদ্যের দ্বারা পরিবৃত্ত হইয়া গোপনে থাকিতে হয়। তখন দিনরাত্রি তাহার একমাত্র কাজ—খাদ্যশোষণ করিয়া নিজেকে আকাশের জন্য, আলোকের জন্য প্রস্তুত করা। তখন সে আহরণ করে না, চারদিক হইতে শোষণ করে। প্রকৃতি তাহাকে অনুকূল অন্তরালের মধ্যে আহার দিয়া বেষ্টন করিয়া রাখে—বাহিরের নানা আঘাত অপঘাত তাহার নাগাল পায় না, এবং নানা আকর্ষণে তাহার শক্তি বিভক্ত হইয়া পড়ে না।

ছাত্রদের শিক্ষাকালও তাহাদের পক্ষে এইরূপ মানসিক ক্রম অবস্থা। এই সময়ে তাহারা জ্ঞানের একটি সজীব বেষ্টনের মধ্যে দিনরাত্রি মনের খোরাকের মধ্যেই বাস করিয়া বাহিরের সমস্ত বিভ্রান্তি হইতে দূরে গোপন যাপন করিবে, ইহাই স্বাভাবিক বিধান। এই সময়ে চতুর্দিকে সমস্তই তাহাদের অনুকূল হওয়া চাই, যাহাতে তাহাদের মনের একমাত্র কাজ হয়, জানিয়া এবং না জানিয়া খাদ্যশোষণ, শক্তিসঞ্চয় এবং নিজের পুষ্টিসাধন করা।

সংসার কাজের জায়গা এবং নানা প্রবৃত্তির লীলাভূমি—সেখানে এমন অনুকূল অবস্থার সংঘটন হওয়া বড়ো কঠিন যাহাতে শিক্ষাকালে অক্ষুণ্ণভাবে ছেলেরা শক্তিলাভ এবং পরিপূর্ণ জীবনের মূলপত্তন করিতে পারে। শিক্ষা সমাধা হইলে গৃহী হইবার যথার্থ ক্ষমতা তাহাদের জন্মিবে—কিন্তু সংসারের সমস্ত প্রবৃত্তিসংঘাতের মধ্যে যথেষ্ট মানুষ হইলে গৃহস্থ হইবার উপযুক্ত মনুষ্যত্ব লাভ করা যায় না—বিষয়ী হওয়া যায়, ব্যবসায়ী হওয়া যায়, কিন্তু মানুষ হওয়া কঠিন হয়। একদিন গৃহধর্মের আদর্শ আমাদের দেশে অত্যন্ত উচ্চ ছিল বলিয়াই সমাজে তিন বর্ণকে সংসারপ্রবেশের পূর্বে ব্রহ্মচর্য-পালনের দ্বারা নিজেকে প্রস্তুত করিবার উপদেশ ও ব্যবস্থা ছিল। অনেকদিন হইতেই সে-আদর্শ হীন হইয়াছে এবং তাহার স্থলে কোনো মহৎ আদর্শই গ্রহণ

করি নাই বলিয়া আজ আমরা কেরানী সেরেস্তাদার দারোগা ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট হইয়াই সমুপ্ত থাকি—তাহার বেশি হওয়াকে মন্দ বলি না, তবে বাহুল্য বলি।

কিন্তু তাহার অনেক বেশিও বাহুল্য নয়। আমি কেবল হিন্দুর তরফে বলিতেছি না—কোনো দেশেই কোনো সমাজেই বাহুল্য নয়। অন্য দেশে ঠিক এইরূপ শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বিত হয় নাই, অথচ তাহারা লড়াই করিতেছে, বাণিজ্য করিতেছে, টেলিগ্রাফের তার খাটাইতেছে, রেলগাড়ির এঞ্জিন চালাইতেছে—এ দেখিয়া আমরা ভুলিয়াছি; এ ভুল যে সভাঙ্কলে কোনো একটা প্রবন্ধের আলোচনা করিয়াই ভাঙিবে এমন আশা করিতে পারি না। অতএব আশঙ্কা হয় আজ আমরা ‘জাতীয়’ শিক্ষাপরিষৎ রচনা করিবার সময় নিজের দেশ নিজের ইতিহাস ছাড়া সর্বত্রই নিজের খুঁজিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া আরো একটা ছাঁচেঢালা কলের ইস্কুল তৈরি করিয়া বসিব। আমরা প্রকৃতিকে বিশ্বাস করি না, মানুষের প্রতি ভরসা রাখি না, কল বৈ আমাদের গতি নাই। আমরা মনে বুঝিয়াছি নীতিপাঠের কল পাতিলেই মানুষ সাধু হইয়া উঠিবে এবং পুঁথি পড়াইবার বড়ো ফাঁদ পাতিলেই মানুষের তৃতীয় চক্ষু যে জ্ঞাননেত্র তাহা আপনি উদ্ঘাটিত হইয়া যাইবে।

দস্তুরমত একটা ইস্কুল ফাঁদার চেয়ে জ্ঞানদানের উপযুক্ত আশ্রম স্থাপন কঠিন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কঠিনকে সহজ করাই ভারতবর্ষের কাজ হইবে। কারণ, এই আশ্রমের আদর্শ আমাদের কল্পনা হইতে এখনো যায় নাই এবং যুরোপের নানাপ্রকার বিদ্যাও আমাদের গোচর হইয়াছে। বিদ্যালাভ ও জ্ঞানলাভের প্রণালীর মধ্যে আমাদের সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে হইবে। ইহাই যদি না পারিলাম তবে কেবলই নকলের দিকে মন রাখিয়া আমরা সর্বপ্রকারে ব্যর্থ হইব। অধিকার লাভ করিতে গেলেই আমরা পরের কাছে হাত পাতি এবং গড়িয়া তুলিতে গেলেই আমরা নকল করিতে বসিয়া যাই—নিজের শক্তি এবং নিজের মনের দিকে, দেশের প্রকৃতি ও দেশের যথার্থ প্রয়োজনের দিকে তাকাই না, তাকাইতে সাহসই হয় না। যে-শিক্ষার ফলে আমাদের এই দশা হইতেছে সেই শিক্ষাকেই নূতন একটা নাম দিয়া স্থাপন করিলেই যে তা নূতন ফল প্রসব করিতে থাকিবে এইরূপ আশা করিয়া নূতন আর-একটা নৈরাশ্যের মুখে অগ্রসর হইতে প্রবৃত্তি হয় না। এ কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে, যেখানে মুষলধারায় চাঁদার টাকা আসিয়া পড়ে সেইখানেই যে শিক্ষা বেশি করিয়া জমা হইতে থাকে তাহা নহে, মনুষ্যত্ব টাকায় কেনা যায় না; যেখানে কমিটির নিয়মধারা অহরহ বর্ষিত হয়, সেইখানেই যে শিক্ষাকল্পলতা তাড়াতাড়ি বাড়িয়া উঠে তাহাও নহে, শুদ্ধমাত্র নিয়মাবলী অতি উত্তম হইলেও তাহা মানুষের মনকে খাদ্য দান করে না; বহুবিধ বিষয়-পাঠনার ব্যবস্থা করিলেই যে শিক্ষায়

লাভের অঙ্ক অগ্রসর হয় তাহা নহে, মানুষ যে বাড়ে সে “ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন”। যেখানে নিভৃতে তপস্যা হয় সেইখানেই আমরা শিথিতে পারি; যেখানে গোপনে ত্যাগ, যেখানে একান্তে সাধনা সেইখানেই আমরা শক্তিলাভ করি, যেখানে সম্পূর্ণভাবে দান সেইখানেই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ সম্ভবপর; যেখানে অধ্যাপকগণ জ্ঞানের চর্চায় স্বয়ং প্রবৃত্ত সেইখানেই ছাত্রগণ বিদ্যাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়; বাহিরে বিশ্বপ্রকৃতির আবির্ভাব যেখানে বাধাহীন, অন্তরে সেইখানেই মন সম্পূর্ণ বিকশিত; ব্রহ্মচর্যের সাধনায় চরিত্র যেখানে সুস্থ এবং আব্রবশ, ধর্মশিক্ষা সেইখানেই সরল ও স্বাভাবিক; আর যেখানে কেবল পুঁথি ও মাস্টার, সেনেট ও সিণ্ডিকেট, ইন্টের কোঠা ও কাঠের আসবাব, সেখানে অঙ্গ ও আমরা যত বড়ো হইয়া উঠিয়াছি কালও আমরা তত বড়োটা হইয়াই বাহির হইব।

জাতীয় বিদ্যালয়

জাতীয়বিদ্যালয় তো বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল, এখন এই বিদ্যালয়ের উপযোগিতা যে কী সে কি যুক্তি দিয়া বুঝাইবার আর কোনো প্রয়োজন আছে।

যুক্তির অভাবে পৃথিবীতে খুব অল্প জিনিসই ঠেকিয়াছে। প্রয়োজন আছে এ কথা বুঝাইয়া দিলেই প্রয়োজনসিদ্ধি হয়, অন্তত আমাদের দেশে তাহার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমাদের অভাব তো অনেক আছে, অভাব আছে এ কথা বুঝাইবার লোকও অনেক আছে এবং এ কথা মানিবার লোকেরও অভাব নাই, তবু ইহাতে ইতর-বিশেষ কিছুই ঘটে না।

আসল কথা, যুক্তি কোনো বড়ো জিনিসের সৃষ্টি করিতে পারে না। স্ট্যাটিস্টিক্সের তালিকাযোগে লাভ, সুবিধা, প্রয়োজনের কথা বুঝাপড়া করিতে করিতে কেবল গলা ভাঙে, তাহাতে কিছু গড়ে না। শ্রোতার গবেষণার প্রশংসা করে, আর-কিছু করা আবশ্যিক বোধ করে না।

আমাদের দেশের একটা মুশকিল এই হইয়াছে, শিক্ষা বল, স্বাস্থ্য বল, সম্পদ বল, আমাদের উপরে যে কিছু নির্ভর করিতেছে, এ কথা আমরা একরকম ভুলিয়াছিলাম। অতএব এ-সকল বিষয়ে আমাদের বোঝা নাবোঝা দুই-ই প্রায় সমান ছিল। আমরা জানি, দেশের সমস্ত মঙ্গলসাধনের দায়িত্ব গবর্মেণ্টের; অতএব আমাদের অভাব কী আছে না আছে তাহা বোঝার দরুন কোনো কাজ অগ্রসর হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। এমনতরো দায়িত্ববিহীন আলোচনায় পৌরুষের ক্ষতি করে। ইহাতে পরের উপর নির্ভর আরো বাড়িয়া তোলে।

স্বদেশ যে আমাদেরই কর্মক্ষেত্র এবং আমরাই যে তাহার সর্বপ্রধান কর্মী, এমনকি, অন্য অনুগ্রহপূর্বক যতই আমাদের কর্মভার লাঘব করিবে, আমাদের স্বচেষ্টার কঠোরতাকে যতই খর্ব করিবে, ততই আমাদের বন্ধিত করিয়া কাপুরুষ করিয়া তুলিবে—এ কথা যখন নিঃসংশয়ে বুঝিব তখনই আর-আর কথা বুঝিবার সময় হইবে।

ইংরেজিতে একটা প্রবাদ শুনিতে পাই, ইচ্ছা যেখানে পথ সেখানেই আছে। এ কথা কেহ বলে না, যুক্তি যেখানে আছে পথ সেইখানেই। কিন্তু আমাদের ইচ্ছা আমাদের পথ রচনা করিতে পারে, পুরুষোচিত এই কথার প্রতি আমাদের বিশ্বাস ছিল না। আমরা জানিতাম, ইচ্ছা আমরা

করিব, কিন্তু পথ করা না করা সে অন্যের হাত-তাহাতে আমাদের হাত কেবল দরখাস্তে সই করিবার বেলায়।

এইজন্য উপযোগিতা বিচার করিয়া, অভাব বুঝিয়া, এতদিন আমরা কিছু করি নাই। পরিণামবিহীন আন্দোলন-আলোচনার দ্বারা আমাদের প্রকৃতি যথার্থ বললাভ করে নাই। এইজন্যই ইচ্ছাশক্তির প্রভাব যে কিরূপ অব্যর্থ, আমাদের নিজের মধ্যে তাহার পরিচয় পাইবার বড়োই প্রয়োজন ছিল। রাজা যে আমাদের পক্ষে কত-বড়ো অনুকূল, তাহা নহে কিন্তু ইচ্ছা যে আমাদের মধ্যে কত-বড়ো শক্তি ইহাই নিশ্চয় বুঝিবার জন্য আমাদের একান্ত অপেক্ষা ছিল। বিধাতার প্রসাদে আজ কেমন করিয়া সেই পরিচয় পাইয়াছি। আজ আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, ইচ্ছাই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য, সমস্ত সৃষ্টির গোড়াকার কথাটা ইচ্ছা। যুক্তি নহে, তর্ক নহে, সুবিধা-অসুবিধার হিসাব নহে, আজ বাঙালির মনে কোথা হইতে একটা ইচ্ছার বেগ উপস্থিত হইল এবং পরক্ষণেই সমস্ত বাধা বিপত্তি, সমস্ত দ্বিধাসংশয় বিদীর্ণ করিয়া অখণ্ড পুণ্য ফলের ন্যায় আমাদের জাতীয়বিদ্যাব্যবস্থা আকার গ্রহণ করিয়া দেখা দিল। বাঙালির হৃদয়ের মধ্যে ইচ্ছার যজ্ঞত্যাগ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল এবং সেই অগ্নিশিখা হইতে চরু হাতে করিয়া আজ দিব্যপুরুষ উঠিয়াছেন—আমাদের বহুদিনের শূন্য আলোচনার বক্ষ্যত্ব এইবার বুঝি ঘুচিবে। যাহা চেষ্টা করিয়া, কষ্ট করিয়া, তর্ক করিয়া দীর্ঘকালেও হইবার নহে—পূর্বতন সমস্ত হিসাবের খাতা খতাইয়া দেখিলে বিজ্ঞ ব্যক্তিমাট্রেই যাহাকে অসাময়িক অসম্ভব অসংগত বলিয়া সবলে পক্ষশীর্ণ চালনা করিতেন, তাহা কত সহজে, কত অল্পসময়ে আজ সত্যরূপে আবির্ভূত হইল।

অনেকদিন পরে আজ বাঙালি যথার্থভাবে একটা-কিছু পাইল। এই পাওয়ার মধ্যে কেবল যে একটা উপস্থিত লাভ আছে, তাহা নহে, ইহা আমাদের একটা শক্তি। আমাদের যে পাইবার ক্ষমতা আছে, সে ক্ষমতাটা যে কী এবং কোথায়, আমরা তাহাই বুঝিলাম। এই পাওয়ার আরম্ভ হইতে আমাদের পাইবার পথ প্রশস্ত হইল। আমরা বিদ্যালয়কে পাইলাম যে তাহা নহে, আমরা নিজের সত্যকে পাইলাম, নিজের শক্তিকে পাইলাম।

আমি আপনাদের কাছে আজ সেই আনন্দের জয়ধ্বনি তুলিতে চাই। আজ বাংলা দেশে যাহার আবির্ভাব হইল তাহাকে কিভাবে গ্রহণ করিতে হইবে তাহা যেন আমরা না ভুলি। আমরা পাঁচজনে যুক্তি করিয়া কাঠখড় দিয়া কোনোমতে কোনো একটা সুবিধার খেলনা গড়িয়া তুলি নাই। আমাদের বঙ্গমাতার সূতিকাগৃহে আজ সজীব মঙ্গল জন্মগ্রহণ করিয়াছে; সমস্ত দেশের

প্রাঙ্গণে আজ যেন আনন্দশঙ্খ বাজিয়া উঠে, আজ যেন উপটৌকন প্রস্তুত থাকে, আজ আমরা যেন কৃপণতা না করি।

সুযোগ-সুবিধার কথা কালক্রমে চিন্তা করিবার অবসর আসিবে, আজ আমাদের গৌরব অনুভব করিয়া উৎসব আরম্ভ করিতে হইবে। আমি ছাত্রদিগকে বলিতেছি, আজ তোমরা গৌরবে সমুদয় হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া স্বদেশের বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ করো—তোমরা অনুভব করো, বাঙালিজাতির শক্তির একটি সফলমূর্তি তাঁহার সিংহাসনের সম্মুখে তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন; তাঁহাকে যে পরিমাণে যথার্থরূপে তোমরা মানিবে, তিনি সেই পরিমাণে তেজ লাভ করিবেন এবং সেই তেজে আমরা সকলে তেজস্বী হইব। এই-যে জাতীয়শক্তির তেজ, ইহার কাছে ব্যক্তিগত সামান্য ক্ষতিবৃদ্ধি সমস্তই তুচ্ছ। তোমরা যদি এই বিদ্যাভবনের জন্য গৌরব অনুভব কর তবেই ইহার গৌরববৃদ্ধি হইবে। বড়ো বাড়ি, মস্ত জমি বা বৃহৎ আয়োজন ইহার গৌরব নহে; তোমাদের শ্রদ্ধা, তোমাদের নিষ্ঠা, বাঙালির আত্মসমর্পণে ইহার গৌরব। বাঙালির ইচ্ছায় ইহার সৃষ্টি, বাঙালির নিষ্ঠায় ইহার রক্ষা—ইহাই ইহার গৌরব এবং এই গৌরবই আমাদের গৌরব।

আমাদের অন্তঃকরণে যতক্ষণ পর্যন্ত গৌরববোধ না জন্মে ততক্ষণ কেবলই অন্যের সঙ্গে আমাদের অনুষ্ঠানের তুলনা করিয়া আমরা পদে পদে লজ্জিত ও হতাশ হইতে থাকি। ততক্ষণ আমাদের বিদ্যালয়ের সঙ্গে অন্য দেশের বিদ্যালয় মিলাইয়া দেখিবার প্রবৃত্তি হয়—যেটুকু মেলে সেইটুকুতেই গর্ববোধ করি, যেটুকু না মেলে সেইটুকুতেই খাটো হইয়া যাই।

কিন্তু এরূপ তুলনা কেবল নির্জীব পদার্থ সম্বন্ধেই খাটে। গজকাঠিতে বা ওজনের বাটখারায় জীবিতবস্তুর পরিমাপ হয় না। আজ আমাদের দেশে এই-যে জাতীয়-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, আমি বলিতেছি, ইহা নির্জীব ব্যাপার নহে—আমরা প্রাণ দিয়া প্রাণ সৃষ্টি করিয়াছি। সুতরাং যেখানে ইহাকে দাঁড় করানো হইল সেইখানেই ইহার শেষ নহে—ইহা বাড়িবে, ইহা চলিবে, ইহার মধ্যে বিপুল ভবিষ্যৎ রহিয়াছে, তাহার ওজন কে করিতে পারে। যে-কোনো বাঙালি নিজের প্রাণের মধ্যে এই বিদ্যালয়ের প্রাণ অনুভব করিবে সে কোনোমতেই ইঁটকাঠের দরে ইহার মূল্যনিরূপণ করিবে না—সে ইহার প্রথম আরম্ভের মধ্যে চরম পরিণামের মহতী সম্পূর্ণতা অনুভব করিবে, সেই ইহার ব্যক্ত ও অব্যক্ত সমস্তটাকে এক করিয়া সজীবসত্যের সেই সমগ্রমূর্তির নিকট আনন্দের সহিত আত্মসমর্পণ করিবে।

তাই আজ আমি ছাত্রদিগকে অনুরোধ করিতেছি, এই বিদ্যালয়ের প্রাণকে অনুভব করো—সমস্ত বাঙালিজাতির প্রাণের সঙ্গে এই বিদ্যালয়ের যে প্রাণের যোগ হইয়াছে তাহা নিজের অন্তঃকরণের মধ্যে উপলব্ধি করো—ইহাকে কোনোদিন একটা ইস্কুলমাত্র বলিয়া ভ্রম করিয়ো না। তোমাদের উপরে এই একটি মহৎ দায়িত্ব রহিল। স্বদেশের একটি পরমধনের রক্ষণভার আজ তোমাদের উপরে যতটা পরিমাণে ন্যস্ত হইল, তোমাদিগকে একান্ত ভক্তির সহিত, নম্রতার সহিত তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে। ইহাতে তপস্যার প্রয়োজন হইবে। ইতিপূর্বে অন্য কোনো বিদ্যালয় তোমাদের কাছে এত কঠোরতা দাবি করিতে পারে নাই। এই বিদ্যালয় হইতে কোনো সহজ সুবিধা আশা করিয়া ইহাকে ছোটো হইতে দিয়ো না। বিপুল চেষ্টার দ্বারা ইহাকে তোমাদের মস্তকের উর্ধ্বে তুলিয়াধরো; ইহার ক্লেশসাধ্য আদর্শকে মহত্তম করিয়া রাখো; ইহাকে কেহ যেন লজ্জা না দেয়, উপহাস করিতে না পারে, সকলেই যেন স্বীকার করে যে, আমরা শৈথিল্যকে প্রশ্রয় দিবার জন্য, জড়ত্বকে সম্মানিত করিবার জন্য বড়ো নাম দিয়া একটা কৌশল অবলম্বন করি নাই। তোমাদিগকে পূর্বাপেক্ষা যে দুরূহতর প্রয়াস, যে কঠিনতর সংযম আশ্রয় করিতে হইবে, তাহা ব্রতস্বরূপ ধর্মস্বরূপ গ্রহণ করিয়ো। কারণ, এ বিদ্যালয় তোমাদিগকে বাহিরের কোনো শাসনের দ্বারা, কোনো প্রলোভনের দ্বারা আবদ্ধ করিতে পারিবে না—ইহার বিধানকে অগ্রাহ্য করিলে তোমরা কোনো পদ বা পদবীর ভরসা হইতে ভ্রষ্ট হইবে না—কেবল তোমাদের স্বদেশকে তোমাদের ধর্মকে শিরোধার্য করিয়া, স্বজাতির গৌরব এবং নিজের চরিত্রের সম্মানকে নিয়ত স্মরণ রাখিয়া, তোমাদিগকে এই বিদ্যালয়ের সমস্ত কঠিন ব্যবস্থা স্বেচ্ছাপূর্বক অনুদ্রুত আত্মোৎসর্গের সহিত নতশিরে বহন করিতে হইবে।

আমাদের এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে যখন চিন্তা করিবে, তখন এই কথা ভাবিয়া দেখিয়ো যে, যে-দেশে জলাশয় নাই সে-দেশে আকাশের বৃষ্টিপাত ব্যর্থ হইয়া যায়। জল ধরিবার স্থান না থাকিলে বৃষ্টিধারার অধিকাংশ ব্যবহার নষ্ট হইতে থাকে। আমাদের দেশে যে জ্ঞানী গুণী ক্ষমতাসম্পন্ন লোক জন্মগ্রহণ করেন না তাহা নহে—কিন্তু তাঁহাদের জ্ঞান গুণ ও ক্ষমতা ধরিয়া রাখিবার কোনো ব্যবস্থা আমাদের দেশে নাই। তাঁহারা চাকরি করেন, ব্যবসা করেন, রোজগার করেন, পরের হুকুম মানিয়া চলেন, তাহার পরে পেনশন লইয়া ভাবিয়া পান না কেমন করিয়া দিন কাটিবে। এমন প্রত্যহ কত রাশি রাশি সামর্থ্য দেশের উপর দিয়া গড়াইয়া বহিয়া উবিয়া

চলিয়া যাইতেছে। ইহা আমরা নিশ্চয় জানি, বিধাতার অভিশাপে আমাদের দেশে যে শক্তির চিরন্তন অনাবৃষ্টি ঘটিয়াছে তাহা নহে, দেশের শক্তিকে দেশের কাজে ব্যবহারে লাগাইবার, তাহাকে কোথাও একত্রে সংগ্রহ করিবার কোনো বিধান আমরা করি নাই। এইজন্য, যে-শক্তি আছে সে-শক্তিকে প্রত্যক্ষ করিবার, অনুভব করিবার কোনো উপায় আমাদের হাতে নাই। যদি আমাদের প্রতি কেহ শক্তিহীনতার অপবাদ দেয়, তবে রাজসরকারের চাকরির ইতিবৃত্ত হইতে রায়বাহাদুরের তালিকা খুঁজিয়া বেড়াইতে হয়, নিতান্ত তুচ্ছ সাময়িক প্রতিপত্তির উষ্ণ খুঁটিয়া নিজেদের সামর্থ্য সপ্রমাণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হয়; কিন্তু তাহাতে আমরা সান্ত্বনা পাই না এবং নিজেদের প্রতি বিশ্বাস আন্তরিক হইয়া উঠে না।

এমন দুর্দশার দিনে এই জাতীয়বিদ্যালয় আমাদের বিধিদত্ত শক্তিসঞ্চয়ের একটি উপায়স্বরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। দেশের মহত্ত্ব এইখানে স্বভাবতই আকৃষ্ট হইয়া বাঙালিজাতির চিরদিনের সম্বলের মতো এই ভাণ্ডে এই ভান্ডারে রক্ষিত ও বর্ধিত হইতে থাকিবে। অতি অল্পকালের মধ্যেই কি তাহার প্রমাণ আমরা পাই নাই। এই বিদ্যালয়ে দেখিতে দেখিতে দেশের যে-সকল প্রভাবসম্পন্ন পূজ্য ব্যক্তিগণকে আমরা একত্রে লাভ করিয়াছি তাঁহাদের প্রচুর সামর্থ্য কি কেবলমাত্র আহ্বানেরই অভাবে, কেবলমাত্র যজ্ঞক্ষেত্রেরই অবর্তমানে ক্ষীণভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইত না। এ কি আমাদের কম সৌভাগ্য। দেশের গুরুজনেরা যেখানে স্বেচ্ছাপূর্বক উৎসাহের সহিত সমবেত হইতেছেন সেইখানেই দেশের ছাত্রগণের শিক্ষালাভের ব্যবস্থা হইয়াছে, এ কি আমাদের সামান্য কল্যাণ। উপযুক্ত দাতাসকলে শ্রদ্ধার সহিত দান করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিতেছেন, উপযুক্ত গ্রহীতারাও শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিবার জন্য করজোড়ে দাঁড়াইয়াছেন, এমন শুভযোগ যেখানে সেখানে দাতাও ধন্য, গ্রহীতাও ধন্য এবং সেই যজ্ঞভূমিও পুণ্যস্থান।

আমরা আক্ষেপ করিয়া থাকি যে, আমাদের দেশের লোক দেশহিতকর কাজে ত্যাগস্বীকার করিতে পারে না। কেন পারে না। তাহার কারণ, হিতকর কার্য তাহাদের সম্মুখে সত্য হইয়া দেখা দেয় না। কতকগুলো কাজের মতো কাজ আমাদের নিকটে বর্তমান থাকে, ইহা আমাদের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। না থাকিলে প্রতিদিনের তুচ্ছ স্বার্থ আমাদের কাছে অত্যন্ত বেশি সত্য হইয়া বড়ো হইয়া ওঠে। স্বীকার করি, আমরা এ পর্যন্ত দেশের মঙ্গলের জন্য তেমন করিয়া ত্যাগ করিতে পারি নাই। কিন্তু মঙ্গল যদি মূর্তি ধরিয়া আমাদের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইত তবে তাহাকে

না চিনিয়া এবং না দিয়া কি থাকিতে পারিতাম। ত্যাগস্বীকার মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু সেই ত্যাগে প্রবৃত্ত করাইবার উপলক্ষ কেবল কথার কথা হইলে চলে না; চাঁদার খাতা এবং অনুষ্ঠানপত্র আমাদের মন এবং অর্থে টান দিতে পারে না।

যে-জাতি আপনার ঘরের কাছে সত্যভাবে প্রত্যক্ষভাবে আত্মত্যাগের উপলক্ষ রচনা করিতে পারে নাই তাহার প্রাণ ক্ষুদ্র, তাহার লাভ সামান্য। সে কোম্পানির কাগজ, ব্যাঙ্কের ডিপজিট এবং চাকরির সুযোগকেই সকলের চেয়ে বড়ো করিয়া দেখিতে বাধ্য। সে কোনো মহৎ ভাবকে মনের সহিত বিশ্বাস করে না, কারণ ভাব যেখানে কেবলই ভাবমাত্র কর্মের মধ্যে যাহার আকার নাই, সে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নহে; সম্পূর্ণ সত্যের প্রবল দাবি সে করিতে পারে না। সুতরাং তাহার প্রতি আমরা অনুগ্রহের ভাব প্রকাশ করি, তাহাকে ভিক্ষুকের মতো দেখি; কখনো বা কৃপা করিয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ দিই, কখনো বা অবজ্ঞা অবিশ্বাস করিয়া তাহাকে প্রত্যাখ্যান করি। যে-দেশে মহৎ ভাব ও বৃহৎ কর্তব্যগুলি এমন কৃপাপাত্ররূপে দ্বারে দ্বারে হাত পাতিয়া বেড়ায় সে দেশের কল্যাণ নাই।

আজ জাতীয়বিদ্যালয় মঙ্গলের মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া আমাদের কাছে দেখা দিয়াছে। ইহার মধ্যে মন বাক্য এবং কর্মের পূর্ণসম্বন্ধ প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাকে আমরা কখনো অস্বীকার করিতে পারিব না। ইহার নিকটে আমাদের পূজা আহরণ করিতেই হইবে। এইরূপ পূজার বিষয় প্রতিষ্ঠার দ্বারাই জাতি বড়ো হইয়া উঠে। অতএব জাতীয়বিদ্যালয় যে কেবল আমাদের ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিয়া কল্যাণসাধন করিবে তাহা নহে, কিন্তু দেশের মাঝখানে একটি পূজার যোগ্য প্রকৃত মহৎ ব্যাপারের উপস্থিতিই লক্ষ্যে অলক্ষ্যে আমাদের মহত্ত্বের দিকে লইয়া যাইবে।

এই কথা মনে রাখিয়া আজ আমরা ইহাকে আবাহন ও অভিবাদন করিব। এই কথা মনে রাখিয়া আমরা ইহাকে রক্ষা করিব ও মান্য করিব। ইহাকে রক্ষা করা আত্মরক্ষা, ইহাকে মান্য করাই আত্মসম্মান।

কিন্তু যদি এই কথাই সত্য হয় যে, আমরা আমাদের অস্থিমজ্জার মধ্যে দাসখত বহন করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, যদি সত্য হয় যে, পরের দ্বারা তাড়িত না হইলে আমরা চলিতেই পারিব না—তবেই আমরা স্বেচ্ছাপূর্বক স্বদেশের মান্য ব্যক্তিদের শাসনে অসহিষ্ণু হইব, তবেই আমরা তাঁহাদের নিয়মের মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ করিতে গৌরববোধ করিব না, তবেই অন্যত্র

সামান্য সুযোগের জন্য আমাদের মন প্রলুব্ধ হইতে থাকিবে এবং সংযম ও শিক্ষার কঠোরতার জন্য আমাদের চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে।

কিন্তু এ-সকল অশুভ কল্পনাকে আজ মনে স্থান দিতে চাই না। সম্মুখে পথ সুদীর্ঘ এবং পথও দুর্গম; আশার পাথেয় দ্বারা হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া আজ যাত্রা আরম্ভ করিতে হইবে। উদয়াচলের অরুণচ্ছটার ন্যায় এই আশা এবং বিশ্বাসই পৃথিবীর সমস্ত সৌভাগ্যবান জাতির মহদ্দিনের প্রথম সূচনা করিয়াছে। এই আশাকে, এই বিশ্বাসকে আমরা আজ কোথাও লেশমাত্র ক্ষুণ্ণ হইতে দিব না। এই আশার মধ্যে কোথাও যেন দুর্বলতা, বিশ্বাসের মধ্যে কোথাও যেন সাহসের অভাব না থাকে। নিজের মধ্যে নিজেকে যেন আজ দীন বলিয়া অনুভব না করি। ইহা যেন পূর্ণভাবে বুঝিতে পারি, আমাদের দেশের মধ্যে, আমাদের দেশবাসী প্রত্যেকের মধ্যে, বিধাতার একটি অপূর্ব অভিপ্রায় নিহিত আছে। সে-অভিপ্রায় আর-কোনো দেশের আর-কোনো জাতির দ্বারা সিদ্ধ হইতেই পারে না। আমরা পৃথিবীকে যাহা দিব, তাহা আমাদের নিজের দান হইবে, তাহা অন্যের উচ্ছিষ্ট হইবে না। আমাদের পিতামহগণ তপোবনের মধ্যে সেই দানের সামগ্রী প্রস্তুত করিতেছিলেন; আমরাও নানা দুঃখের দাহে, নানা দুঃসহ আঘাতের তাড়নায় সেই সামগ্রীর বিচিত্র উপকরণকে একত্রে বিগলিত করিয়া তাহাকে গঠনের উপযোগী করিয়া তুলিতেছি; তাঁহাদের সেই তপস্যা, আমাদের এই দুর্বহ দুঃখ কখনোই ব্যর্থ হইবে না।

জগতের মধ্যে ভারতবাসীর যে-একটি বিশেষ অধিকার আছে, সেই অধিকারের জন্য আমাদের জাতীয়বিদ্যালয় আমাদের প্রস্তুত করিবে, আজ এই মহতী আশা হৃদয়ে লইয়া আমরা এই নূতন বিদ্যাভবনের মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হইলাম। সুশিক্ষার লক্ষণ এই যে তাহা মানুষকে অভিভূত করে না, তাহা মানুষকে মুক্তিদান করে। এতদিন আমরা ইন্সকুলকলেজে যে শিক্ষালাভ করিতেছিলাম, তাহাতে আমাদের পরাস্ত করিয়াছে। আমরা তাহা মুখস্থ করিয়াছি, আবৃত্তি করিয়াছি, শিক্ষালব্ধ বাঁধিবচনগুলিকে নিঃসংশয়ে চূড়ান্তসত্য বলিয়া প্রচার করিতেছি। যে-ইতিহাস ইংরেজি কেতাবে পড়িয়াছি তাহাই আমাদের একমাত্র ইতিহাসের বিদ্যা। যে-পোলিটিকাল ইকনমি মুখস্থ করিয়াছি, তাহাই আমাদের একমাত্র পোলিটিকাল ইকনমি। যাহা-কিছু পড়িয়াছি, তাহা আমাদের ভূতের মতো পাইয়া বসিয়াছে; সেই পড়া-বিদ্যা আমাদের মুখ দিয়া কথা বলাইতেছে, বাহির হইতে মনে হইতেছে যেন আমরাই কথা বলিতেছি। আমরা মনে করিতেছি, পোলিটিকাল সভ্যতা ছাড়া সভ্যতার আর-কোনো আকার হইতেই পারে না।

আমরা স্থির করিয়াছি, যুরোপীয় ইতিহাসের মধ্য দিয়া যে পরিণাম প্রকাশ পাইয়াছে, জাতিমাত্রেরই সেই একমাত্র সদগতি। যাহা অন্য দেশের শাস্ত্রসম্মত তাহাকেই আমরা হিত বলিয়া জানি এবং আগাগোড়া অন্য দেশের প্রণালী অনুসরণ করিয়া আমরা স্বদেশের হিতসাধন করিতে ব্যগ্র।

মানুষ যদি এমন করিয়া শিক্ষার নীচে চাপা পড়িয়া যায়, সেটাকে কোনোমতেই মঙ্গল বলিতে পারি না। আমাদের যে শক্তি আছে তাহারই চরম বিকাশ হইবে, আমরা যাহা হইতে পারি তাহাই সম্পূর্ণভাবে হইব-ইহাই শিক্ষার ফল। আমরা চলন্ত পুঁথি হইব, অধ্যাপকের সজীব নোটবুক হইয়া বুক ফুলাইয়া বেড়াইব, ইহা গর্বের বিষয় নহে। আমরা জগতের ইতিহাসকে নিজের স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে দেখিতে সাহস করিলাম কই, আমরা পোলিটিকাল ইকনমিকে নিজের স্বাধীন গবেষণার দ্বারা যাচাই করিলাম কোথায়। আমরা কী, আমাদের সার্থকতা কিসে, ভারতবর্ষকে বিধাতা যে-ক্ষেত্রে দাঁড় করাইয়াছেন সে-ক্ষেত্রে হইতে মহাসত্যের কোন্ মূর্তি কী ভাবে দেখা যায়, শিক্ষার দ্বারা বলপ্রাপ্ত হইয়া তাহা আমরা আবিষ্কার করিলাম কই। আমরা কেবল :

ভয়ে ভয়ে যাই, ভয়ে ভয়ে চাই
ভয়ে ভয়ে শুধু পুঁথি আওড়াই।

হায়, শিক্ষা আমাদের পরাভূত করিয়া ফেলিয়াছে।

আজ আমি আশা করিতেছি, এবারে আমরা শিক্ষার নাগপাশ কাটিয়া ফেলিয়া শিক্ষার মুক্ত অবস্থায় উত্তীর্ণ হইব। আমরা এতকাল যেখানে নিভৃতে ছিলাম, আজ সেখানে সমস্ত জগৎ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, নানা জাতির ইতিহাস তাহার বিচিত্র অধ্যায় উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে, দেশদেশান্তর হইতে যুগযুগান্তরের আলোকতরঙ্গ আমাদের চিত্তকে নানা দিকে আঘাত করিতেছে—জ্ঞানসামগ্রীর সীমা নাই, ভাবের পণ্য বোঝাই হইয়া উঠিল—এখন সময় আসিয়াছে, আমাদের দ্বারের সম্মুখবর্তী এই মেলায় আমরা বালকের মতো হতবুদ্ধি হইয়া কেবল পথ হারাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইব না—সময় আসিয়াছে যখন ভারতবর্ষের মন লইয়া এই-সকল নানাস্থানের বিক্ষিপ্ত বিচিত্র উপকরণের উপর সাহসের সহিত গিয়া পড়িব, তাহাদিগকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইব, আমাদের চিত্ত তাহাদিগকে একটি অপূর্ব ঐক্য দান করিবে, আমাদের

চিন্তাক্ষেত্রে তাহারা যথাযথস্থানে বিভক্ত হইয়া একটি অপরূপ ব্যবস্থায় পরিণত হইবে; সেই ব্যবস্থার মধ্যে সত্য নূতন দীপ্তি, নূতন ব্যাপ্তি লাভ করিবে এবং মানবের জ্ঞানভাণ্ডারে তাহা নূতন সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হইয়া উঠিবে। ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী জানিয়াছিলেন, উপকরণের মধ্যে অমৃত নাই; বিদ্যারই কী আর বিষয়েরই কী, উপকরণ আমাদেরকে আবদ্ধ করে, আচ্ছন্ন করে; চিত্ত যখন সমস্ত উপকরণকে জয় করিয়া অবশেষে আপনাকেই লাভ করে তখনই সে অমৃত লাভ করে। ভারতবর্ষকেও আজ সেই সাধনা করিতে হইবে—নানা তথ্য, নানা বিদ্যার ভিতর দিয়া পূর্ণতরূপে নিজেকে উপলব্ধি করিতে হইবে; পাণ্ডিত্যের বিদেশী বেড়ি ভাঙিয়া ফেলিয়া পরিণতজ্ঞানে জ্ঞানী হইতে হইবে। আজ হইতে “ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ”—হে দেবগণ, আমরা কান দিয়া যেন ভালো করিয়া শুনি, বই দিয়া না শুনি; “ভদ্রং পশ্যেমান্ধভির্যজত্রাঃ”—হে পূজ্যগণ, আমরা চোখ দিয়া যেন ভালো করিয়া দেখি, পরের বচন দিয়া না দেখি। জাতীয়বিদ্যালয় আবৃত্তিগত ভীষ্মবিদ্যার গণ্ডি হইতে বাহির করিয়া আমাদের বন্ধনজর্জর বুদ্ধির মধ্যে উদার সাহস ও স্বাতন্ত্র্যের সঞ্চার করিয়া যেন দেয়। পাঠ্যপুস্তকটির সঙ্গে আমাদের যে কথাটি না মিলিবে তাহার জন্য আমরা যেন লজ্জিত না হই। এমন-কি, আমরা ভুল করিতেও সংকোচবোধ

করিব

না।

কারণ, ভুল করিবার অধিকার যাহার নাই, সত্যকে আবিষ্কার করিবার অধিকারও সে পায় নাই। পরের শত শত ভুল জড়ভাবে মুখস্থ করিয়া রাখার চেয়ে সচেষ্টভাবে নিজে ভুল করা অনেক ভালো। কারণ, যে চেষ্টা ভুল করায় সেই চেষ্টাই ভুলকে লঙ্ঘন করাইয়া লইয়া যায়। যাহাই হউক, যেমন করিয়াই হউক, শিক্ষার দ্বারা আমরা যে পূর্ণপরিণত আমরাই হইব—আমরা যে ইংরেজি লেকচারের ফোনোগ্রাফ, বিলিতি অধ্যাপকের শিকলবাঁধা দাঁড়ের পাখি হইব না, এই একান্ত আশ্বাস হৃদয়ে লইয়া আমি আমাদের নূতন প্রতিষ্ঠিত জাতীয়বিদ্যালয়কে আজ প্রণাম করি। এখানে আমাদের ছাত্রগণ যেন শুদ্ধমাত্র বিদ্যা নহে, তাহারা যেন শ্রদ্ধা, যেন নিষ্ঠা, যেন শক্তি লাভ করে—তাহারা যেন অভয় প্রাপ্ত হয়, দ্বিধাবর্জিত হইয়া তাহারা যেন নিজেকে নিজে লাভ করিতে পারে, তাহারা যেন অস্থিমজ্জার মধ্যে উপলব্ধি করে :

সর্বং পরবশং দুঃখং সর্বমাত্মবশং সুখম্।

তাহাদের অন্তরে যেন এই মহামন্ত্র সর্বদাই ধ্বনিত হইতে থাকে :

ভূমৈব সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি।

যাহা ভূমা যাহা মহান তাহাই সুখ, অল্পে সুখ নাই।

ভারতবর্ষের প্রাচীন তপোবনে ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ গুরু মুক্তিকাম ছাত্রগণকে যে-মন্ত্রে আহ্বান করিয়াছিলেন সে-মন্ত্র বহুদিন এ দেশে ধ্বনিত হয় নাই। আজ আমাদের বিদ্যালয় সেই গুরুর স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া ব্রহ্মপুত্র এবং ভাগীরথীর তীরে তীরে এই বাণী প্রেরণ করিতেছেন :

যথাপঃ প্রবতা যন্তি যথা মাসা অহর্জরম্, এবং মাং ব্রহ্মচারিণো ধাতরায়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা।

জলসকল যেমন নিম্নদেশে গমন করে, মাসসকল যেমন সংবৎসরের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি সকল দিক হইতে ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকটে আসুন-স্বাহা।
সহ বীর্যং করবাবহৈ।

আমরা উভয়ে মিলিত হইয়া যেন বীর্য প্রকাশ করি।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু।

তেজস্বিভাবে আমাদের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হউক।
মা বিদ্বিষাবহৈ।

আমরা পরস্পরের প্রতি যেন বিদ্বেষ না করি।
ভদ্রনো অপি বাতয় মনঃ।

হে দেব, আমাদের মনকে মঙ্গলের প্রতি সবেগে প্রেরণ করো।

আবরণ

পায়ের তেলোটি এমন করিয়া তৈরি হইয়াছিল যে, খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া পৃথিবীতে চলিবার পক্ষে এমন ব্যবস্থা আর হইতে পারে না। যেদিন হইতে জুতা পরিতে শুরু করিলাম, সেই দিন হইতে তেলোকে মাটির সংস্রব হইতে বাঁচাইয়া তাহার প্রয়োজনকেই মাটি করিয়া দেওয়া গেল। পদতল এতদিন অতি সহজেই আমাদের ভার বহন করিতেছিল, এখন হইতে পদতলের ভার আমাদের লইতে হইল। এখন খালিপায়ে পথে চলিতে হইলে পদতল আমাদের সহায় না হইয়া পদে পদে দুঃখের কারণ হইয়া উঠে। শুধু তাই নয়, ওটাকে লইয়া সর্বদাই সতর্ক থাকিতে হয়; মনকে নিজের পদতলের সেবায় নিযুক্ত না রাখিলে বিপদ ঘটে। ওখানে ঠাণ্ডা লাগিলেই হাঁচি, জল লাগিলেই জ্বর—অবশেষে মোজা, চটি, গোড়তলা জুতা, বুট প্রভৃতি বিবিধ উপচারে এই প্রত্যঙ্গটির পূজা করিয়া ইহাকে সকল কর্মের বাহির করিয়া দেওয়া হয়। ঈশ্বর আমাদের খুর দেন নাই বলিয়া ইহা তাঁহার প্রতি একপ্রকার অনুযোগ।

এইরূপে বিশ্বজগৎ এবং আমাদের স্বাধীনশক্তির মাঝখানে আমরা সুবিধার প্রলোভনে অনেকগুলো বেড়া তুলিয়া দিয়াছি। এইরূপে সংস্কার ও অভ্যাসক্রমে সেই কৃত্রিম আশ্রয়গুলোকেই আমরা সুবিধা এবং নিজের স্বাভাবিক শক্তিগুলোকেই অসুবিধা বলিয়া জানিয়াছি। কাপড় পরিয়া পরিয়া এমনি করিয়া তুলিয়াছি যে, কাপড়টাকে নিজের চামড়ার চেয়ে বড়ো করা হইয়াছে। এখন আমরা বিধাতার সৃষ্ট আমাদের এই আশ্চর্য সুন্দর অনাবৃত শরীরকে অবজ্ঞা করি।

কিন্তু কাপড়জুতাকে একটা অন্ধসংস্কারের মতো জড়াইয়া ধরা আমাদের এই গরম দেশে ছিল না। এক তো সহজেই আমাদের কাপড় বিরল ছিল; তাহার পরে, বালককালে ছেলেমেয়েরা অনেকদিন পর্যন্ত কাপড়জুতা না পরিয়া উলঙ্গ শরীরের সঙ্গে উলঙ্গ জগতের যোগ অসংকোচে অতি সুন্দরভাবে রক্ষা করিয়াছে। এখন আমরা ইংরেজের নকল করিয়া শিশুদেহের জন্যও লজ্জাবোধ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। শুধু বিলাতফেরত নহে, শহরবাসী সাধারণ বাঙালি গৃহস্থও আজকাল বাড়ির বালককে অতিথির সামনে অনাবৃত দেখিলে সংকোচবোধ করেন এবং এইরূপে ছেলেটাকেও নিজের দেহসম্বন্ধে সংকুচিত করিয়া তোলেন।

এমনি করিয়া আমাদের দেশের শিক্ষিতলোকদের মধ্যে একটা কৃত্রিম লজ্জার সৃষ্টি হইতেছে। যে-বয়স পর্যন্ত শরীরসম্বন্ধে আমাদের কোনো কুষ্ঠা থাকা উচিত নয়, সে-বয়স আর পার হইতে দিতে পারিতেছি না—এখন আজনুকাল মানুষ আমাদের পক্ষে লজ্জার বিষয় হইয়া উঠিতেছে। শেষকালে কোন্ এক দিন দেখিব, চৌকিটেবিলের পায়া ঢাকা না দেখিলেও আমাদের কর্ণমূল আরক্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

শুধু লজ্জার উপর দিয়াই যদি যাইত, আক্ষেপ করিতাম না। কিন্তু ইহা পৃথিবীতে দুঃখ আনিতেছে। আমাদের লজ্জার দায়ে শিশুরা মিথ্যা কষ্ট পায়। এখনো তাহারা প্রকৃতির খাতক, সভ্যতার ঋণ তাহারা গ্রহণ করিতেই চাহে না। কিন্তু বেচারাদের জোর নাই; এক কান্না সম্বল। অভিভাবকদের লজ্জানিবারণ ও গৌরববৃদ্ধি করিবার জন্য লেস ও সিল্কের আবরণে বাতাসের সোহাগ ও আলোকের চুম্বন হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহারা চীৎকারশব্দে বধির বিচারকের কর্ণে শিশুজীবনের অভিযোগ উত্থাপিত করিতে থাকে। জানে না, বাপমায়ে একজিক্যুটিভ ও জুডিশ্যাল একত্র হওয়াতে তাহার সমস্ত আন্দোলন ও আবেদন বৃথা হইয়া যায়।

আর দুঃখ অভিভাবকের। অকাললজ্জার সৃষ্টি করিয়া অনাবশ্যক উপসর্গ বাড়ানো হইল। যাহারা ভদ্রলোক নহে, সরল শিশুমাত্র, তাহাদিগকেও একেবারে শুরু হইতেই অর্থহীন ভদ্রতা ধরাইয়া অর্থের অপব্যয় করা আরম্ভ হইল—উলঙ্গতার একটা সুবিধা তাহার মধ্যে প্রতিযোগিতা নাই। কিন্তু কাপড় ধরাইলেই শখের মাত্রা, আড়ম্বরের আয়োজন রেষারেষি করিয়া বাড়িয়া চলিতে থাকে। শিশুর নবনীতকোমল সুন্দর দেহ ধনাভিমান-প্রকাশের উপলক্ষ হইয়া উঠে; ভদ্রতার বোঝা অকারণে অপরিমিত হইতে থাকে।

এ-সমস্ত ডাক্তারির বা অর্থনীতির তর্ক তুলিব না। আমি শিক্ষার দিক হইতে বলিতেছি। মাটি-জল-বাতাসআলোর সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ না থাকিলে শরীরের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। শীতে গ্রীষ্মে কোনোকালে আমাদের মুখটা ঢাকা থাকে না, তাই আমাদের মুখের চামড়া দেহের চামড়ার চেয়ে বেশি শিক্ষিত—অর্থাৎ বাহিরের সঙ্গে কী করিয়া আপনার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে হয়, তাহা সে ঠিক জানে। সে আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ; তাহাকে কৃত্রিম আশ্রয় প্রায় লইতে হয় না।

এ কথা বলা বাহুল্য, আমি ম্যাঞ্জেস্টারকে ফতুর করিবার জন্য ইংরেজের রাজ্যে উলঙ্গতা প্রচার করিতে বসি নাই। আমার কথা এই যে, শিক্ষা করিবার একটা বয়স আছে, সেটা বাল্যকাল। সেই সময়টাতে আমাদের শরীরমনের পরিণতিসাধনের জন্য প্রকৃতির সঙ্গে

আমাদের বাধাবিহীন যোগ থাকা চাই। সে-সময়টা ঢাকাঢাকির সময় নয়, তখন সভ্যতা একেবারেই অনাবশ্যক। কিন্তু সেই বয়স হইতেই শিশুর সঙ্গে সভ্যতার সঙ্গে লড়াই আরম্ভ হইতেছে দেখিয়া বেদনাবোধ করি। শিশু আচ্ছাদন ফেলিয়া দিতে চায়, আমরা তাহাকে আচ্ছন্ন করিতে চাই। বস্তুত এ ঝগড়া তো শিশুর সঙ্গে নয়, এ ঝগড়া প্রকৃতির সঙ্গে। প্রকৃতির মধ্যে যে পুরাতন জ্ঞান আছে, তাহাই কাপড় পরাইবার সময় শিশু ক্রন্দনের মধ্য হইতে প্রতিবাদ করিতে থাকে; আমরাই তো তাহার কাছে শিশু।

যেমন করিয়া হউক, সভ্যতার সঙ্গে একটা রফা দরকার। অন্তত একটা বয়স পর্যন্ত সভ্যতার এলেকাকে সীমাবদ্ধ করা চাই। আমি খুব কম করিয়া বলিতেছি, সাত বছর। সে পর্যন্ত শিশুর সজ্জায় কাজ নাই, লজ্জায় কাজ নাই। সে-পর্যন্ত বর্বরতার যে অত্যাৱশ্যক শিক্ষা, তাহা প্রকৃতির হাতে সম্পন্ন হইতে দিতে হইবে। বালক তখন যদি পৃথিবীমায়ের কোলে গড়াইয়া ধূলামাটি না মাখিয়া লইতে পারে, তবে কবে তাহার সে সৌভাগ্য হইবে। সে তখন যদি গাছে চড়িয়া ফল পাড়িতে না পায়, তবে হতভাগা ভদ্রতার লোকলজ্জায় চিরজীবনের মতো গাছপালার সঙ্গে অন্তরঙ্গ সখ্য-সাধনে বঞ্চিত হইবে। এই সময়টায় বাতাসে আকাশ মাঠ গাছপালার দিকে তাহার শরীরমনের যে-একটা স্বাভাবিক টান আছে—সব জায়গা হইতেই তার যে-একটা নিমন্ত্রণ আসে, সেটাতে যদি কাপড়-চোপড় দরজা-দেওয়ালের ব্যাঘাতস্থাপন করা যায়, তবে ছেলেটার সমস্ত উদ্যম অবরুদ্ধ হইয়া তাহাকে হুঁচড়ে পাকায়। খোলা পাইলে যে উৎসাহ স্বাস্থ্যকর হইত, বদ্ধ হইয়া তাহাই দূষিত হইতে থাকে।

ছেলেকে কাপড় পরাইলেই কাপড়ের জন্য তাহাকে সাবধানে রাখিতে হয়। ছেলেটার দাম আছে কি না সে কথা সব সময়ে মনে থাকে না, কিন্তু দরজির হিসাব ভোলা শক্ত। এই কাপড় ছিঁড়িল, এই কাপড় ময়লা হইল, আহা সেদিন এত টাকা দিয়া এমন সুন্দর জামা করাইয়া দিলাম, লক্ষ্মীছাড়া ছেলে কোথা হইতে তাহাতে কালি মাখাইয়া আনিল, এই বলিয়া যথোচিত চপেটাঘাত ও কানমলার যোগে শিশুজীবনের সকল খেলা সকল আনন্দের চেয়ে কাপড়কে যে কী প্রকারে খাতির করিয়া চলিতে হয়, শিশুকে তাহা শিখানো হইয়া থাকে। যেকোপড়ে তাহার কোনো প্রয়োজন নাই সে-কাপড়ের জন্য বেচারাকে এ বয়সে এমন করিয়া দায়ী করা কেন; বেচারাদের জন্য ঈশ্বর বাহিরে যে কয়টা অবাধ সুখের আয়োজন, এবং মনের মধ্যে অব্যাহত সুখ-সন্তোগের ক্ষমতা দিয়াছিলেন, অতি অকিঞ্চিৎকর পোশাকের মমতায় তাহার জীবনারম্ভের সেই সরল আনন্দের লীলাক্ষেত্রে অকারণে এমন বিঘ্নসংকুল করিয়া তুলিবার কী প্রয়োজন

ছিল। মানুষ কি সকল জায়গাতেই নিজের ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও তুচ্ছ প্রবৃত্তির শাসন বিস্তার করিয়া কোথাও স্বাভাবিক সুখশান্তির স্থান রাখিবে না। আমার ভালো লাগে, অতএব যেমন করিয়া হউক উহারও ভালো লাগা উচিত, এই জবরদস্তির যুক্তিতে কি জগতের চারি দিকে কেবলই দুঃখ বিস্তার করিতে হইবে।

যাই হউক, প্রকৃতির দ্বারা যেটুকু করিবার, তাহা আমাদের দ্বারা কোনোমতেই হয় না, অতএব মানুষের সমস্ত ভালো কেবল আমরা বুদ্ধিমানেরাই করিব এমন পণ না করিয়া প্রকৃতিকেও খানিকটা পথ ছাড়িয়া দেওয়া চাই। সেইটে গোড়ায় হইলেই ভদ্রতার সঙ্গে কোনো বিরোধ বাধে না এবং ভিত্তি পাকা হয়। এই প্রাকৃতিক শিক্ষা যে কেবল ছেলেদের তাহা নহে, ইহাতে আমাদেরও উপকার আছে। আমরা নিজের হাতের কাজে সমস্ত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়া সেইটেতেই আমাদের অভ্যাসকে এমন বিকৃত করি যে, স্বাভাবিককে আর কোনোমতেই সহজদৃষ্টিতে দেখিতে পারি না। আমরা যদি মানুষের সুন্দর শরীরকে নির্মল বাল্য অবস্থাতেও উলঙ্গ দেখিতে সর্বদাই অভ্যস্ত না থাকি তবে বিলাতের লোকের মতো শরীর সম্বন্ধে যে একটা বিকৃত সংস্কার মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয় তাহা যথার্থই বর্বর এবং লজ্জার যোগ্য।

অবশ্য, ভদ্রসমাজে কাপড়চোপড় জুতামোজার একটা প্রয়োজন আছে বলিয়াই ইহাদের সৃষ্টি হইয়াছে; কিন্তু এই-সকল কৃত্রিম সহায়কে প্রভু করিয়া তুলিয়া তাহার কাছে নিজেকে কুণ্ঠিত করিয়া রাখা সংগত নয়। এই বিপরীত ব্যাপারে কখনোই ভালো ফল হইতে পারে না। অন্তত ভারতবর্ষের জলবায়ু এরূপ যে, আমাদের এই সকল উপকরণের চিরদাস হওয়ার কোনো প্রয়োজনই নাই; কোনোকালে আমরা ছিলামও না। আমরা প্রয়োজনমত কখনো বা বেশভূষা ব্যবহার করিয়াছি, কখনো বা তাহা খুলিয়াও রাখিয়াছি। বেশভূষা জিনিসটা যে নৈমিত্তিক-ইহা আমাদের প্রয়োজন সাধন করে মাত্র, এই প্রভুত্বটুকু আমাদের বরাবর ছিল। এইজন্য খোলা গায়ে আমরা লজ্জিত হইতাম না এবং অন্যকে দেখিলেও আমাদের রাগ হইত না। এ সম্বন্ধে বিধাতার প্রসাদে যুরোপীয়দের চেয়ে আমাদের বিশেষ সুবিধা ছিল। আমরা আবশ্যিকমত লজ্জারক্ষাও করিয়াছি, অথচ অনাবশ্যক অতিলজ্জার দ্বারা নিজেকে ভারগ্রস্ত করি নাই।

এ কথা মনে রাখিতে হইবে, অতিলজ্জা লজ্জাকে নষ্ট করে। কারণ অতিলজ্জাই বস্তুত লজ্জাজনক। তা ছাড়া, অতি-র বন্ধন মানুষ যখন একবার ছিঁড়িয়া ফেলে, তখন তাহার আর

বিচার থাকে না। আমাদের মেয়েরা গায়ে বেশি কাপড় দেয় না মানি, কিন্তু তাহারা কোনোক্রমেই ইচ্ছা করিয়া সচেষ্টভাবে বুকপিঠের আবরণের বারো-আনা বাদ দিয়া পুরুষসমাজে বাহির হইতে পারে না। আমরা লজ্জা করি না, কিন্তু লজ্জাকে এমন করিয়া আঘাতও করি না।

কিন্তু লজ্জাতত্ত্ব সম্বন্ধে আমি আলোচনা করিতে বসি নাই, অতএব ও কথা থাক্। আমার কথা এই, মানুষের সভ্যতা কৃত্রিমের সহায়তা লইতে বাধ্য, সেইজন্যই এই কৃত্রিম যাহাতে অভ্যাসদোষে আমাদের কর্তা হইয়া না উঠে, যাহাতে আমরা নিজের গড়া সামগ্রীর চেয়ে সর্বদাই উপরে মাথা তুলিয়া থাকিতে পারি, এ দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখা দরকার। আমাদের টাকা যখন আমাদিগকেই কিনিয়া বসে, আমাদের ভাষা যখন আমাদের ভাবের নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইয়া মারে, আমাদের সাজ যখন আমাদের অঙ্গকে অনাবশ্যক করিবার জো করে, আমাদের নিত্য যখন নৈমিত্তিকের কাছে অপরাধীর মতো কুণ্ঠিত হইয়া থাকে, তখন সভ্যতার সমস্ত বুলিকে অগ্রাহ্য করিয়া এ কথা বলিতেই হইবে, এটা ঠিক হইতেছে না। ভারতবাসীর খালি-গা কিছুমাত্র লজ্জার নহে; যে সভ্যব্যক্তির চোখে ইহা অসহ্য, সে আপনার চোখের মাথা খাইয়া বসিয়াছে।

শরীর সম্বন্ধে কাপড়-জুতা-মোজা যেমন, আমাদের মন সম্বন্ধে বই জিনিসটা ঠিক তেমনি হইয়া উঠিয়াছে। বইপড়াটা যে শিক্ষার একটা সুবিধাজনক সহায়মাত্র, তাহা আর আমাদের মনে হয় না; আমরা বইপড়াটাকেই শিক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া ঠিক করিয়া বসিয়া আছি। এ সম্বন্ধে আমাদের সংস্কারকে নড়ানো বড়োই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

মাষ্টার বই হাতে করিয়া শিশুকাল হইতেই আমাদিগকে বই মুখস্থ করাইতে থাকেন। কিন্তু বইয়ের ভিতর হইতে জ্ঞানসঞ্চয় করা আমাদের মনের স্বাভাবিক ধর্ম নহে। প্রত্যক্ষ জিনিসকে দেখিয়া-শুনিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া সঙ্গে সঙ্গেই অতি সহজেই আমাদের মননশক্তির চর্চা হওয়া স্বভাবের বিধান ছিল। অন্যের অভিজ্ঞাত ও পরীক্ষিত জ্ঞান, তাও লোকের মুখ হইতে শুনিলে তবে আমাদের সমস্ত মন সহজে সাড়া দেয়। কারণ, মুখের কথা তো শুধু কথা নহে, তাহা মুখের কথা। তাহার সঙ্গে প্রাণ আছে; চোখমুখের ভঙ্গি, কণ্ঠের স্বরলীলা, হাতের ঈঙ্গিত-ইহার দ্বারা কানে শুনিবার ভাষা, সংগীত ও আকার লাভ করিয়া চোখ কান দুয়েরই সামগ্রী হইয়া উঠে। শুধু তাই নয়, আমরা যদি জানি, মানুষ তাহার মনের সামগ্রী সদ্য মন হইতে আমাদিগকে দিতেছে, সে একটা বই পড়িয়া মাত্র যাইতেছে না, তাহা হইলে মনের সঙ্গে মনের প্রত্যক্ষ সম্মিলনে জ্ঞানের মধ্যে রসের সঞ্চগর হয়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের মাস্টাররা বই পড়াইবার একটা উপলক্ষমাত্র; আমরাও বই পড়িবার একটা উপসর্গ। ইহাতে ফল হইয়াছে এই, আমাদের শরীর যেমন কৃত্রিম জিনিসের আড়ালে পড়িয়া পৃথিবীর সঙ্গে গায়ে-গায়ে যোগটা হারাইয়াছে এবং হারাইয়া এমন অভ্যস্ত হইয়াছে যে, সে-যোগটাকে আজ ক্লেশকর লজ্জাকর বলিয়া মনে করে—তেমনি আমাদের মন এবং বাহিরের মাঝখানে বই আসিয়া পড়াতে আমাদের মন জগতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগের স্বাদ-শক্তি অনেকটা হারাইয়া ফেলিয়াছে। সব জিনিসকে বইয়ের ভিতর দিয়া জানিবার একটা অস্বাভাবিক অভ্যাস আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গেছে। পাশেই যে-জিনিসটা আছে, সেইটেকেই জানিবার জন্য বইয়ের মুখ তাকাইয়া থাকিতে হয়। নবাবের গল্প শুনিয়াছি, জুতাটা ফিরাইয়া দিবার জন্য চাকরের অপেক্ষা করিয়া শত্রুহস্তে বন্দী হইয়াছিল। বইপড়া বিদ্যার গতিকে আমাদেরও মানসিক নবাবি তেমনি অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। তুচ্ছ বিষয়টুকুর জন্যও বই নহিলে মন আশ্রয় পায় না। বিকৃত সংস্কারের দোষে এইরূপ নবাবিয়ানা আমাদের কাছে লজ্জাকর না হইয়া গৌরবজনক হইয়া উঠে, এবং বইয়ের ভিতর দিয়া জানাকেই আমরা পাণ্ডিত্য বলিয়া গর্ব করি। জগৎকে আমরা মন দিয়া ছুঁই না, বই দিয়া ছুঁই।

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়। বাবু নামক জীব চাকর-বাকর জিনিসপত্রের সুবিধার অধীন। নিজের চেষ্টাপ্রয়োগে যেটুকু কষ্ট, যেটুকু কাঠিন্য আছে, সেইটুকুতেই যে আমাদের সুখ সত্য হয়, আমাদের লাভ মূল্যবান হইয়া উঠে, বাবু তাহা বোঝে না। বইপড়া বাবুয়ানাতেও জ্ঞানকে নিজে পাওয়ার যে একটা আনন্দ, সত্যকে তাহার যথাস্থানে কঠিন প্রেমাভিসারের দ্বারায় লাভ করার যে একটা সার্থকতা, তাহা থাকে না। ক্রমে মনের সেই স্বাভাবিক স্বাধীনশক্তিটাই মরিয়া যায়, সুতরাং সেই শক্তিচালনার সুখটাও থাকে না, বরঞ্চ চালনা করিতে বাধ্য হইলে তাহা কষ্টের কারণ হইয়া উঠে।

এইরূপে বইপড়ার আবরণে মন শিশুকাল হইতে আপাদমস্তক আবৃত হওয়াতে আমরা মানুষের সঙ্গে সহজভাবে মেলানেশা করিবার শক্তি হারাইতেছি। আমাদের কাপড়পরা শরীরের যেমন একটা সংকোচ জন্মিয়াছে, আমাদের মনেরও তেমনি ঘটিয়াছে—সে বাহিরে আসিতেই চায় না। লোকজনদের সহজে আদর-অভ্যর্থনা করা, তাহাদের সঙ্গে আপনভাবে মিলিয়া কথাবার্তা কওয়া আমাদের শিক্ষিতলোকদের পক্ষে ক্রমশই কঠিন হইয়া উঠিতেছে, তাহা

আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি। আমরা বইয়ের লোককে চিনি, পৃথিবীর লোককে চিনি না; বইয়ের লোক আমাদের পক্ষে মনোহর, পৃথিবীর লোক শ্রান্তিকর। আমরা বিরাট সভায় বক্তৃতা করিতে পারি, কিন্তু জনসাধারণের সঙ্গে কথাবার্তা কহিতে পারি না। যখন আমরা বড়ো কথা, বইয়ের কথা লইয়া আলোচনা করিতে পারি, কিন্তু সহজ আলাপ, সামান্য কথা আমাদের মুখ দিয়া ঠিকমত বাহির হইতে চায় না, তখন বুঝিতে হইবে দৈবদুর্যোগে আমরা পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছি, কিন্তু আমাদের মানুষটি মারা গেছে। মানুষের সঙ্গে মানুষভাবে আমাদের অব্যবহৃত গতিবিধি থাকিলে ঘরের বার্তা, সুখদুঃখের কথা, ছেলেপুলের খবর, প্রতিদিনের আলোচনা আমাদের পক্ষে সহজ ও সুখকর হয়। বইয়ের মানুষ তৈরি-করা কথা বলে, তাহারা যে-সকল কথায় হাসে তাহা প্রকৃতপক্ষেই হাস্যরসাত্মক, তাহারা যাহাতে কাঁদে তাহা করুণরসের সার; কিন্তু সত্যকার মানুষ যে রক্তমাংসের প্রত্যক্ষগোচর মানুষ, সেইখানেই যে তাহার মস্ত জিত-এইজন্য তাহার কথা, তাহার হাসিকান্না অত্যন্ত পয়লা নম্বরের না হইলেও চলে। বস্তুত সে স্বভাবত যাহা তাহার চেয়ে বেশি হইবার আয়োজন না করিলেই সুখের বিষয় হয়। মানুষ বই হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিলে তাহাতে মানুষের স্বাদ নষ্ট হইয়া যায়।

চাণক্য বুঝি বলিয়া গেছেন, বিদ্যা যাহাদের নাই, তাহারা 'সভামধ্যে ন শোভন্তে'। কিন্তু সভা তো চিরকাল চলে না। এক সময়ে তো সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া আলো নিবাইয়া দিতেই হয়। মুশকিল এই যে, আমাদের দেশের এখনকার বিদ্বানরা সভার বাহিরে 'ন শোভন্তে'; তাহারা বইপড়ার মধ্যে মানুষ, তাই মানুষের মধ্যে তাহাদের কোনো সোয়াস্তি নাই।

এরূপ অবস্থার স্বাভাবিক পরিণাম নিরানন্দ। একটা সৃষ্টিছাড়া মানসিক ব্যাধি যুরোপের সাহিত্যে সমাজে সর্বত্র প্রকাশ পাইতেছে, তাহাকে সে দেশের লোকে বলে world-weariness। লোকের স্নায়ু বিকল হইয়া গেছে; জীবনের স্বাদ চলিয়া গেছে; নব নব উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া নিজেকে ভুলাইবার চেষ্টা চলিতেছে। এই অসুখ, এই বিকলতা যে কিসের জন্য, কিছুই বুঝিবার জো নাই। এই অবসাদ মেয়ে-পুরুষ উভয়কেই পাইয়া বসিয়াছে।

স্বভাব হইতে ক্রমশই অনেক দূরে চলিয়া যাওয়া ইহার কারণ। কৃত্রিম সুবিধা উত্তরোত্তর আকাশপ্রমাণ হইয়া জগতের জীবকে জগৎছাড়া করিয়া দিয়াছে। পুঁথির মধ্যে মন, আসবাবের মধ্যে শরীর প্রচ্ছন্ন হইয়া আত্মার সমস্ত দরজা-জানলাগুলোকে অवरুদ্ধ করিয়াছে। যাহা সহজ, যাহা নিত্য, যাহা মূল্যহীন বলিয়াই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান, তাহার সঙ্গে আনাগোনা বন্ধ হওয়াতে তাহা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা চলিয়া গেছে। যে-সকল জিনিস উত্তেজনার নব নব তাড়নায়

উদ্ভাবিত হইয়া দুই-চারিদিন ফ্যাশানের আবর্তে আবিল হইয়া উঠে এবং তাহার পরেই অনাদরে আবর্জনার মধ্যে জমা হইয়া সমাজের বাতাসকে দূষিত করে, তাহাই কেবল পুনঃপুনঃ লক্ষ লক্ষ গুণী ও মজুরের চেষ্টাকে সমস্ত সমাজ জুড়িয়া ঘানির বলদের মতো ঘুরাইয়া মারিতেছে।

এক বই হইতে আর-এক বই উৎপন্ন হইতেছে, এক কাব্যগ্রন্থ হইতে আর-এক কাব্যগ্রন্থের জন্ম, একজনের মত মুখে মুখে সহস্রলোকের মত হইয়া দাঁড়াইতেছে; অনুকরণ হইতে অনুকরণের প্রবাহ চলিয়াছে; এমনি করিয়া পুঁথি ও কথার অরণ্য মানুষের চার দিকে নিবিড় হইয়া উঠিতেছে, প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ ক্রমশই দূরে চলিয়া যাইতেছে। মানুষের অনেকগুলি মনের ভাব উৎপন্ন হইতেছে যাহা কেবল পুঁথির সৃষ্টি। এই-সকল বাস্তবতাবর্জিত ভাবগুলো ভূতের মতো মানুষকে পাইয়া বসে; তাহার মনের স্বাস্থ্য নষ্ট করে; তাহাকে অত্যাতি এবং আতিশয্যের দিকে লইয়া যায়; সকলে মিলিয়া ক্রমাগতই একই ধুয়া ধরিয়া কৃত্রিম উৎসাহের দ্বারা সত্যের পরিমাণ নষ্ট করিয়া তাহাকে মিথ্যা করিয়া তোলে। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলিতে পারি, প্যাট্রিয়টিজম-নামক পদার্থ। ইহার মধ্যে যেটুকু সত্য ছিল, প্রতিদিন সকলে পড়িয়া সেটাকে তুলা ধুনিয়া একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা করিয়া তুলিয়াছে; এখন এই তৈরি বুলিটাকে প্রাণপণ চেষ্টায় সত্য করিয়া তুলিবার জন্য কত কৃত্রিম উপায়, কত অলীক উদ্দীপনা, কত অন্যায় শিক্ষা, কত গড়িয়া-তোলা বিদ্বেষ, কত কূট যুক্তি, কত ধর্মের ভান সৃষ্ট হইতেছে তাহার সীমা সংখ্যা নাই। এই-সকল স্বভাবভ্রষ্ট কুহেলিকার মধ্যে মানুষ বিভ্রান্ত হয়—সরল ও উদার, প্রশান্ত ও সুন্দর হইতে সে কেবল দূরে চলিয়া যাইতে থাকে। কিন্তু বুলির মোহ ভাঙানো বড়ো শক্ত। বস্তুকে আক্রমণ করিয়া ভূমিসাৎ করা যায়, বুলির গায়ে ছুরি বসে না। এইজন্য বুলি লইয়া মানুষে মানুষে যত ঝগড়া, যত রক্তপাত হইয়াছে, এমন তো বিষয় লইয়া হয় নাই।

সমাজে সরল অবস্থায় দেখিতে পাই, লোকে যেটুকু জানে তাহা মানে। সেটুকুর প্রতি তাহাদের নিষ্ঠা অটল; তাহার জন্য ত্যাগস্বীকার, কষ্টস্বীকার তাহাদের পক্ষে সহজ। ইহার কতকগুলি কারণ আছে; কিন্তু একটি প্রধান কারণ, তাহাদের হৃদয় মন মতের দ্বারা আবৃত হইয়া যায় নাই; যতটুকু সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার অধিকার ও শক্তি তাহাদের আছে ততটুকুই তাহারা গ্রহণ করিয়াছে। মন যাহা সত্যরূপে গ্রহণ করে, হৃদয় তাহার জন্য অনেক ক্লেশ অনায়াসেই সহিতে পারে; সেটাকে সে বাহাদুরি বলিয়া মনেই করে না।

সভ্যতার জটিল অবস্থায় দেখা যায়, মতের বহুতর স্তর জমিয়া গেছে। কোনোটা চার্চের মত, চর্চার মত নহে; কোনোটা সভার মত, ঘরের মত নহে; কোনোটা দলের মত, অন্তরের মত

নহে; কোনো মতে চোখ দিয়া জল বাহির হয়, পকেট হইতে টাকা বাহির হয় না; কোনো মতে টাকাও বাহির হয়, কাজও চলে—কিন্তু হৃদয়ে তাহার স্থান নাই, ফ্যাশানে তাহার প্রতিষ্ঠা। এই-সকল অবিশ্রাম-উৎপন্ন ভূরি ভূরি সত্যবিকারের মাঝখানে পড়িয়া মানুষের মন সত্য-মতকেও অবিচলিত সত্যরূপে গ্রহণ করিতে পারে না। এইজন্য তাহার আচরণ সর্বত্র সর্বতোভাবে সত্য হইতে পারে না। সে সরলভাবে আপন শক্তি ও প্রকৃতি অনুযায়ী কোনো পন্থা নির্বাচন করিবার অবকাশ না পাইয়া বিভ্রান্তভাবে দশের কথায় পুনরাবৃত্তি করিতে থাকে, অবশেষে কাজের বেলায় তাহার প্রকৃতির মধ্যে বিরোধ বাধিয়া যায়। সে যদি নিজের স্বভাবকে নিজে পাইত, তবে সেই স্বভাবের ভিতর দিয়া যাহা-কিছু পাইত, তাহা ছোটো হউক বড়ো হউক খাঁটি জিনিস হইত। তাহা তাহাকে সম্পূর্ণ বল দিত, সম্পূর্ণ আশ্রয় দিত; সে তাহাকে সর্বতোভাবে কাজে না খাটাইয়া থাকিতে পারিত না। এখন তাহাকে গোলেমালে পড়িয়া পুঁথির মত, মুখের মত, সভার মত, দলের মত লইয়া ধ্রুবলক্ষ্যদ্রষ্ট হইয়া কেবল বিস্তর কথা আওড়াইয়া বেড়াইতে হয়। সেই কথা আওড়াইয়া বেড়ানোকে সে হিতকর্ম বলিয়া মনে করে; সেজন্য সে বেতন পায়; তাহা বেচিয়া সে লাভ করে; এই-সকল কথার একটুখানি এদিক-ওদিক লইয়া সে অন্য সম্প্রদায়, অন্য জাতিকে হয় এবং নিজের জাতি ও দলকে শ্রদ্ধেয় বলিয়া প্রচার করে।

মানুষের মনের চারি দিকে এই-যে অতিনিবিড় পুঁথির অরণ্যে বুলির বোল ধরিয়াছে, ইহার মোদোগন্ধে আমাদিগকে মাতাল করিতেছে, শাখা হইতে শাখান্তরে কেবলই চঞ্চল করিয়া মারিতেছে; কিন্তু যথার্থ আনন্দ, গভীর তৃপ্তি দিতেছে না। নানাপ্রকার বিদ্রোহ ও মনোবিকার উৎপন্ন করিতেছে।

সহজ জিনিসের গুণ এই যে, তাহার স্বাদ কখনোই পুরাতন হয় না, তাহার সরলতা তাহাকে চিরদিন নবীন করিয়া রাখে। যাহা যথার্থস্বভাবের কথা, তাহা মানুষ যতবার বলিয়াছে ততবারই নূতন লাগিয়াছে। পৃথিবীতে গুটি-দুইতিন মহাকাব্য আছে যাহা সহস্রবৎসরেও ম্লান হয় নাই; নির্মল জলের মতো তাহা আমাদের পিপাসা হরণ করিয়া তৃপ্তি দেয়, মদের মতো তাহা আমাদিগকে উত্তেজনার ডগার উপরে তুলিয়া শুষ্ক অবসাদের মধ্যে আছাড় মারিয়া ফেলে না। সহজ হইতে দূরে আসিলেই একবার উত্তেজনা ও একবার অবসাদের মধ্যে কেবলই ঢেঁকি-কোটা হইতে হয়। উপকরণবহুল অতিসভ্যতার ইহাই ব্যাধি।

এই জঙ্গলের ভিতর দিয়া পথ বাহির করিয়া, এই রাশীকৃত পুঁথি ও বচনের আবরণ ভেদ করিয়া, সমাজের মধ্যে, মানুষের মনের মধ্যে স্বভাবের বাতাস ও আলোক আনিবার জন্য মহাপুরুষ এবং হয়তো মহাবিপ্লবের প্রয়োজন হইবে। অত্যন্ত সহজ কথা, অত্যন্ত সরল সত্যকে হয়তো রক্তসমুদ্র পাড়ি দিয়া আসিতে হইবে। যাহা আকাশের মতো ব্যাপক, যাহা বাতাসের মতো মূল্যহীন, তাহাকে কিনিয়া উপার্জন করিয়া লইতে হয়তো প্রাণ দিতে হইবে। যুরোপের মনোরাজ্যে ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাতের অশান্তি মাঝে মাঝে প্রায়ই দেখা দিতেছে; স্বভাবের সঙ্গে জীবনের, বহিঃ প্রকৃতির সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতির প্রকাণ্ড অসামঞ্জস্যই ইহার কারণ।

কিন্তু যুরোপের এই বিকৃতি কেবল অনুকরণের দ্বারা, কেবল ছোঁয়াচ লাগিয়া আমরা পাইতেছি। ইহা আমাদের দেশজ নহে। আমরা শিশুকাল হইতে বিলাতি বই মুখস্থ করিতে লাগিয়া গেছি; যাহা আবর্জনা তাহাও লাভ মনে করিয়া লইতেছি। আমরা যে-সকল বিদেশী বুলি সর্বদাই অসন্দ্বিগ্ধমনে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যবহার করিয়া চলিতেছি, জানি না, তাহার প্রত্যেকটিকে অবিশ্বাসের সহিত আদিসত্যের নিকষপাথরে ঘষিয়া যাচাই করিয়া লওয়া চাই— তাহার বারো-আনা কেবল পুঁথির সৃষ্টি, কেবল তাহারা মুখে মুখেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে, দশজনে পরস্পরের অনুকরণ করিয়া বলিতেছে বলিয়া আর-দশজনে তাহাকে ধ্রুবসত্য বলিয়া গণ্য করিতেছে। আমরাও সেই-সকল বাঁধিগৎ এমন করিয়া ব্যবহার করিতেছি, যেন তাহার সত্য আমরা আবিষ্কার করিয়াছি—যেন তাহা বিদেশী ইন্সকুলমাষ্টারের আবৃত্তির জড় প্রতিধ্বনিমাত্র নহে।

আবার, যাহারা নূতন পড়া আওড়াইতেছে, তাহাদের উৎসাহ কিছু বেশি হইয়া থাকে। সুশিক্ষিত টিয়াপাখি যত উচ্চস্বরে কানে তালা ধরায়, তাহার শিক্ষকের গলা তত চড়া নয়। শুনা যায়, যে-সব জাতির মধ্যে বিলাতি সভ্যতা নূতন প্রবেশ করে, তাহারা বিলাতের মদ ধরিয়া একেবারে মারা পড়িবার জো হয়, অথচ যাহাদের অনুকরণে তাহারা মদ ধরে তাহারা মদে এত বেশি অভিভূত হয় না। তেমনি দেখা যায়, যে সকল কথার মোহে কথার সৃষ্টিকর্তারা অনেকটা পরিমাণে অবিচলিত থাকে, আমরা তাহাতে একেবারে ধরাশায়ী হইয়া যাই। সেদিন কাগজে দেখিলাম, বিলাতের কোন এক সভায় আমাদের দেশী লোকেরা একজনের পর আর- একজন উঠিয়া ভারতবর্ষে স্ত্রী-শিক্ষার অভাব ও সেই অভাবপূরণ সম্বন্ধে অতি পুরাতন বিলাতি বুলি দাঁড়ের পাখির মতো আওড়াইয়া গেলেন; শেষকালে একজন ইংরেজ উঠিয়া ভারতবর্ষের মেয়েদের ইংরেজি কায়দায় সেখানোই যে একমাত্র শিক্ষানামের যোগ্য, এবং সেই শিক্ষাই

আমাদের স্ত্রীলোকের পক্ষে যে একমাত্র শ্রেয়, সে-সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। আমি দুই পক্ষের তর্কের সত্যমিথ্যা সম্বন্ধে কোনো কথা তুলিতেছি না। কিন্তু বিলাতে প্রচলিত দস্তুর ও মত যে গন্ধমাদনের মতো আদ্যোপান্ত উৎপাটন করিয়া আনিবার যোগ্য, এ সম্বন্ধে আমাদের মনে বিচার মাত্র উপস্থিত হয় না তাহার কারণ, ছেলেবেলা হইতে এ-সব কথা আমরা পুঁথি হইতেই শিখিয়াছি এবং আমাদের যাহা-কিছু শিক্ষা সমস্তই পুঁথির শিক্ষা।

বুলি ও পুঁথির বিবরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাদের দেশেও শিক্ষিত লোকের মধ্যে নিরানন্দ দেখা দিয়াছে। কোথায় হৃদ্যতা, কোথায় মেলামেশা, কোথায় সহজ হাস্যকৌতুক। জীবনযাত্রার ভার বাড়িয়া গেছে বলিয়াই যে এতটা অবসন্নতা, তাহা নহে। সে একটা কারণ বটে, সন্দেহ নাই; আমাদের সহিত সর্বপ্রকার সামাজিক যোগবিহীন আত্মীয়তাশূন্য রাজশক্তির অহরহ অলক্ষ্য চাপও আর-একটা কারণ; কিন্তু সেইসঙ্গে আমাদের অত্যন্ত কৃত্রিম লেখাপড়ার তাড়নাও কম কারণ নহে। নিতান্ত শিশুকাল হইতে তাহার পেষণ আরম্ভ হয়; এই জ্ঞানলাভের সঙ্গে মনের সঙ্গে যোগ অতি অল্প। এ জ্ঞান আনন্দের জন্যও নহে, এ কেবল প্রাণের দায়ে এবং কতকটা মানের দায়েও বটে।

আমরা মন খাটাইয়া সজীবভাবে যে-জ্ঞান উপার্জন করি, তাহা আমাদের মজ্জার সঙ্গে মিশিয়া যায়; বই মুখস্থ করিয়া যাহা পাই তাহা বাহিরে জড়ো হইয়া সকলের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটায়। তাহাকে আমরা কিছুতেই ভুলিতে পারি না বলিয়া অহংকার বাড়িয়া উঠে; সেই অহংকারের যেটুকু সুখ সেই আমাদের একমাত্র সম্বল। নহিলে জ্ঞানের স্বাভাবিক আনন্দ আমরা যদি লাভ করিতাম তবে এতগুলি শিক্ষিতলোকের মধ্যে অন্তত গুটিকয়েককেও দেখিতে পাইতাম যাঁহারা জ্ঞানচর্চার জন্য নিজের সমস্ত স্বার্থকে খর্ব করিয়াছেন। কিন্তু দেখিতে পাই, সায়েন্সের পরীক্ষায় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া ডেপুটিম্যাজিস্ট্রেট হইয়া সমস্ত বিদ্যা আইন-আদালতের অতলস্পর্শ নিরর্থকতার মধ্যে চিরদিনের মতো বিসর্জন করিতে সকলে ব্যগ্র এবং কতকগুলো পাস করিয়া কেবল হতভাগা কন্যার পিতাকে ঋণের পক্ষে ডুবাইয়া মারাই তাঁহাদের একমাত্র স্থায়ী কীর্তি হইয়া থাকে। দেশে বড়ো বড়ো শিক্ষিত উকিল-জজ-কেরানীর অভাব নাই, কিন্তু জ্ঞানতপস্বী কোথায়।

কথায় কথায় কথা অনেক বাড়িয়া গেল। উপস্থিতমত আমার যেটুকু বক্তব্য সে এই বইপড়াটাই যে শেখা, ছেলেদের মনে এই অন্ধসংস্কার যেন জন্মিতে দেওয়া না হয়। প্রকৃতির অক্ষয়ভাণ্ডার হইতেই যে বইয়ের সঞ্চয় আহরিত হইয়াছে, অন্তত হওয়া উচিত এবং সেখানে

যে আমাদেরও অধিকার আছে, এ কথা পদে পদে জানানো চাই। বইয়ের দৌরাত্ম্য অত্যন্ত বেশি হইয়াছে বলিয়াই বেশি করিয়া জানানো চাই। এ দেশে অতি পুরাকালে যখন লিপি প্রচলিত ছিল তখনো তপোবনে পুঁথিব্যবহার হয় নাই। তখনো গুরু শিষ্যকে মুখে মুখেই শিক্ষা দিতেন, এবং ছাত্র তাহা খাতায় নহে, মনের মধ্যেই লিখিয়া লইত। এমনি করিয়া এক দীপশিখা হইতে আর-এক দীপশিখা জ্বলিত। এখন ঠিক এমনটি হইতে পারে না। কিন্তু যথাসম্ভব ছাত্রদিগকে পুঁথির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে হইবে। পারতপক্ষে ছাত্রদিগকে পরের রচনা পড়িতে দেওয়া নহে—তাহারা গুরুর কাছে যাহা শিখিবে, তাহাদের নিজেকে দিয়া তাহাই রচনা করিয়া লইতে হইবে; এই স্বরচিত গ্রন্থই তাহাদের গ্রন্থ। এমন হইলে তাহারা মনেও করিবে না, গ্রন্থগুলা আকাশ হইতে পড়া বেদবাক্য। 'আর্যরা মধ্য-এশিয়া হইতে ভারতে আসিয়াছেন', 'খৃষ্টজন্মের দুই হাজার বৎসর পূর্বে বেদরচনা হইয়াছে', এই-সকল কথা আমরা বই হইতে পড়িয়াছি—বইয়ের অক্ষরগুলো কাটকুটহীন নির্বিকার; তাহারা শিশুবয়সে আমাদের উপরে সম্মোহন প্রয়োগ করে—তাই আমাদের কাছে আজ এ-সমস্ত কথা একেবারে দৈববাণীর মতো। ছেলেদের প্রথম হইতেই জানাইতে হইবে, এই-সকল আনুমানিক কথা কতকগুলো যুক্তির উপর নির্ভর করিতেছে। সেই-সকল যুক্তির মূল উপকরণগুলি যথাসম্ভব তাহাদের সম্মুখে ধরিয়া তাহাদের নিজেদের অনুমানশক্তির উদ্রেক করিতে হইবে। বইগুলো যে কী করিয়া তৈরি হইতে থাকে তাহা প্রথম হইতেই অল্পে অল্পে ক্রমে ক্রমে তাহারা নিজেদের মনের মধ্যে অনুভব করিতে থাকুক; তাহা হইলেই বইয়ের যথার্থ ফল তাহারা পাইবে, অথচ তাহার অন্ধশাসন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে, এবং নিজের স্বাধীন উদ্যমের দ্বারা জ্ঞানলাভ করিবার যে স্বাভাবিক মানসিক শক্তি, তাহা ঘাড়ের উপরে-বাহির-হইতে-বোঝা-চাপানো বিদ্যার দ্বারায় আচ্ছন্ন ও অভিভূত হইবে না-বইগুলোর উপরে মনের কর্তৃত্ব অক্ষুন্ন থাকিবে। বালক অল্পমাত্রাও যেটুকু শিখিবে, তখনই তাহা প্রয়োগ করিতে শিখিবে; তাহা হইলে শিক্ষা তাহার উপরে চাপিয়া বসিবে না, শিক্ষার উপর সে-ই চাপিয়া বসিবে। এ কথায় সায় দিয়া যাইতে অনেকে দ্বিধা করেন না, কিন্তু কাজে লাগাইবার বেলা আপত্তি করেন। তাঁহারা মনে করেন, বালকদিগকে এমন করিয়া শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। তাঁহারা যাহাকে শিক্ষা বলেন, তাহা এমন করিয়া দেওয়া অসম্ভব বটে। তাঁহারা কতকগুলো বই ও কতকগুলো বিষয় বাঁধিয়া দেন—নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট প্রণালীতে তাহার পরীক্ষা লওয়া হয়—ইহাকেই তাঁহারা বিদ্যাশিক্ষা-দেওয়া বলেন এবং

যেখানে সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাকেই বিদ্যালয় বলা হয়। বিদ্যা জিনিসটা যেন একটা স্বতন্ত্র পদার্থ; শিশুর মন হইতে সেটাকে যেন তফাত করিয়া দেখিতে হয়; সেটা যেন বইয়ের পাতা এবং অক্ষরের সংখ্যা, তাহাতে ছাত্রের মন যদি পিষিয়া যায়, সে যদি পুঁথির গোলাম হয়, তাহার স্বাভাবিক বুদ্ধি যদি অভিভূত হইয়া পড়ে, সে যদি নিজের প্রাকৃতিক ক্ষমতাগুলি চালনা করিয়া জ্ঞান অধিকার করিবার শক্তি অনভ্যাস ও উৎপীড়ন-বশত চিরকালের মতো হারায়, তবু ইহা বিদ্যা-কারণ ইহা এতটুকু ইতিহাসের অংশ, এতগুলি ভূগোলের পাতা, এত ক'টা অক্ষ এবং এতটা পরিমাণ বি-এল-এ ব্লে, সি-এল-এ ক্লে! শিশুর মন যতটুকু শিক্ষার উপরে সম্পূর্ণ কর্তৃত্বলাভ করিতে পারে, অল্প হইলেও সেইটুকু শিক্ষাই শিক্ষা; আর যাহা শিক্ষানাম ধরিয়া তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয় তাহাকে পড়ানো বলিতে পারো, কিন্তু তাহা শেখানো নহে। মানুষের পরে মানুষ অনেক অত্যাচার করিবে জানিয়াই বিধাতা তাহাকে শক্ত করিয়া গড়িয়াছেন; সেইজন্য গুরুপাক অখাদ্য খাইয়া অজীর্ণে ভুগিয়াও মানুষ বাঁচিয়া থাকে, এবং শিশুকাল হইতে শিক্ষার দুর্বিষহ উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও সে খানিকটা পরিমাণে বিদ্যালাভও করে ও তাহা লইয়া গর্বও করিতে পারে। এই তাড়নায় ও পীড়নে তাহাকে যে কতটা লোকসান দিতে হয়, কী বিপুল মূল্য দিয়া সে যে কত অল্পই ঘরে আনিতে পায় তাহা কেহ বা বুঝেন না, কেহ বা বুঝেন স্বীকার করেন না, কেহ বা বুঝেন ও স্বীকার করেন কিন্তু কাজের বেলায় যেমন চলিয়া আসিতেছে তাহাই চালাইতে থাকেন।

সংযোজন

স্ত্রীশিক্ষা

আমরা শ্রীমতী লীলা মিত্রের কাছ হইতে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে একখানি চিঠি পাইয়াছি, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিবার যোগ্য। চিঠিখানি এই-

এক দল লোক বলেন, স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন নাই, কারণ স্ত্রীলোক শিক্ষিতা হইলে পুরুষের নানা বিষয়ে নানা অসুবিধা। শিক্ষিতা স্ত্রী স্বামীকে দেবতা বলিয়া মনে করে না, স্বামীসেবায় তার তেমন মন থাকে না, পড়াশুনা লইয়াই সে ব্যস্ত ইত্যাদি।

আবার আর-এক দল বলেন, স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন খুবই আছে, কেননা আমরা পুরুষরা শিক্ষিত, আমরা যাহাদের লইয়া ঘরসংসার করিব তাহারা যদি আমাদের ভাব চিন্তা আশা আকাঙ্ক্ষা বুঝিতেই না পারে তবে আমাদের পারিবারিক সুখের ব্যাঘাত হইবে ইত্যাদি।

দুই দলই নিজেদের দিক হইতে স্ত্রীশিক্ষার বিচার করিতেছেন। নারীর যে পুরুষের মতো ব্যক্তিত্ব আছে, সে যে অন্যের জন্য সৃষ্ট নয়, তাহার নিজের জীবনের যে সার্থকতা আছে, তাহা স্ত্রীশিক্ষার স্বপক্ষের বা বিপক্ষের কোনো উকিল স্বীকার করেন না। উকিলরা যে পক্ষ লইয়াছেন বস্তুত তাহা তাঁহাদের নিজেরই পক্ষ। মামলার নিষ্পত্তিতে যাঁহাদের প্রকৃত স্বার্থ তাঁহাদের কথা কাহারো মনে উদয় হয় না, এইটেই আশ্চর্য।

বিদ্যা যদি মনুষ্যত্বলাভের উপায় হয় এবং বিদ্যালাভে যদি মানবমাত্রেরই সহজাত অধিকার থাকে তবে নারীকে কোন্ নীতির দোহাই দিয়া সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইতে পারে বুঝিতে পারি না।

আবার, যাঁরা স্ত্রীলোককে তাঁহাদের নিজের জন্যই সৃষ্ট বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়াছেন, তাঁরা যেটুকু বিদ্যা স্ত্রীর জন্য উচ্ছিষ্ট রাখিতে চান তাহা হইতে স্ত্রীলোকের মনুষ্যত্বের যথোচিত পুষ্টি আশা করা বাতুলতা।

যাঁহারা শিক্ষাদানে স্ত্রী-পুরুষ উভয়কেই সমভাবে সাহায্য করিতে প্রস্তুত তাঁহারা সাধারণ পুরুষের পঙ্ক্তি পড়েন না; তাঁহাদের আসন অনেক উচ্চে, সুতরাং তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দেওয়াই উচিত।

অতএব, গরজ যাঁহাদের তাঁহাদিগকেই কার্যক্ষেত্রে নামিতে হইবে। নিজের উদ্যমে ও শক্তিতে নিজেকে মুক্ত না করিলে অন্যে মুক্তি দিতে পারে না। অন্যে যেটাকে মুক্তি বলিয়া উপস্থিত করে সেটা বন্ধনেরই অন্য মূর্তি। পুরুষ যে স্ত্রীশিক্ষার ছাঁচ গড়িয়াছে সেটা পুরুষের খেলার যোগ্য পুতুল গড়িবার ছাঁচ।

কিন্তু যিনি এ কার্যে অবতীর্ণ হইবেন তাঁহাকে সাধারণ স্ত্রীলোকের মতো গতানুগতিক হইলে চলিবে না। সংসারের লোকে যাহাকে সুখ বলে সেটাকে তিনি আদর্শ করিবেন না। এ কথা তাঁহাকে মনে রাখিতে হইবে, সন্তান গর্ভে ধারণ করাই তাঁহার চরম সার্থকতা নয়। তিনি পুরুষের আশ্রিতা, লজ্জাভয়ে লীনাঙ্গিনী, সামান্য ললনা নহেন; তিনি তাহার সংকটে সহায়, দুরূহ চিন্তায় অংশী এবং সুখে দুঃখে সহচরী হইয়া সংসারপথে তাহার প্রকৃত সহযাত্রী হইবেন।—

এই চিঠির মূল কথাটা আমি মানি। যাহা-কিছ জানিবার যোগ্য তাহাই বিদ্যা, তাহা পুরুষকেও জানিতে হইবে, মেয়েকেও জানিতে হইবে— শুধু কাজে খাটাইবার জন্য যে তাহা নয়, জানিবার জন্যই।

মানুষ জানিতে চায়, সেটা তার ধর্ম; এইজন্য জগতের আবশ্যক অনাবশ্যক সকল তত্ত্বই তার কাছে বিদ্যা হইয়া উঠিয়াছে।

সেই তার জানিতে চাওয়াকে যদি খোরাক না জোগাই কিংবা তাকে কুপথ্য দিয়া ভুলাইয়া রাখি তবে তার মানবপ্রকৃতিকেই দুর্বল করি, এ কথা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু, মানুষকে পুরা পরিমাণে মানুষ করিব এ কথা আমাদের সকলের অন্তরের কথা নয়। যখন সর্বসাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব হয় তখন এক দল ক্ষিণিত লোক বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা চাকর পাইব কোথা হইতে? বোধ হয় শীঘ্রই এ সম্বন্ধে রসিক লোকে প্রহসন লিখিবেন যাহাতে দেখা যাইবে—বাবুর চাকর কবিতা লিখিতেছে কিংবা নক্ষত্রলোকের নাড়িনক্ষত্র গণনা করিবার জন্য বড়ো বড়ো অঙ্ক ফাঁদিয়া বসিয়াছে, বাবু তাহাকে ধুতি কোঁচাইবার জন্য ডাকিতে সাহস করিতেছেন না পাছে তার ধ্যানের ব্যাঘাত হয়। মেয়েদের সম্বন্ধেও সেই এক কথা যে, তারা যদি লেখাপড়া শেখে তবে যে ঝাঁটা ঝাঁটি ও শিলনোড়া বাবুদের ভাগে পড়ে।

অথচ ইঁহাদের তর্কের যুক্তিটা এই যে, মেয়েদের প্রকৃতিই স্বতন্ত্র। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তাঁহাদের ভয়টা কিসের? পৃথিবীকে আমরা চ্যাপ্টা ভাবি কিন্তু তাহা গোল, এ কথা জানিলে পুরুষের পৌরুষ কমে না। তেমনি, বাসুকির মাথার উপর পৃথিবী নাই এ খবরটা পাইলে

মেয়েদের মেয়েলিভাব নষ্ট হইবে এ কথা যদি বলি তবে বুঝিতে হইবে, মেয়েরা মেয়েই নয়, আমরা তাহাদিগকে অজ্ঞানের ছাঁচে ঢালিয়া মেয়ে করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছি।

বিধাতা একদিন পুরুষকে পুরুষ এবং মেয়েকে মেয়ে করিয়া সৃষ্টি করিলেন, এটা তাঁর একটা আশ্চর্য উদ্ভাবন, সে কথা কবি হইতে আরম্ভ করিয়া জীবতত্ত্ববিৎ সকলেই স্বীকার করেন। জীবলোকে এই যে একটা ভেদ ঘটিয়াছে এই ভেদের মুখ দিয়া একটা প্রবল শক্তি এবং পরম আনন্দের উৎস উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে। ইস্কুল-মাস্টার কিংবা টেক্সটবুক-কমিটি তাঁহাদের এক্সেসাইজের খাতা কিংবা পাঠ্য ও অপাঠ্য বইয়ের বোঝা দিয়া এই শক্তি এবং সৌন্দর্যপ্রবাহের মুখে বাঁধ বাঁধিয়া দিতে পারেন, এমন কথা আমি মানি না। মোটের উপর, বিধাতা এবং ইস্কুল-মাস্টার এই দুইয়ের মধ্যে আমি বিধাতাকে বেশি বিশ্বাস করি। সেইজন্য আমার ধারণা এই যে, মেয়েরা যদি বা কাণ্ট-হেগেলও পড়ে তবু শিশুদের স্নেহ করিবে এবং পুরুষদের নিতান্ত দূর-ছাই করিবে না।

কিন্তু তাই বলিয়া শিক্ষাপ্রণালীতে মেয়ে পুরুষ কোথাও কোনো ভেদ থাকিবে না, এ কথা বলিলে বিধাতাকে অমান্য করা হয়। বিদ্যার দুটো বিভাগ আছে। একটা বিশুদ্ধ জ্ঞানের, একটা ব্যবহারের। যেখানে বিশুদ্ধ জ্ঞান সেখানে মেয়ে-পুরুষের পার্থক্য নাই, কিন্তু যেখানে ব্যবহার সেখানে পার্থক্য আছেই। মেয়েদের মানুষ হইতে শিখাইবার জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষা চাই, কিন্তু তার উপরে মেয়েদের মেয়ে হইতে শিখাইবার জন্য যে ব্যবহারিক শিক্ষা তার একটা বিশেষত্ব আছে, এ কথা মানিতে দোষ কী?

মেয়েদের শরীরের এবং মনের প্রকৃতি পুরুষের হইতে স্বতন্ত্র বলিয়াই তাহাদের ব্যবহারের ক্ষেত্র স্বভাবতই স্বতন্ত্র হইয়াছে। আজকাল বিদ্রোহের ঝোঁকে এক দল মেয়ে এই গোড়াকার কথাটাকেই অস্বীকার করিতেছেন। তাঁরা বলেন, মেয়েদের ব্যবহারের ক্ষেত্র পুরুষের সঙ্গে একেবারে সমান।

এটা তাঁদের নিতান্তই ক্ষোভের কথা। ক্ষোভের কারণ এই যে, পুরুষ আপন কর্মের পথ ধরিয়া জগতে নানা বিচিত্র ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছে, কিন্তু মেয়েদের কর্ম যেখানে সেখানে অধিকাংশ বিষয়েই তাহাদিগকে দায়ে পড়িয়া পুরুষের অনুগত হইতে হইয়াছে। এই আনুগত্যকে তাঁরা অনিবার্য বলিয়া মনে করেন না।

তাঁরা বলেন, পুরুষ এতদিন কেবলমাত্র গায়ের জোরেই মেয়েদের কাঁধের উপর এই আনুগত্যটা চাপাইয়া দিয়াছে। জগতের সর্বত্রই এই কথাটা যদি এতদিন ধরিয়া সত্য হইয়া

থাকে, যদি মেয়েদের প্রকৃতির বিরুদ্ধে পুরুষের শক্তি তাহাদিগকে সংসারের তলায় ফেলিয়া রাখিয়া থাকে তবে বলিতেই হইবে, দাসত্বই মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক। দাসত্ব বলিতে এই বোঝায়, দায়ে পড়িয়া অনিচ্ছাসত্ত্বে পরের দায় বহন করা। যাদের পক্ষে এটা প্রকৃতিসিদ্ধ নয়, তারা বরঞ্চ মরে তবু এমন উৎপাত সহ্য করে না।

এতদিনের মানবের ইতিহাসে যদি এই কথাটাই সর্বদেশে সপ্রমাণ হইয়া থাকে যে দাসীত্ব মেয়েদের স্বাভাবিক, তবে পৃথিবীর সেই অর্ধেক মানুষের লজ্জায় সমস্ত পৃথিবী আজ মুখ তুলিতে পারিত না। কিন্তু আমি বলি, বিদ্রোহী মেয়েরা স্বজাতির বিরুদ্ধে এই যে অপবাদ ঘোষণা করিয়া বেড়াইতেছেন এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

আসল কথা এই, স্ত্রী হওয়া, মা হওয়া, মেয়েদের স্বভাব; দাসী হওয়া নয়। ভালোবাসার অংশ মেয়েদের স্বভাবে বেশি আছে-এ নহিলে সন্তান মানুষ হইত না, সংসার টিকিত না। স্নেহ আছে বলিয়াই মা সন্তানের সেবা করে, তার মধ্যে দায় নাই; প্রেম আছে বলিয়াই স্ত্রী স্বামীর সেবা করে, তার মধ্যে দায় নাই।

কিন্তু দায় আসিয়া পড়ে যখন স্নেহপ্রেমের সম্বন্ধ স্বাভাবিক সম্বন্ধ না হয়। সকল স্বামীকেই সকল স্ত্রী যদি স্বভাবতই ভালোবাসিতে পারিত তাহা হইলে কথাই ছিল না, তাহা সম্ভবপর নহে। অথচ যতদিন সমাজ বলিয়া একটা পদার্থ আছে ততদিন মানুষকে অনেক বিষয়ে এবং অনেক পরিমাণে একটা নিয়ম মানিয়া চলিতেই হইবে।

কিন্তু, সেই নিয়ম সৃষ্টি করিবার সময় সমাজ ভিতরে ভিতরে স্বভাবেরই অনুসরণ করিতে থাকে। মেয়েদের সম্বন্ধে সমাজ আপনিই এটা ধরিয়া লইয়াছে যে, মেয়েদের পক্ষে ভালোবাসাটাই সহজ। তাই মেয়েদের সম্বন্ধে নিয়ম ভালোবাসার নিয়ম। সমাজ তাই মেয়েদের কাছে এই দাবি করে যে, তারা এমন করিয়া কাজ করিবে যেন তারা সংসারকে ভালোবাসিতেছে। বাপ মা ভাই বোন স্বামী ও ছেলেমেয়ের সেবা তারা করিবে। তাদের কাজ ভালোবাসার কাজ, এইটাই তাদের আদর্শ।

এইজন্য মেয়েদের সংসারে কোনো কারণে যেখানে তাদের ভালোবাসা নাই সেখানেও তাহাদিগকে সমাজ ভালোবাসার আদর্শেই বিচার করিয়া থাকে। যে স্বামীকে স্ত্রী ভালোবাসিতে পারে নাই তার সম্বন্ধেও তার ব্যবহারকে ভালোবাসার মাপকাঠিতেই মাপিতে হয়। সংসারকে

সে ভালো বাসুক আর না বাসুক তার আচরণকে কষিয়া দেখিবার ঐ একটিমাত্র কষ্টিপাথর আছে, সেটা ভালোবাসার কষ্টিপাথর।

ভালোবাসার ধর্মই আত্মসমর্পণে, সুতরাং তার গৌরবও তাহাতেই। যেটাকে আনুগত্য বলিয়া লজ্জা করা হইতেছে সেটা লজ্জার বিষয় হয় যদি তাহাতে প্রীতি না থাকে, কেবলমাত্র দায় থাকে। মেয়েরা আপনার স্বভাবের দ্বারাই সমাজে এমন একটা জায়গা পাইয়াছে যেখানে সংসারের কাছে তারা আত্মসমর্পণ করিতেছে। যদি কোনো কারণে সমাজের এমন অবস্থা ঘটে যাতে এই আত্মসমর্পণ ভালোবাসার আদর্শ হইতে বহুল পরিমাণে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে, তবে তাহা মেয়েদের পক্ষে পীড়া ও অবমাননা।

মেয়েরা স্বভাবতই ভালোবাসে এবং একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণের আদর্শকেই সামাজিক শিক্ষায় তাদের মনে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে, এই সুবিধাটুকু ধরিয়া অনেক স্বার্থপর পুরুষ তাদের প্রতি অত্যাচার করে। যেখানে পুরুষ যথার্থ পৌরুষের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট সেখানে মেয়েরা আপন উচ্চ আদর্শের দ্বারাই পীড়িত ও বঞ্চিত হইতে থাকে, ইহার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে যত বেশি এমন আর-কোনো দেশে আছে কিনা আমি সন্দেহ করি। কিন্তু তাই বলিয়া এ কথাটাকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না যে, সমাজে মেয়েরা যে ব্যবহারের ক্ষেত্রটি অধিকার করিয়াছে সেখানে স্বভাববশতই তারা আপনিই আসিয়া পৌঁছিয়াছে, বাহিরের কোনো অত্যাচার তাহাদিগকে বাধ্য করে নাই।

এ কথা মনে রাখিতে হইবে, সমাজে পুরুষের দাসত্ব মেয়েদের চেয়ে অল্প নহে, বরঞ্চ বেশি। এতকালের সভ্যতার সাধনার পরেও মানুষের সমাজ আজও দাসের হাতের খাটুনিতে চলিতেছে। এ সমাজে যথার্থ স্বাধীনতা অতি অল্প লোকেই ভোগ করে। রাজ্যতন্ত্রে বাণিজ্যতন্ত্রে এবং সমাজের সর্ববিভাগেই দাসের দল প্রাণপাত করিয়া সমাজ-জগন্নাথের প্রকাণ্ড রথ টানিয়া চলিতেছে। কোথায় লইয়া চলিতেছে তাহাও জানে না, কাহার রথ টানিতেছে তাহাও দেখিতে পায় না। সমস্ত জীবন দিনের পর দিন এমন দায় বহন করিতেছে যাহারা মধ্যে প্রীতি নাই, সৌন্দর্য নাই। এই দাসত্বের বারো-আনা ভাগ পুরুষের কাঁধে চাপিয়াছে। মেয়েদের ভালোবাসার উপরই সমাজ ঝোঁক দিয়াছে এইজন্য মেয়েদের দায় ভালোবাসার দায়। পুরুষের শক্তির উপরই সমাজ ঝোঁক দিয়াছে, এইজন্য পুরুষের দায় শক্তির দায়। অবস্থাগতিকে সেই দায় এত অতিরিক্ত হইতে পারে যাহাতে ভালোবাসা উৎপীড়িত হয় ও শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে। তখন

সমাজের সংস্কার আবশ্যিক হয়। সেই সংস্কারের জন্য আজ সমস্ত মানবসমাজে বেদনা জাগিয়াছে। কিন্তু সংস্কার যতদূর পর্যন্তই যাক সৃষ্টির গোড়া পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিতে না এবং শেষ পর্যন্ত কবির দল এই বলিয়া আনন্দ করিতে পারিবেন যে, পুরুষ পুরুষই থাকিবে, মেয়েরা মেয়ে থাকিয়া যাইবে বলিয়াই তার ‘সংকটে সহায়, দুরূহ চিন্তায় অংশী এবং সুখে দুঃখে সহচরী হইয়া সংসারে তাহার প্রকৃত সহযাত্রী হইবেন’।

ছাত্রশাসনতন্ত্র

প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্রদের সহিত কোনো কোনো যুরোপীয় অধ্যাপকের যে বিরোধ ঘটিয়াছে তাহা লইয়া কোনো কথা বলিতে সংকোচ বোধ করি। তার একটা কারণ, ব্যাপারটা দেখিতেও ভালো হয় নাই, শুনিতেও ভালো নয়। আর-একটা কারণ, ইংরেজ ও ভারতবাসীর সম্পর্কটার মধ্যে যেখানে কিছু ব্যথা আছে সেখানে নাড়া দিতে ইচ্ছা করে না।

কিন্তু কথাটাকে চাপা দিলে চলিবে না। চাপা থাকেও নাই, বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মনে মনে বা কানে কানে বা মুখে মুখে সকলেই এর বিচার করিতেছে।

বিকৃতি ভিতরে জমিতে থাকিলে একদিন সে আর আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। লাল হইয়া শেষকালে ফাটিয়া পড়ে। তখনকার মতো সেটা সুদৃশ্য নয়।

বাহিরে ফুটিয়া পড়াটাকেই দোষ দেওয়া বিশ্ববিধানকে দোষ দেওয়া; এমনতরো অপবাদে বিশ্ববিধাতা কান দেন না। ভিতরে ভিতরে জমিতে দেওয়া লইয়াই আমাদের নালিশ চলে।

যাক, বাহির যখন হইয়াছেই তখন বিচার করিয়া কোনো-একটা জায়গায় শাস্তি না দিলে নয়। এইটেই সংকটের সময়। জিনিসটা ভদ্র রকমের নহে, এটা ঠিক। ইহার আন্দ্রোশটা প্রকাশ করিব কার উপরে? প্রায় দেখা যায় সহজে যার উপরে জোর খাটে শাসনে ধাক্কাটা তারই উপরে পড়ে। ঘরের গৃহিণী যেখানে বউকে মারিতে ভয় পায় সেখানে ঝিকে মারিয়া কর্তব্য পালন করে।

বিচারসভা বসিয়াছে। ইতিমধ্যেই ছাত্রদের সম্বন্ধে শাসন কড়া করিবার জন্য কোনো মিশনারি কলেজের কর্তা কর্তৃপক্ষের নিকট আবদার প্রকাশ করিয়াছেন। কথাটা শুনিতেও হঠাৎ সংগত বোধ হয়। কারণ, ছাত্রেরা অধ্যাপকদের অসম্মান করিলে সেটা যে কেবল অপরাধ হয়

তাহা নহে, সেটা অস্বাভাবিক হইয়া উঠে। যেখান হইতে আমরা জ্ঞান পাই, সেখানে আমাদের শ্রদ্ধা যাইবে, এটা মানবপ্রকৃতির ধর্ম। তাহার উল্টা দেখিলে বাহিরের শাসনে এই বিকৃতির প্রতিকার করিতে হইবে, সে কথা সকলেই স্বীকার করিবেন।

কিন্তু প্রতিকারের প্রণালী স্থির করিবার পূর্বে ভাবিয়া দেখা চাই, স্বভাব ওলটায় কিসে।

কাগজে দেখিতে পাই, অনেকে এই বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন যে, যে ভারতবর্ষে গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ ধর্মসম্বন্ধ সেখানে এমনতরো ঘটনা বিশেষভাবে গর্হিত। শুধু গর্হিত এ কথা বলিয়া পার পাইব না, চিরকালীন এই সংস্কার অস্থিমজ্জার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও ব্যবহারে তাহার ব্যতিক্রম ঘটতেছে কেন এর একটা সত্য উত্তর বাহির করিতে হইবে।

বাংলাদেশের ছাত্রদের মনস্তত্ত্ব যে বিধাতার একটা খাপছাড়া খেয়াল এ কথা মানি না। ছেলেরা যে বয়সে কলেজে পড়ে সেটা একটা বয়ঃসন্ধির কাল। তখন শাসনের সীমানা হইতে স্বাধীনতার এলাকায় সে প্রথম পা বাড়াইয়াছে। এই স্বাধীনতা কেবল বাহিরের ব্যবহারগত নহে; মনোরাজ্যেও সে ভাষার খাঁচা ছাড়িয়া ভাবের আকাশে ডানা মেলিতে শুরু করিয়াছে। তার মন প্রশ্ন করিবার, তর্ক করিবার, বিচার করিবার অধিকার প্রথম লাভ করিয়াছে। শরীর-মনের এই বয়ঃসন্ধিকালটিই বেদনাকাতরতায় ভরা। এই সময়েই অল্পমাত্র অপমান মর্মে গিয়া বিঁধিয়া থাকে এবং আভাসমাত্র প্রীতি জীবনকে সুধাময় করিয়া তোলে। এই সময়েই মানবসংস্রবের জোর তার ‘পরে যতটা খাটে এমন আর-কোনো সময়েই নয়।

এই বয়সটাই মানুষের জীবন মানুষের সঙ্গপ্রভাবেই গড়িয়া উঠিবার পক্ষে সকলের চেয়ে অনুকূল, স্বভাবের এই সত্যটিকে সকল দেশের লোকেই মানিয়া লইয়াছে। এইজন্যই আমাদের দেশে বলে: প্রাপ্তে তু যোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ। তার মানে এই বয়সেই ছেলে যেন বাপকে পুরাপুরি মানুষ বলিয়া বুঝিতে পারে, শাসনের কল বলিয়া নহে; কেননা, মানুষ হইবার পক্ষে মানুষের সংস্রব এই বয়সেই দরকার। এইজন্যই সকল দেশেই যুনিভার্সিটিতে ছাত্ররা এমন একটুখানি সম্মানের পদ পাইয়া থাকে যাহাতে অধ্যাপকদের বিশেষ কাছে তারা আসিতে পারে এবং সে সুযোগে তাদের জীবনের ‘পরে মানব-সংস্রবের হাত পড়িতে পায়। এই বয়সে ছাত্রগণ শিক্ষার উদ্যোগপর্ব শেষ করিয়া মনুষ্যত্বের সার জিনিসগুলিকে আত্মসাৎ করিবার পালা আরম্ভ করে; এই কাজটি স্বাধীনতা ও আত্মসম্মান ছাড়া হইবার জো নাই। সেইজন্যই এই বয়সে আত্মসম্মানের সম্বন্ধে দরদ বড়ো বেশি হয়। চিবাইয়া খাইবার বয়স আসিলে বেশ একটু জানান

দিয়া দাঁত ওঠে, তেমনি মনুষ্যত্বলাভের যখন বয়স আসে তখন আত্মসম্মানবোধটা একটু ঘটা করিয়াই দেখা দেয়।

এই বয়ঃসন্ধির কালে ছাত্ররা মাঝে মাঝে এক-একটা হাজামা বাধাইয়া বসে। যেখানে ছাত্রদের সঙ্গে অধ্যাপকের সম্বন্ধ স্বাভাবিক সেখানে এই-সকল উৎপাতকে জোয়ারের জলের জঞ্জালের মতো ভাসিয়া যাইতে দেওয়া হয়; কেননা, তাকে টানিয়া তুলিতে গেলেই সেটা বিশ্রী হইয়া উঠে।

বিধাতার নিয়ম অনুসারে বাঙালি ছাত্রদেরও এই বয়ঃসন্ধির কাল আসে, তখন তাহাদের মনোবৃত্তি যেমন এক দিকে আত্মশক্তির অভিমুখে মাটি ফুঁড়িয়া উঠিতে চায় তেমনি আর-এক দিকে যেখানে তারা কোনো মহত্ত্ব দেখে, যেখান হইতে তারা শ্রদ্ধা পায়, জ্ঞান পায়, দরদ পায়, প্রাণের প্রেরণা পায়, সেখানে নিজেকে উৎসর্গ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। মিশনারি কলেজের বিধাতা-পুরুষের বিধানে ঠিক এন বয়সেই তাহাদিগকে শাসনে পেষণে দলনে দমনে নির্জীব জড়পিণ্ড করিয়া তুলিবার জাঁতাকল বানাইয়া তোলা জগদ্বিধাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ; ইহাই প্রকৃত নাস্তিকতা।

জেলখানার কয়েদি নিয়মের নড়চড় করিলে তাকে কড়া শাসন করিতে কারো বাধে না; কেননা তাকে অপরাধী বলিয়াই দেখা হয়, মানুষ বলিয়া নয়। অপমানের কঠোরতায় মানুষের মনে কড়া পড়িয়া তাকে কেবলই অমানুষ করিতে থাকে, সে হিসাবটা কেহ করিতে চায় না; কেননা, মানুষের দিক দিয়া তাকে হিসাব করাই হয় না। এইজন্য জেলখানার সর্দারি যে করে সে মানুষকে নয়, অপরাধীকেই সকলের চেয়ে বড়ো করিয়া দেখে।

সৈন্যদলকে তৈরি করিয়া তুলিবার ভার যে লইয়াছে সে মানুষকে একটিমাত্র সংকীর্ণ প্রয়োজনের দিক হইতেই দেখিতে বাধ্য। লড়াইয়ের নিখুঁত কল বানাইবার ফরমাস তার উপরে। সুতরাং, সেই কলের হিসাবে যে-কিছু ত্রুটি সেইটে সে একান্ত করিয়া দেখে এবং নির্মমভাবে সংশোধন করে।

কিন্তু ছাত্রকে জেলের কয়েদি বা ফৌজের সিপাই বলিয়া আমরা তো মনে ভাবিতে পারি না। আমরা জানি, তাহাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে। মানুষের প্রকৃতি সূক্ষ্ম এবং সজীব তন্তুজালে বড়ো বিচিত্র করিয়া গড়া। এইজন্যই মানুষের মাথা ধরিলে মাথায় মুণ্ডর মারিয়া সেটা সারানো যায় না; অনেক দিক বাঁচাইয়া প্রকৃতির সাধ্যসাধনা করিয়া তার চিকিৎসা করিতে হয়। এমন লোকও আছে এ সম্বন্ধে যারা বিজ্ঞানকে খুবই সহজ করিয়া আনিয়াছে; তারা সকল

ব্যাধিরই একটিমাত্র কারণ ঠিক করিয়া রাখিয়াছে, সে ভূতে পাওয়া। এবং তারা মিশনরি কলেজের ওঝাটির মতো ব্যাধির ভূতকে মারিয়া ঝাড়িয়া, গরম লোহার ছাঁকা দিয়া, চীৎকার করিয়া, তাড়াইতে চায়। তাহাতে ব্যাধি যায়। এবং প্রাণপদার্থের প্রায় পনেরো আনা তার অনুসরণ করে।

এ হইল আনাড়ির চিকিৎসা। যারা বিচক্ষণ তারা ব্যাধিটাকেই স্বতন্ত্র করিয়া দেখে না; চিকিৎসার সময় তারা মানুষের সমস্ত ধাতটাকে অখণ্ড করিয়া দেখে; মানবপ্রকৃতির জটিলতা ও সূক্ষ্মতাকে তারা মানিয়া লয় এবং বিশেষ কোনো ব্যাধিকে শাসন করিতে গিয়া সমস্ত মানুষকে নিকাশ করিয়া বসে না।

অতএব যাদের উচিত ছিল জেলের দারোগা ড্রিল বা সার্জেন্ট বা ভূতের ওঝা হওয়া তাদের কোনোমতেই উচিত হয় না ছাত্রদিগকে মানুষ করিবার ভার লওয়া। ছাত্রদের ভার তাঁরাই লইবার অধিকারী যাঁরা নিজের চেয়ে বয়সে অল্প, জ্ঞানে অপ্রবীণ ও ক্ষমতায় দুর্বলকেও সহজেই শ্রদ্ধা করিতে পারেন; যাঁরা জানেন, শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা; যাঁরা ছাত্রকেও মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন না।

যিশুখৃষ্ট বলিয়াছেন, ‘শিশুদিগকে আমার কাছে আসিতে দাও।’ তিনি শিশুদিগকে বিশেষ করিয়া শ্রদ্ধা করিয়াছেন। কেননা, শিশুদের মধ্যেই পরিপূর্ণতার ব্যঞ্জনা আছে। যে মানুষ বয়সে পাকা হইয়া অভ্যাসে সংস্কারে ও অহমিকায় কঠিন হইয়া গেছে সে মানুষ সেই পূর্ণতার ব্যঞ্জনা হারাইয়াছে; বিশ্বগুরুর কাছে আসা তার পক্ষেই বড়ো কঠিন।

ছাত্রেরা গড়িয়া উঠিতেছে; ভাবের আলোকে, রসের বর্ষণে তাদের প্রাণকোরকের গোপন মর্মস্থলে বিকাশবেদনা কাজ করিতেছে। প্রকাশ তাদের মধ্যে থামিয়া যায় নাই; তাদের মধ্যে পরিপূর্ণতার ব্যঞ্জনা। সেইজন্যই, সৎগুরু ইহাদিগকে শ্রদ্ধা করেন, প্রেমের সহিত কাছে আহ্বান করেন, ক্ষমার সহিত ইহাদের অপরাধ মার্জনা করেন এবং ধৈর্যের সহিত ইহাদের চিত্তবৃত্তিকে উর্ধ্বের দিকে উদ্ঘাটন করিতে থাকেন। ইহাদের মধ্যে পূর্ণমনুষ্যত্বের মহিমা প্রভাতের অরুণরেখার মতো অসীম সম্ভাব্যতার গৌরবে উজ্জ্বল; সেই গৌরবের দীপ্তি যাদের চোখে পড়ে না, যারা নিজের বিদ্যা পদ বা জাতির অভিমানে ইহাদিগকে পদে পদে অবজ্ঞা করিতে উদ্যত, তারা গুরুরূপদের অযোগ্য। ছাত্রদিগকে যারা স্বভাবতই শ্রদ্ধা করিতে না পারে ছাত্রদের নিকট

হইতে ভক্তি তারা সহজে পাইতে পারিবে না। কাজেই ভক্তি জোর করিয়া আদায় করিবার জন্য তারাই রাজদরবারে কড়া আইন ও চাপরাশওয়ালা পেয়াদার দরবার করিয়া থাকে।

ছাত্রদিগকে কড়া শাসনের জালে যাঁরা মাথা হইতে পা পর্যন্ত বাঁধিয়া ফেলিতে চান তাঁরা অধ্যাপকদের যে কত বড়ো ক্ষতি করিতেছেন সেটা যেন ভাবিয়া দেখেন। পৃথিবীতে অল্প লোকই আছে নিজের অন্তরের মহৎ আদর্শ যাহাদিগকে সত্য পথে আহ্বান করিয়া লইয়া যায়। বাহিরের সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাতের ঠেলাতেই তারা কর্তব্য সম্বন্ধে সতর্ক হইয়া থাকে। বাহিরের সঙ্গে বোঝাপড়া আছে বলিয়াই তারা আত্মবিস্মৃত হইতে পারে না।

এইজন্যই চারি দিকে যেখানে দাসত্ব মনিবের সেখানে দুর্গতি, শূদ্র যেখানে শূদ্র ব্রাহ্মণের সেখানে অধঃপতন। কঠোর শাসনের চাপে ছাত্রেরা যদি মানবস্বভাব হইতে ভ্রষ্ট হয়, সকলপ্রকার অপমান দুর্ব্যবহার ও অযোগ্যতা যদি তারা নির্জীবভাবে নিঃশব্দে সহিয়া যায়, তবে অধিকাংশ অধ্যাপকদিগকেই তাহা অধোগতির দিকে টানিয়া লইবে। ছাত্রদের মধ্যে অবজ্ঞার কারণ তাঁরা নিজে ঘটাইয়া তুলিয়া তাহাদের অবমাননার দ্বারা নিজেকে অহরহ অবমানিত করিতে থাকিবেন। অবজ্ঞার ক্ষেত্রে নিজের কর্তব্য কখনোই কেহ সাধন করিতে পারে না।

অপর পক্ষ বলিবেন, তবে কি ছেলেরা যা খুশি তাই করিবে তার সমস্তই সহিয়া লইতে হইবে? আমার কথা এই, ছেলেরা যা খুশি তাই কখনোই করিবে না। তারা ঠিক পথেই চলিবে, যদি তাহাদের সঙ্গে ঠিকমত ব্যবহার করা হয়। যদি তাহাদিগকে অপমান কর, তাহাদের জাতি বা ধর্ম বা আচারকে গালি দাও, যদি দেখে তাহাদের পক্ষে সুবিচার পাইবার আশা নাই, যদি অনুভব করে যোগ্যতাসত্ত্বেও তাহাদের স্বদেশীয় অধ্যাপকেরা অযোগ্যের কাছে মাথা হেঁট করিতে বাধ্য, তবে ক্ষণে ক্ষণে তারা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিবেই; যদি না করে তবে আমরা সেটাকে লজ্জা এবং দুঃখের বিষয় বলিয়া মনে করিব।

অপর পক্ষে একটি সংগত কথা বলিবার আছে। যুরোপীয়ের পক্ষে ভারতবর্ষ বিদেশ, এখানকার আবহাওয়া ক্লান্তিকর, তাঁহাদের পানাহার উত্তেজক, আমরা তাঁহাদের অধীনস্থ জাতি, আমাদের বর্ণ ধর্ম ভাষা আচার সমস্তই স্বতন্ত্র। তার উপরে, এ দেশে প্রত্যেক ইংরেজই রাজশক্তি বহন করেন, সুতরাং রাজাসন তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই চলিতে থাকে; এই-জন্য ছাত্রকে কেবলমাত্র ছাত্র বলিয়া দেখা তাঁর পক্ষে শক্ত, তাকে প্রজা বলিয়াও দেখেন। অতএব, অতি সামান্য কারণেই অসহিষ্ণু হওয়া তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। বাঙালি ছাত্রদের মানুষ করিবার ভার কেবল তাঁর নয়,

ইংরেজ-রাজের প্রতিষ্ঠা রক্ষার ভারও তাঁর। অতএব, একে তিনি ইংরেজ, তার উপর তিনি ইম্পীরিএল সার্ভিসের অধ্যাপক, তার উপরে তিনি রাজার অংশ, তার উপরে তাঁর বিশ্বাস তিনি পতিতউদ্ধার করিবার জন্য আমাদের প্রতি কৃপা করিয়াই এ দেশে আসিয়াছেন-এমন অবস্থায় সকল সময়ে তাঁর মেজাজ ঠিক না থাকিতেও পারে। অতএব, তিনি কিরূপ ব্যবহার করিবেন সে বিচার না করিয়া ছাত্রদেরই ব্যবহারকে আষ্টেপৃষ্ঠে কঠিন করিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। সমুদ্রকে বলিলে চলিবে না যে, তুমি এই পর্যন্ত আসিবে তার উর্ধ্বে নয়’, তীরে যারা আছে তাহাদিগকেই বলিতে হইবে, ‘তোমরা হঠাৎ, হঠাৎ, আরো হঠাৎ।’

তাই বলিতেছি এ কথা সত্য বলিয়া মানিতেই হইবে যে, নানা অনিবার্য কারণে ইংরেজ অধ্যাপক বাঙালি ছাত্রের সহিত বিশুদ্ধ অধ্যাপকের মতো ব্যবহার করিয়া উঠিতে পারেন না। কেম্ব্রিজে অক্সফোর্ডে ছাত্রদের সহিত অধ্যাপকদের সম্বন্ধ কিরূপ তর্কস্থলে আমরা সে নজির উত্থাপন করিয়া থাকি, কিন্তু তাহাতে লাভ কী! সেখানে যে সম্বন্ধ স্বাভাবিক এখানে যে তাহা নহে, সে কথা স্বীকার করিতেই হইবে। অতএব, স্বাভাবিকতায় যেখানে গর্ত আছে সেখানে শাসনের হুঁটপাটকেল দিয়া ভরাট করিবার কথাটাই সর্বাগ্রে মনে আসে।

সমস্যাটা আমাদের পক্ষে শক্ত হইয়াছে এই কারণেই। এইজন্যই আমাদের স্বদেশীয় বিধেও ছাত্রদিগকে পরামর্শ দিয়া থাকেন যে, ‘বাপু, তোমরা কোনোমতে এগ্জামিন পাস করিয়াই সমুপ্ত থাকো, মানুষ হইবার দুরাশা মনে রাখিয়ো না।’

এ বেশ ভালো কথা। কিন্তু সুবুদ্ধির কথা চিরদিন খাটে না; মানবপ্রকৃতি সুবুদ্ধির পাকা ভিতের উপরে পাথরে গাঁথিয়া তৈরি হয় নাই। তাকে বাড়িতে হইবে, এইজন্যই সে কাঁচা। এইজন্যই কৃত্রিম ঘেরটাকে সে খানিকটা দূর পর্যন্ত সহ্য করে; তার পরে প্রাণের বাড় আর আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, একদিন হঠাৎ বেড়া ফাটিয়া ভাঙিয়া পড়ে। যে প্রাণ কচি তারই জয় হয়, যে বাঁধন পাকা সে টেকে না।

অতএব, স্বভাবকে যদি কেবল এক পক্ষেই মানি এবং অপর পক্ষে একেবারেই অগ্রাহ্য করি তবে কিছুদিন মনে হয়, সেই এক-তরফা নিষ্পত্তিতে বেশ কাজ চলিতেছে। তার পরে একদিন হঠাৎ দেখিতে পাই কাজ একেবারেই চলিতেছে না। তখন দ্বিগুণ রাগ হয়; যা এতদিন ঠাণ্ডা ছিল তার অকস্মাৎ চঞ্চলতা গুরুতর অপরাধ বলিয়াই গণ্য হইতে থাকে এবং সেই কারণেই শাস্তির মাত্রা দণ্ডবিধির সহজ বিধানকে ছাড়াইয়া যায়। তার পর হইতে সমস্ত ব্যাপারটা এমনি

জটিল হইয়া উঠে যে কমিশনের পঞ্চায়েত তার মধ্যে পথ খুঁজিয়া পায় না; তখন বলিতে বাধ্য হয় যে, ‘কুড়াল দিয়া কাটিয়া, আগুন দিয়া পোড়াইয়া, স্ত্রীম্রোলার দিয়া পিষিয়া রাস্তা তৈরি করো।’

কথাটা বেশ। কর্ণধার কানে ধরিয়া ঝাঁকা মারিতে মারিতে স্কুলের খেয়া পার করিয়া দিল, তার পরে লৌহশাসনের কলের গাড়িতে প্রাণরসকে অন্তররুদ্ধ তপ্তবাস্পে পরিণত করিয়া যুনিভার্সিটির শেষ ইস্টেশনে গিয়া নামিলাম, সেখানে চাকরির বালুময়ুগে দীর্ঘ মধ্যাহ্ন জীবিকা-মরীচিকার পিছনে ধুকিতে ধুকিতে চলিলাম, তার পরে সূর্য যখন অস্ত যায় তখন যমরাজের সদর গেটের কাছে গিয়া মাথার বোঝা নামাইয়া দিয়া মনে করিলাম ‘জীবন সার্থক হইল’। জীবনযাত্রার এমন নিরাপদ এবং শান্তিময় আদর্শ অন্য কোথাও নাই। এই আদর্শ আমাদের দেশে যদি চিরদিন টেকা সম্ভবপর হইত তাহা হইলে কোনো কথা বলিতাম না। কিন্তু টিকিল না। তার কারণ, আমরা তো কেবলমাত্র খৃষ্টানকলেজের প্রধান অধ্যক্ষ এবং পতিত-উদ্ধারের দুঃসাধ্যব্রতধারীদের কাছ হইতেই শিক্ষা পাই নাই। আমরা যে ইংলন্ডের কাছ হইতে শিখিতেছি। সেও আজ একশো বছরের উপর হইয়া গেল। সে শিক্ষা তো বন্ধ্যা নহে, নূতন প্রাণকে সে জন্ম দিবেই। তার পরে সেই প্রাণের ক্ষুধাতৃষ্ণা যে অল্পপানীয়ে দাবি করিবে তাকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করিতে কেহ পারিবে না।

মনে আছে, ছেলেবেলা যখন ইংরেজি মাস্টারের কাছে ইংরেজি শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ মুখস্থ করিতে হইত তখন □ শব্দের একটা প্রতিশব্দ বহু কষ্টে কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম, সে হইতেছে : Myself-I, by Myself I। ইংরেজি এই □ শব্দের প্রতিশব্দটি আয়ত্ত করিতে কিছু দিন সময় লাগিয়াছে; ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প করিয়া ওটা একরকম সড়গড় হইয়া আসিল। এখন মাস্টারমশায় □ হইতে ঐ myself-টাকে কালির দাগে লাঞ্চিত করিয়া রবারের ঘর্ষণে একেবারে মুছিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিতেছেন। আমাদের খৃষ্টান হেডমাস্টার বলিতেছেন, ‘আমাদের দেশে □ শব্দের যে অর্থ তোমাদের দেশে সে অর্থ হইতেই পারে না।’ কিন্তু ওটাকে কণ্ঠস্থ করিতে যদি আমাদের দুইশো বছর লাগিয়া থাকে ওটাকে সম্পূর্ণ বহিস্কৃত করিতে তার ডবল সময়েও কুলায় কিনা সন্দেহ করি। কেননা, ঐ □ শব্দের ইংরেজি মন্ত্রটা ভয়ংকর কড়া, গুরু যদি গোড়া হইতেই ওটা সম্পূর্ণ চাপিয়া যাইতে পারিতেন তো কোনো বালাই থাকিত না; এখন ওটা কান

হইতে প্রাণের মধ্যে পৌঁছিয়াছে, এখন প্রাণটাকে মারিয়া ওটাকে উপড়ানো যায়। কিন্তু প্রাণ বড়ো শক্ত জিনিস।

ইংলন্ড যতক্ষণ পর্যন্ত ভারতবর্ষের সঙ্গে আপন সম্পর্ক রাখিয়াছে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে আপনি লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। যাহা তার সর্বোচ্চ সম্পদ তাহা ইচ্ছা করিয়াই হউক, ইচ্ছার বিরুদ্ধেই হউক, আমাদিগকে দিতেই হইবে। ইহাই বিধাতার অভিপ্রায়, তার সঙ্গে প্রিন্সিপাল সাহেবের অভিপ্রায় মিলুক আর নাই মিলুক। তাই আজ আমাদের ছাত্রেরা কেবলমাত্র ইংরেজি কেতাবের ইংরেজি নোট কুড়ানোর উজ্জ্বলিত্তিতেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করিবে না, আজ তারা আত্মসম্মানকে বজায় রাখিতে চাহিবে; আজ তারা নিজেকে কলের পুতুল বলিয়া ভুল করিতে পারিবে না; আজ তারা জেলের দারোগাকে নিজের গুরু বলিয়া মানিয়া শাসনের চোটে তাকে গুরুভক্তি দেখাইতে রাজি হইবে না। আজ যাহা সত্য হইয়া উঠিয়াছে তাকে গালি দিলেও তাহা মিথ্যা হইবে না এবং তার গালে চড় মারিলেও সে যে সত্য ইহাই আরো বেশি করিয়া প্রমাণ হইতে থাকিবে।

যে কথা লইয়া আজ আলোচনা চলিতেছে এ যদি একটা সামান্য ও সাময়িক আন্দোলন মাত্র হইত তাহা হইলে আমি কোনো কথাই বলিতাম না। কিন্তু ইহার মূলে খুব একটা বড়ো কথা আছে, সেইজন্যই এই প্রসঙ্গে চুপ করিয়া থাকা অন্যায় মনে করি।

মানুষের ইতিহাস ভিন্ন দেশে ভিন্ন মূর্তি ধরে। ভারতবর্ষের ইতিহাসেরও বিশেষত্ব আছে। সেই ইতিহাসের গোড়া হইতেই আমরা দেখিয়া আসিতেছি, এ দেশ কোনো বিশেষ একটি জাতির বা বিশেষ একটি সভ্যতার দেশ নয়। এ দেশে আর্যসভ্যতাও যেমন সত্য দ্রাবিড়সভ্যতাও তেমনি সত্য, এ দেশে হিন্দুও যত বড়ো মুসলমানও তার চেয়ে নিতান্ত কম নয়। এইজন্যই এখানকার ইতিহাস নানা বিরোধের বাষ্পসংঘাতে প্রকাণ্ড নীহারিকার মতো ঝাপসা হইয়া আছে। এই ইতিহাসে আমরা নানা শক্তির আলোড়ন দেখিয়া আসিতেছি, কিন্তু একটা অখণ্ড ঐতিহাসিক মূর্তির উদ্ভাবন এখনো দেখি নাই। এই পরিব্যাপ্ত বিপুলতার মধ্য হইতে একটি নিরবচ্ছিন্ন ‘আমি’র সুস্পষ্ট ক্রন্দন জাগিল না।

স্বফটিক যখন দ্রব অবস্থায় থাকে তখন তাহা মূর্তিহীন; আমরা সেই অবস্থায় অনেক দিন কাটাইলাম। এমন সময় সমুদ্রপার হইতে একটি আঘাত এই তরল পদার্থের উপর হইতে নীচে, এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্তে সঞ্চারিত হইয়াছে; তাই অনুভব করিতেছি দানা বাঁধিবার

মতো একটা সর্বব্যাপী আবেগ ইহার কণায় কণায় যেন নড়িয়া উঠিল। মূর্তি ধরিয়া উঠিবার একটা বেদনা ইহার সর্বত্র যেন চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে।

তাই দেখিতেছি, ভারতবর্ষের ইতিহাসে যেমন আর্য আছে দ্রাবিড় আছে, যেমন মুসলমান আছে, তেমনি ইংরেজও আসিয়া পড়িয়াছে। তাই, ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস কেবল আমাদের ইতিহাস নহে, তাহা ইংরেজেরও ইতিহাস। এখন আমাদের দেখিতে হইবে, ইতিহাসের এই-সমস্ত অংশগুলি ঠিকমত করিয়া মেলে, সমস্তটাই এক সজীব শরীরের অঙ্গ হইয়া উঠে। ইহার মধ্যে কোনো-একটা অংশকে বাদ দিব সে আমাদের সাধ্য নাই। মুসলমানকে বাদ দিতে পারি নাই; ইংরেজকেও বাদ দিতে পারিব না। এ কেবল বাহুবলের অভাববশত নহে, আমাদের ইতিহাসটার প্রকৃতিই এই; তাহা কোনো এক-জাতির ইতিহাস নয়, তাহা একটা মানব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ইতিহাস।

এই-যে নানা যুগ, নানা জাতি ও নানা সভ্যতা ভারতবর্ষের ইতিহাসকে গড়িয়া তুলিতেছে, আজ সেই ঐতিহাসিক অভিপ্রায়ের অনুগত করিয়া আমাদের অভিপ্রায়কে সজাগ করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে আমাদের দেশ ইংলন্ড নয়, ইটালি নয়, আমেরিকা নয়; সেখানকার মাপে কোনোমতেই আমাদের ইতিহাসকে ছাঁটা চলিবে না। এখানে একেবারে মূলে তফাত। ও-সকল দেশ মোটের উপরে একটা ঐক্যকে লইয়াই নিজেরা ইতিহাস ফাঁদিয়াছে, আমরা অনেক লইয়াই প্রথম হইতে শুরু করিয়াছি এবং আজ পর্যন্ত কেবল তাহা বাড়িয়াই চলিয়াছে।

আমাদের ভাবিতে হইবে, এই লইয়াই আমরা কী করিতে পারি। বাহিরকে কেমন করিয়া বাহির করিয়া দিব, স্বভাবতই অন্য ইতিহাসের এই ভাবনা; বাহিরকে কেমন করিয়া আপন করিয়া লইব, স্বভাবতই আমাদের ইতিহাসের এই ভাবনা।

ইংরেজকে আমাদের দেশের পক্ষে আপন করিয়া না লইতে পারিলে আমাদের স্বাস্থ্য নাই, কল্যাণ নাই। ইংরেজের শাসন যতক্ষণ আমাদের পক্ষে কলের শাসন থাকিবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সম্বন্ধ মানবসম্বন্ধ না হইবে, ততক্ষণ Pax Britannica আমাদের ‘শান্তি’ দিবে, জীবন দিবে না। আমাদের অন্নের হাঁড়িতে জল চড়াইবে মাত্র, চুলাতে আগুন ধরাইবে না। অর্থাৎ, ততক্ষণ ইংরেজ ভারতবর্ষের সৃজনকার্যে বিশ্বকর্মার ঘনিষ্ঠ সহযোগী হইবে না, বাহির হইতে মজুরি করিয়া কেবল হুঁট কাঠ ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যাইবে। ইহাকেই একজন ইংরেজ কবি বলিয়াছেন the white man's burden। কিন্তু ‘বার্ডেন’ কেন হইতে যাইবে? এ কেন

সৃজনকার্যের আনন্দ না হইবে? সৃষ্টিকর্তার ডাকে ইংরেজ এখানে আসিয়াছে, তাকে সৃষ্টিকার্যে যোগ দিতেই হইবে। যদি আনন্দের সঙ্গে যোগ দিতে পারে তবেই সব দিকে ভালো, যদি না পারে তবে এই land of regrets-এর তপ্ত বালুকাপথ তাহাদের কঙ্কালে খচিত হইয়া যাইবে, তবু ভার বহিতেই হইবে। ভারতইতিহাসের গঠনকাজে যদি তাহাদের প্রাণের যোগ না ঘটে, কেবলমাত্র কাজের যোগ ঘটে, তাহা হইলে ভারতবর্ষের বিধাতা বেদনা পাইবেন, ইংরেজও সুখ পাইবে না।

তাই ভারত-ইতিহাসের প্রধান সমস্যা এই, ইংরেজকে পরিহার করা নয়, ইংরেজের সঙ্গে ভারতবর্ষের

সম্বন্ধকে সজীব ও স্বাভাবিক করিয়া তোলা। এত দিন পর্যন্ত হিন্দু মুসলমান ও ভারতবর্ষের নানা বিচিত্র জাতিতে মিলিয়া এ দেশের ইতিহাস আপনা-আপনি যেমন-তেমন করিয়া গড়িয়া উঠিতেছিল। আজ ইংরেজ আসার পর এই কাজে আমাদের চেতনা জাগিয়াছে; ইতিহাসরচনায় আজ আমাদের ইচ্ছা কাজ করিতে উদ্যত হইয়াছে।

এইজন্যই ইচ্ছায় ইচ্ছায় মাঝে মাঝে দ্বন্দ্ব বাধিবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু যাঁরা এ দেশের সঞ্জীবনমন্ত্রের তপস্বী রাগদ্বেষ্টে ক্ষুব্ধ হইলে তাঁদের চলিবে না। তাঁহাদিগকে এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ইচ্ছায় ইচ্ছায় মিল করাই চাই। কারণ, ইংরেজ ভারতের ইতিহাস-ধারাকে বাধা দিতে আসে নাই, তাহাতে যোগ দিতে আসিয়াছে। ইংরেজকে নহিলে ভারত-ইতিহাস পূর্ণ হইতেই পারে না। সেইজন্যই আমরা কেবলমাত্র ইংরেজের আপিস চাই না, ইংরেজের হৃদয় চাই।

ইংরেজ যদি আমাদের অবাধে অনায়াসে অবজ্ঞা করিতে পায় তাহা হইলেই আমরা তার হৃদয় হারাইব। শ্রদ্ধা আমাদের দাবি করিতেই হইবে; আমরা খৃষ্টান প্রিন্সিপালের নিকট হইতেও এক গালে চড় খাইয়া অন্য গাল ফিরাইয়া দিতে পারিব না।

ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর জীবনের সম্বন্ধ কোথায় সহজে ঘটিতে পারে? বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নয়, রাজকীয় ক্ষেত্রেও নয়। তার সর্বোৎকৃষ্ট স্থান বিদ্যাদানের ক্ষেত্রে। জ্ঞানের আদানপ্রদানের ব্যাপারটি সাত্ত্বিক। তাহা প্রাণকে উদ্‌বোধিত করে। সেইজন্য এইখানেই প্রাণের নাগাল পাওয়া সহজ। এইখানেই গুরুর সঙ্গে শিষ্যের সম্বন্ধ যদি সত্য হয় তবে ইহজীবনে তার বিচ্ছেদ নাই। তাহা পিতার সঙ্গে পুত্রের সম্বন্ধের চেয়েও গভীরতর।

আমাদের যুনিভার্সিটিতে এই সুযোগ ঘটিয়াছিল। এইখানে ইংরেজ এমন একটি স্থান পাইতে পারিত যাহা সে রাজসিংহাসনে বসিয়াও পায় না। এই সুযোগ যখন ব্যর্থ হইতে দেখা যায় তখন আক্ষেপের সীমা থাকে না।

ব্যর্থতার কারণ আমাদের ছাত্ররাই, এ কথা আমি কিছুতেই মানিতে পারি না। আমাদের দেশের ছাত্রদের আমি ভালো করিয়াই জানি। ইংরেজ ছেলের সঙ্গে একটা বিষয়ে ইহাদের প্রভেদ আছে। ইহারা ভক্তি করিতে পাইলে আর কিছু চায় না। অধ্যাপকের কাছ হইতে একটুমাত্রও যদি ইহারা খাঁটি স্নেহ পায় তবে তাঁর কাছে হৃদয় উৎসর্গ করিয়া দিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। আমাদের ছেলেদের হৃদয় নিতান্তই সস্তা দামে পাওয়া যায়।

এইজন্যই আমার যে-একটি বিদ্যালয় আছে সেখানে ইংরেজ অধ্যাপক আনিবার জন্য অনেকদিন হইতে উদ্যোগ করিয়াছি। বহুকাল পূর্বে একজনকে আনিয়াছিলাম। তিনি সুদীর্ঘকাল ভারতবর্ষের আবহাওয়ায় পাকিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁর অন্তঃকরণে পিত্তাধিক্য ঘটিয়াছিল। তিনি তাঁর ক্লাসে ছেলেদের জাতি তুলিয়া গালি দিতেন; তারা বাঙালির ঘরে জন্মিয়াছে এই অপরাধ তিনি সহিতে পারিতেন না। সেই ছেলেরা যদিচ প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র নয়, তাদের বয়স নয়-দশ বৎসর হইবে, তবু তারা তাঁর ক্লাসে যাওয়া ছাড়িল। হেডমাস্টারের তাড়নাতেও কোনো ফল হইল না। দেখিলাম হিতে বিপরীত ঘটিল। এই মাস্টারটিকে white man's burden হইতে সে যাত্রায় নিষ্কৃতি দিলাম।

কিন্তু, আশা ছাড়ি নাই এবং আমার কামনাও সফল হইয়াছে। আজ ইংরেজ গুরুর সঙ্গে বাঙালি ছাত্রের জীবনের গভীর মিলন ঘটিয়া আশ্রম পবিত্র হইয়াছে। এই পুণ্য মিলনটি সমস্ত ভারতক্ষেত্রে দেখিবার জন্য বিধাতা অপেক্ষা করিতেছেন। যে-দুটি ইংরেজ তাপস সেখানে আছেন তাঁরা নিজের ধর্ম প্রচার করিতে যান নাই, তাঁরা পতিত-উদ্ধারের দুঃসহ কর্তব্যভার গ্রহণ করেন নাই; তাঁরা গ্রীকদের মতো বর্বর জাতিকে সভ্যতায় দীক্ষিত করিবার জন্য ধরাধামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এমন অভিমান মনে রাখেন না। তাঁরা তাঁদের পরমগুরুর মতো করিয়াই দুই হাত বাড়াইয়া বলিয়াছেন, ‘ছেলেদের আসিতে দাও আমার কাছে, হোক-না তারা বাঙালির ছেলে। ছেলেরা তাঁদের অত্যন্ত কাছে আসিতে লেশমাত্র বিলম্ব করে নাই, হোন্-না তাঁরা ইংরেজ। আজ এই কথা বলিতে পারি, এই দুটি ইংরেজের সঙ্গে আমার ছেলেদের যে সম্বন্ধ ঘটিয়াছে তাহা তাহাদের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষুন্ন থাকিবে। এই ছেলেরা ইংরেজবিদ্বেষের বিষে জীবন পূর্ণ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিবে না।

প্রথমে যে শিক্ষকটি আসিয়াছিলেন তিনি শিক্ষকতায় পাকা ছিলেন। তাঁর কাছে পড়িতে পাইলে ছেলেদের ইংরেজি উচ্চারণ ও ব্যাকরণ দুরন্ত হইয়া যাইত। সেই লোভে আমি কঠোর শাসনে ছাত্রগুলিকে তাঁর ক্লাসে পাঠাইতে পারিতাম। মনে করিতে পারিতাম, শিক্ষক যেমনই দুর্ব্যবহার করুন ছাত্রদের কর্তব্য সমস্ত সহিয়া তাঁকে মানিয়া চলা। কিছুদিন তাদের মনে বাজিত, হয়তো কিছুদিন পরে তাদের মনে বাজিতও না, কিন্তু তাদের অ্যাক্সেসেন্ট বিশুদ্ধ হইত। তা হউক, কিন্তু এই মানবের ছেলেদের কি ভগবান নাই? আমরাই কি চুল পাকিয়াছে বলিয়া তাদের বিধাতাপুরুষ? ইংরেজি ভাষায় বিশুদ্ধ অ্যাক্সেসেন্টের জোরে সেই ভগবানের বিচারে আমি কি খালাস পাইতাম?

ইংরেজ অধ্যাপকের সহিত বাঙালি ছাত্রদের সম্বন্ধ সরল ও স্বাভাবিক হওয়া বর্তমানে বিশেষ কঠিন হইয়াছে। তার কারণ কী, একদিন ইংলন্ডে থাকিতে তাহা খুব স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম। রেলগাড়িতে একজন ইংরেজ আমার পাশে বসিয়াছিলেন; প্রথমটা আমাকে দেখিয়া তাঁর ভালোই লাগিল। এমন-কি, তাঁর মনে হইল ইংলন্ডে আমি ধর্মপ্রচার করিতে আসিয়াছি। যুরোপের লোককে সাধু উপদেশ দিবার অধিকার আমাদেরও আছে, এ মত তিনি বিশেষ উৎসাহের সহিত প্রকাশ করিলেন। এমন সময় হঠাৎ তাঁর কৌতূহল হইল আমি ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশ হইতে আসিয়াছি তাহা জানিবার জন্য। আমি বলিলাম, আমি বাংলাদেশের লোক। শুনিয়া তিনি লাফাইয়া উঠিলেন। কোনো দুষ্কর্মই যে বাংলাদেশের লোকের অসাধ্য নহে, তাহা তিনি তীব্র উত্তেজনার সঙ্গে বলিতে লাগিলেন।

কোনো জাতির উপর যখন রাগ করি তখন সে জাতির প্রত্যেক মানুষ আমাদের কাছে একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট সত্তা হইয়া উঠে। তখন সে আর বিশেষ্য থাকে না, বিশেষণ হয়। আমার সহযাত্রী যতক্ষণ না জানিয়াছিলেন আমি বাঙালি ততক্ষণ তিনি আমার সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের মতো ব্যবহার করিতেছিলেন, সুতরাং আদব-কায়দার ঢগটি হয় নাই। কিন্তু যেই তিনি শুনিলেন আমি বাঙালি অমনি আমার ব্যক্তিবিশেষত্ব বাষ্প হইয়া গিয়া একটা বিকট বিশেষণে আসিয়া দাঁড়াইল, সেই বিশেষণটি অভিধানে যাকে বলে ‘নিদারুণ’। বিশেষণ-পদার্থের সঙ্গে সাধারণ ভদ্রতা রক্ষার কথা মনেই হয় না। কেননা, ওটা অপদার্থ বলিলেই হয়।

রাশিয়ানের উপর ইংরেজের যখন রাগ ছিল তখন রাশিয়ান-মাত্রেরই তার কাছে একটা বিশেষণ হইয়া উঠিয়াছিল। আজ ইংরেজি কাগজে প্রায়ই দেখিতে পাই, রাশিয়ানের ধর্মপরতা

সহৃদয়তার সীমা নাই। মানুষকে বিশেষণ হইতে বিশেষ্যের কোঠায় ফেলিবা-মাত্র তার মানবধর্ম প্রকাশ হইয়া পড়ে; তখন তার সঙ্গে সহজ ব্যবহার করিতে আর বাধে না।

বাঙালি আজ ইংরেজের কাছে বিশেষণ হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্য বাঙালির বাস্তব সত্তা ইংরেজের চোখে পড়া আজ বড়ো কঠিন। এইজন্যই ইচ্ছা করিয়াছিলাম, বর্তমান যুরোপীয় যুদ্ধে বাঙালি যুবকদিগকে ভলন্টিয়ার রূপে লড়িতে দেওয়া হয়। ইংরেজের সঙ্গে এক যুদ্ধে মরিতে পারিলে বাঙালিও ইংরেজের চোখে বাস্তব হইয়া উঠিত, ঝাপসা থাকিত না; সুতরাং তার পর হইতে তাকে বিচার করা সহজ হইত।

সে সুযোগ তো চলিয়া গেল। এখনো আমরা অস্পষ্টতার আড়ালেই রহিয়া গেলাম। অস্পষ্টতাকে মানুষ সন্দেহ করে। আজ বাংলাদেশে একজন মানুষও আছে কি যে এই সন্দেহ হইতে মুক্ত?

যাহা হউক, আমাদের মধ্যে এই অস্পষ্টতার গোধূলি ঘনাইয়া আসিয়াছে। এইটেই ছায়াকে বস্তু ও বস্তুকে ছায়া ভ্রম করিবার সময়। এখন পরে পরে কেবলই ভুল-বোঝাবুঝির সময় বাড়িয়া চলিল।

কিন্তু এই অন্ধকারটাকে কি কড়া শাসনের ধুলা উড়াইয়াই পরিষ্কার করা যায়? এখনই কি আলোকের প্রয়োজন সব চেয়ে অধিক নয়? সে আলোক প্রীতির আলোক, সে আলোক সমবেদনার প্রদীপে পরস্পর মুখ-চেনাচিনি করিবার আলোক। এই দুর্যোগের সময়েই কি খৃষ্টান কলেজের কর্তৃপক্ষেরা তাঁহাদের গুরুর চরিত ও উপদেশ স্মরণ করিবেন না? এখনই কি ‘চারিটির’র প্রয়োজন সব চেয়ে অধিক নয়? এই-যে দেশব্যাপী সংশয় ঘনাইয়া উঠিয়া সত্যকে আচ্ছন্ন ও বিকৃত করিয়া তুলিতেছে, ইহাকে সম্পূর্ণ কাটাইয়া তুলিবার শক্তি তাঁদেরই হাতে যাঁরা উপরে আছেন। পৃথিবীর কুয়াশা কাটাইয়া দিবার ভার আকাশের সূর্যের। যখন বারিবর্ষণের প্রয়োজন একান্ত তখন যাঁরা বজ্র-বর্ষণের পরামর্শ দিতেছেন তাঁরা যে কেবলমাত্র সহৃদয়তা ও ঔদার্যের অভাব দেখাইতেছেন তাহা নহে, তাঁরা ভীৰুতার পরিচয় দিতেছেন। পৃথিবীর অধিকাংশ অন্যায় উপদ্রব ভয় হইতে, সাহস হইতে নয়।

উপসংহারে আমি এই কথা কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে স্মরণ করিতে অনুনয় করি। যে বিদ্যালয়ে ইংরেজ অধ্যাপকের কাছে বাঙালি ছাত্রেরা শিক্ষালাভ করিতেছে সেই বিদ্যালয় হইতে নবযুগের বাঙালি যুবক ইংরেজজাতির ‘পরে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি বহন করিয়া সংসারে প্রবেশ করিবে, ইহাই

আশা করিতে পারিতাম। যে বয়সে যে ক্ষেত্রে নূতন নূতন জ্ঞানের আলোকে ও ভাবের বর্ষণে ছাত্রদের মধ্যে নবজীবনের প্রথম বিকাশ ঘটিতেছে সেই বয়সে ও সেই ক্ষেত্রেই ইংরেজ গুরু যদি তাহাদের হৃদয়কে প্রীতির দ্বারা আকর্ষণ করিতে পারেন তবেই এই যুবকেরা ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর সম্বন্ধকে সজীব ও সুদৃঢ় করিয়া তুলিতে পারিবে। এই শুভক্ষণে এবং এই পুণ্যক্ষেত্রে ইংরেজ অধ্যাপকের সঙ্গে বাঙালি ছাত্রের সম্বন্ধ যদি সন্দেহের বিদ্বেষের ও কঠিন শাসনের সম্বন্ধ হয় তবে আমাদের পরস্পরের ভিতরকার এই বিরোধের বিষ ক্রমশই দেশের নাড়ীর মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিবে; ইংরেজের প্রতি অবিশ্বাস পুরুষানুক্রমে আমাদের মজ্জাগত হইয়া অন্ধ সংস্কারে পরিণত হইতে থাকিবে। সে অবস্থায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রশাসন-ব্যাপারে জঞ্জাল কেবলই বাড়িতে থাকিবে বলিয়া যে আশঙ্কা তাহাকেও আমি তেমন গুরুতর বলিয়া মনে করি না; আমার ভয় এই যে, ইংরেজের কাছ হইতে আমরা যে দান দিনে দিনে আনন্দে গ্রহণ করিতে পারিতাম সে দান প্রত্যহ আমাদের হৃদয়ের দ্বার হইতে ফিরিয়া যাইতে থাকিবে। শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করিলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা সম্ভব হয়। যেখানে সেই শ্রদ্ধার সম্পর্ক নাই সেখানে আদানপ্রদানের সম্বন্ধ কলুষিত হইয়া উঠে। জেলখানার কয়েদিরা হাতে বেড়ি পরিয়া যে অন্ন খাইতে বসে তাকে যজ্ঞের ভোজ বলা বিদ্রূপ করা। জ্ঞানের ভোজ আনন্দের ভোজ। সেখানেও যে-সকল কর্তারা ভোক্তার জন্য আজ লোহার হাতকড়ি ফর্মাস দিতেছেন তাঁরা কাল নিতান্ত ভালোমানুষটির মতো আশ্চর্য হইয়া বলিবেন ‘এত করিয়াও বাঙালির ছেলের মন পাওয়া গেল না-কৃতজ্ঞতাবৃত্তি ইহাদের একেবারেই নাই’ এবং তাঁরা রাতে শুইতে যাইবার সময় এবং প্রাতঃকালে জাগিয়া উঠিয়া প্রার্থনা করিবেন: Father, do not forgive them!

প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্রদের সহিত কোনো কোনো যুরোপীয় অধ্যাপকের যে বিরোধ ঘটিয়াছে তাহা লইয়া কোনো কথা বলিতে সংকোচ বোধ করি। তার একটা কারণ, ব্যাপারটা দেখিতেও ভালো হয় নাই, শুনিতেও ভালো নয়। আর-একটা কারণ, ইংরেজ ও ভারতবাসীর সম্পর্কটার মধ্যে যেখানে কিছু ব্যথা আছে সেখানে নাড়া দিতে ইচ্ছা করে না।

কিন্তু কথাটাকে চাপা দিলে চলিবে না। চাপা থাকেও নাই, বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মনে মনে বা কানে কানে বা মুখে মুখে সকলেই এর বিচার করিতেছে।

বিকৃতি ভিতরে জমিতে থাকিলে একদিন সে আর আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। লাল হইয়া শেষকালে ফাটিয়া পড়ে। তখনকার মতো সেটা সুদৃশ্য নয়।

বাহিরে ফুটিয়া পড়াটাকেই দোষ দেওয়া বিশ্ববিধানকে দোষ দেওয়া; এমনতরো অপবাদে বিশ্ববিধাতা কান দেন না। ভিতরে ভিতরে জমিতে দেওয়া লইয়াই আমাদের নালিশ চলে।

যাক, বাহির যখন হইয়াছেই তখন বিচার করিয়া কোনো-একটা জায়গায় শাস্তি না দিলে নয়। এইটেই সংকটের সময়। জিনিসটা ভদ্র রকমের নহে, এটা ঠিক। ইহার আক্রোশটা প্রকাশ করিব কার উপরে? প্রায় দেখা যায় সহজে যার উপরে জোর খাটে শাসনে ধাক্কাটা তারই উপরে পড়ে। ঘরের গৃহিণী যেখানে বউকে মারিতে ভয় পায় সেখানে ঝিকে মারিয়া কর্তব্য পালন করে।

বিচারসভা বসিয়াছে। ইতিমধ্যেই ছাত্রদের সম্বন্ধে শাসন কড়া করিবার জন্য কোনো মিশনারি কলেজের কর্তা কর্তৃপক্ষের নিকট আবদার প্রকাশ করিয়াছেন। কথাটা শুনিতেও হঠাৎ সংগত বোধ হয়। কারণ, ছাত্রেরা অধ্যাপকদের অসম্মান করিলে সেটা যে কেবল অপরাধ হয় তাহা নহে, সেটা অস্বাভাবিক হইয়া উঠে। যেখান হইতে আমরা জ্ঞান পাই, সেখানে আমাদের শ্রদ্ধা যাইবে, এটা মানবপ্রকৃতির ধর্ম। তাহার উল্টা দেখিলে বাহিরের শাসনে এই বিকৃতির প্রতিকার করিতে হইবে, সে কথা সকলেই স্বীকার করিবেন।

কিন্তু প্রতিকারের প্রণালী স্থির করিবার পূর্বে ভাবিয়া দেখা চাই, স্বভাব ওলটায় কিসে।

কাগজে দেখিতে পাই, অনেকে এই বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন যে, যে ভারতবর্ষে গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ ধর্মসম্বন্ধ সেখানে এমনতরো ঘটনা বিশেষভাবে গর্হিত। শুধু গর্হিত এ কথা বলিয়া পার পাইব না, চিরকালীন এই সংস্কার অস্থিমজ্জার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও ব্যবহারে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতেছে কেন এর একটা সত্য উত্তর বাহির করিতে হইবে।

বাংলাদেশের ছাত্রদের মনস্তত্ত্ব যে বিধাতার একটা খাপছাড়া খেয়াল এ কথা মানি না। ছেলেরা যে বয়সে কলেজে পড়ে সেটা একটা বয়ঃসন্ধির কাল। তখন শাসনের সীমানা হইতে স্বাধীনতার এলাকায় সে প্রথম পা বাড়াইয়াছে। এই স্বাধীনতা কেবল বাহিরের ব্যবহারগত নহে; মনোরাজ্যেও সে ভাষার খাঁচা ছাড়িয়া ভাবের আকাশে ডানা মেলিতে শুরু করিয়াছে। তার মন প্রশ্ন করিবার, তর্ক করিবার, বিচার করিবার অধিকার প্রথম লাভ করিয়াছে। শরীর-মনের এই বয়ঃসন্ধিকালটিই বেদনাকাতরতায় ভরা। এই সময়েই অল্পমাত্র অপমান মর্মে গিয়া বিঁধিয়া

থাকে এবং আভাসমাত্র প্রীতি জীবনকে সুধাময় করিয়া তোলে। এই সময়েই মানবসংস্রবের জোর তার ‘পরে যতটা খাটে এমন আর-কোনো সময়েই নয়।

এই বয়সটাই মানুষের জীবন মানুষের সঙ্গপ্রভাবেই গড়িয়া উঠিবার পক্ষে সকলের চেয়ে অনুকূল, স্বভাবের এই সত্যটিকে সকল দেশের লোকেই মানিয়া লইয়াছে। এইজন্যই আমাদের দেশে বলে: প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ। তার মানে এই বয়সেই ছেলে যেন বাপকে পুরাপুরি মানুষ বলিয়া বুঝিতে পারে, শাসনের কল বলিয়া নহে; কেননা, মানুষ হইবার পক্ষে মানুষের সংস্রব এই বয়সেই দরকার। এইজন্যই সকল দেশেই যুনিভার্সিটিতে ছাত্ররা এমন একটুখানি সম্মানের পদ পাইয়া থাকে যাহাতে অধ্যাপকদের বিশেষ কাছে তারা আসিতে পারে এবং সে সুযোগে তাদের জীবনের ‘পরে মানব-সংস্রবের হাত পড়িতে পায়। এই বয়সে ছাত্রগণ শিক্ষার উদ্যোগপর্ব শেষ করিয়া মনুষ্যত্বের সার জিনিসগুলিকে আত্মসাৎ করিবার পালা আরম্ভ করে; এই কাজটি স্বাধীনতা ও আত্মসম্মান ছাড়া হইবার জো নাই। সেইজন্যই এই বয়সে আত্মসম্মানের সম্বন্ধে দরদ বড়ো বেশি হয়। চিবাইয়া খাইবার বয়স আসিলে বেশ একটু জানান দিয়া দাঁত ওঠে, তেমনি মনুষ্যত্বলাভের যখন বয়স আসে তখন আত্মসম্মানবোধটা একটু ঘটা করিয়াই দেখা দেয়।

এই বয়ঃসন্ধির কালে ছাত্ররা মাঝে মাঝে এক-একটা হাঙ্গামা বাধাইয়া বসে। যেখানে ছাত্রদের সঙ্গে অধ্যাপকের সম্বন্ধ স্বাভাবিক সেখানে এই-সকল উৎপাতকে জোয়ারের জলের জঞ্জালের মতো ভাসিয়া যাইতে দেওয়া হয়; কেননা, তাকে টানিয়া তুলিতে গেলেই সেটা বিস্তী হইয়া উঠে।

বিধাতার নিয়ম অনুসারে বাঙালি ছাত্রদেরও এই বয়ঃসন্ধির কাল আসে, তখন তাহাদের মনোবৃত্তি যেমন এক দিকে আত্মশক্তির অভিযুখে মাটি ফুঁড়িয়া উঠিতে চায় তেমনি আর-এক দিকে যেখানে তারা কোনো মহত্ত্ব দেখে, যেখান হইতে তারা শ্রদ্ধা পায়, জ্ঞান পায়, দরদ পায়, প্রাণের প্রেরণা পায়, সেখানে নিজেকে উৎসর্গ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। মিশনরি কলেজের বিধাতা-পুরুষের বিধানে ঠিক এন বয়সেই তাহাদিগকে শাসনে পেষণে দলনে দমনে নিজীব জড়পিণ্ড করিয়া তুলিবার জাঁতাকল বানাইয়া তোলা জগদ্বিধাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ; ইহাই প্রকৃত নাস্তিকতা।

জেলখানার কয়েদি নিয়মের নড়চড় করিলে তাকে কড়া শাসন করিতে কারো বাধে না; কেননা তাকে অপরাধী বলিয়াই দেখা হয়, মানুষ বলিয়া নয়। অপমানের কঠোরতায় মানুষের মনে কড়া পড়িয়া তাকে কেবলই অমানুষ করিতে থাকে, সে হিসাবটা কেহ করিতে চায় না; কেননা, মানুষের দিক দিয়া তাকে হিসাব করাই হয় না। এইজন্য জেলখানার সর্দারি যে করে সে মানুষকে নয়, অপরাধীকেই সকলের চেয়ে বড়ো করিয়া দেখে।

সৈন্যদলকে তৈরি করিয়া তুলিবার ভার যে লইয়াছে সে মানুষকে একটিমাত্র সংকীর্ণ প্রয়োজনের দিক হইতেই দেখিতে বাধ্য। লড়াইয়ের নিখুঁত কল বানাইবার ফরমাস তার উপরে। সুতরাং, সেই কলের হিসাবে যে-কিছু ত্রুটি সেইটে সে একান্ত করিয়া দেখে এবং নির্মমভাবে সংশোধন করে।

কিন্তু ছাত্রকে জেলের কয়েদি বা ফৌজের সিপাই বলিয়া আমরা তো মনে ভাবিতে পারি না। আমরা জানি, তাহাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে। মানুষের প্রকৃতি সূক্ষ্ম এবং সজীব তন্তুজালে বড়ো বিচিত্র করিয়া গড়া। এইজন্যই মানুষের মাথা ধরিলে মাথায় মুণ্ডর মারিয়া সেটা সারানো যায় না; অনেক দিক বাঁচাইয়া প্রকৃতির সাধ্যসাধনা করিয়া তার চিকিৎসা করিতে হয়। এমন লোকও আছে এ সম্বন্ধে যারা বিজ্ঞানকে খুবই সহজ করিয়া আনিয়াছে; তারা সকল ব্যাধিরই একটিমাত্র কারণ ঠিক করিয়া রাখিয়াছে, সে ভূতে পাওয়া। এবং তারা মিশনরি কলেজের ওঝাটির মতো ব্যাধির ভূতকে মারিয়া ঝাড়িয়া, গরম লোহার ছাঁকা দিয়া, চীৎকার করিয়া, তাড়াইতে চায়। তাহাতে ব্যাধি যায়। এবং প্রাণপদার্থের প্রায় পনেরো আনা তার অনুসরণ করে।

এ হইল আনাড়ির চিকিৎসা। যারা বিচক্ষণ তারা ব্যাধিটাকেই স্বতন্ত্র করিয়া দেখে না; চিকিৎসার সময় তারা মানুষের সমস্ত ধাতটাকে অখণ্ড করিয়া দেখে; মানবপ্রকৃতির জটিলতা ও সূক্ষ্মতাকে তারা মানিয়া লয় এবং বিশেষ কোনো ব্যাধিকে শাসন করিতে গিয়া সমস্ত মানুষকে নিকাশ করিয়া বসে না।

অতএব যাদের উচিত ছিল জেলের দারোগা ড্রিল বা সার্জেন্ট বা ভূতের ওঝা হওয়া তাদের কোনোমতেই উচিত হয় না ছাত্রদিগকে মানুষ করিবার ভার লওয়া। ছাত্রদের ভার তাঁরাই লইবার অধিকারী যাঁরা নিজের চেয়ে বয়সে অল্প, জ্ঞানে অপ্রবীণ ও ক্ষমতায় দুর্বলকেও

সহজেই শ্রদ্ধা করিতে পারেন; যাঁরা জানেন, শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা; যাঁরা ছাত্রকেও মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন না।

যিশুখৃষ্ট বলিয়াছেন, ‘শিশুদিগকে আমার কাছে আসিতে দাও।’ তিনি শিশুদিগকে বিশেষ করিয়া শ্রদ্ধা করিয়াছেন। কেননা, শিশুদের মধ্যেই পরিপূর্ণতার ব্যঞ্জনা আছে। যে মানুষ বয়সে পাকা হইয়া অভ্যাসে সংস্কারে ও অহমিকায় কঠিন হইয়া গেছে সে মানুষ সেই পূর্ণতার ব্যঞ্জনা হারাইয়াছে; বিশ্বগুরুর কাছে আসা তার পক্ষেই বড়ো কঠিন।

ছাত্রেরা গড়িয়া উঠিতেছে; ভাবের আলোকে, রসের বর্ষণে তাদের প্রাণকোরকের গোপন মর্মস্থলে বিকাশবেদনা কাজ করিতেছে। প্রকাশ তাদের মধ্যে থামিয়া যায় নাই; তাদের মধ্যে পরিপূর্ণতার ব্যঞ্জনা। সেইজন্যই, সৎগুরু ইহাদিগকে শ্রদ্ধা করেন, প্রেমের সহিত কাছে আহ্বান করেন, ক্ষমার সহিত ইহাদের অপরাধ মার্জনা করেন এবং ধৈর্যের সহিত ইহাদের চিত্তবৃত্তিকে উর্ধ্বের দিকে উদ্ঘাটন করিতে থাকেন। ইহাদের মধ্যে পূর্ণমनुष্যত্বের মহিমা প্রভাতের অরুণরেখার মতো অসীম সম্ভাব্যতার গৌরবে উজ্জ্বল; সেই গৌরবের দীপ্তি যাদের চোখে পড়ে না, যারা নিজের বিদ্যা পদ বা জাতির অভিমানে ইহাদিগকে পদে পদে অবজ্ঞা করিতে উদ্যত, তারা গুরুপদের অযোগ্য। ছাত্রদিগকে যারা স্বভাবতই শ্রদ্ধা করিতে না পারে ছাত্রদের নিকট হইতে ভক্তি তারা সহজে পাইতে পারিবে না। কাজেই ভক্তি জোর করিয়া আদায় করিবার জন্য তারাই রাজদরবারে কড়া আইন ও চাপরাশওয়ালা পেয়াদার দরবার করিয়া থাকে।

ছাত্রদিগকে কড়া শাসনের জালে যাঁরা মাথা হইতে পা পর্যন্ত বাঁধিয়া ফেলিতে চান তাঁরা অধ্যাপকদের যে কত বড়ো ক্ষতি করিতেছেন সেটা যেন ভাবিয়া দেখেন। পৃথিবীতে অল্প লোকই আছে নিজের অন্তরের মহৎ আদর্শ যাহাদিগকে সত্য পথে আহ্বান করিয়া লইয়া যায়। বাহিরের সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাতের ঠেলাতেই তারা কর্তব্য সম্বন্ধে সতর্ক হইয়া থাকে। বাহিরের সঙ্গে বোঝাপড়া আছে বলিয়াই তারা আত্মবিস্মৃত হইতে পারে না।

এইজন্যই চারি দিকে যেখানে দাসত্ব মনিবের সেখানে দুর্গতি, শূদ্র যেখানে শূদ্র ব্রাহ্মণের সেখানে অধঃপতন। কঠোর শাসনের চাপে ছাত্রেরা যদি মানবস্বভাব হইতে ভ্রষ্ট হয়, সকলপ্রকার অপমান দুর্ব্যবহার ও অযোগ্যতা যদি তারা নির্জীবভাবে নিঃশব্দে সহিয়া যায়, তবে অধিকাংশ অধ্যাপকদিগকেই তাহা অধোগতির দিকে টানিয়া লইবে। ছাত্রদের মধ্যে অবজ্ঞার কারণ তাঁরা নিজে ঘটাইয়া তুলিয়া তাহাদের অবমাননার দ্বারা নিজেকে অহরহ অবমানিত করিতে থাকিবেন। অবজ্ঞার ক্ষেত্রে নিজের কর্তব্য কখনোই কেহ সাধন করিতে পারে না।

অপর পক্ষ বলিবেন, তবে কি ছেলেরা যা খুশি তাই করিবে তার সমস্তই সহিয়া লইতে হইবে? আমার কথা এই, ছেলেরা যা খুশি তাই কখনোই করিবে না। তারা ঠিক পথেই চলিবে, যদি তাহাদের সঙ্গে ঠিকমত ব্যবহার করা হয়। যদি তাহাদিগকে অপমান কর, তাহাদের জাতি বা ধর্ম বা আচারকে গালি দাও, যদি দেখে তাহাদের পক্ষে সুবিচার পাইবার আশা নাই, যদি অনুভব করে যোগ্যতাসত্ত্বেও তাহাদের স্বদেশীয় অধ্যাপকেরা অযোগ্যের কাছে মাথা হেঁট করিতে বাধ্য, তবে ক্ষণে ক্ষণে তারা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিবেই; যদি না করে তবে আমরা সেটাকে লজ্জা এবং দুঃখের বিষয় বলিয়া মনে করিব।

অপর পক্ষে একটি সংগত কথা বলিবার আছে। যুরোপীয়ের পক্ষে ভারতবর্ষ বিদেশ, এখানকার আবহাওয়া ক্লাস্তিকর, তাঁহাদের পানাহার উত্তেজক, আমরা তাঁহাদের অধীনস্থ জাতি, আমাদের বর্ণ ধর্ম ভাষা আচার সমস্তই স্বতন্ত্র। তার উপরে, এ দেশে প্রত্যেক ইংরেজই রাজশক্তি বহন করেন, সুতরাং রাজাসন তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই চলিতে থাকে; এই-জন্য ছাত্রকে কেবলমাত্র ছাত্র বলিয়া দেখা তাঁর পক্ষে শক্ত, তাকে প্রজা বলিয়াও দেখেন। অতএব, অতি সামান্য কারণেই অসহিষ্ণু হওয়া তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। বাঙালি ছাত্রদের মানুষ করিবার ভার কেবল তাঁর নয়, ইংরেজ-রাজের প্রতিষ্ঠা রক্ষার ভারও তাঁর। অতএব, একে তিনি ইংরেজ, তার উপর তিনি ইম্পীরিএল সার্ভিসের অধ্যাপক, তার উপরে তিনি রাজার অংশ, তার উপরে তাঁর বিশ্বাস তিনি পতিতউদ্ধার করিবার জন্য আমাদের প্রতি কৃপা করিয়াই এ দেশে আসিয়াছেন-এমন অবস্থায় সকল সময়ে তাঁর মেজাজ ঠিক না থাকিতেও পারে। অতএব, তিনি কিরূপ ব্যবহার করিবেন সে বিচার না করিয়া ছাত্রদেরই ব্যবহারকে আষ্টেপৃষ্ঠে কঠিন করিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। সমুদ্রকে বলিলে চলিবে না যে, তুমি এই পর্যন্ত আসিবে তার উর্ধ্বে নয়', তীরে যারা আছে তাহাদিগকেই বলিতে হইবে, 'তোমরা হঠা, হঠা, আরো হঠা।'

তাই বলিতেছি এ কথা সত্য বলিয়া মানিতেই হইবে যে, নানা অনিবার্য কারণে ইংরেজ অধ্যাপক বাঙালি ছাত্রের সহিত বিশুদ্ধ অধ্যাপকের মতো ব্যবহার করিয়া উঠিতে পারেন না। কেম্ব্রিজে অক্সফোর্ডে ছাত্রদের সহিত অধ্যাপকদের সম্বন্ধ কিরূপ তর্কস্থলে আমরা সে নজির উত্থাপন করিয়া থাকি, কিন্তু তাহাতে লাভ কী! সেখানে যে সম্বন্ধ স্বাভাবিক এখানে যে তাহা

নহে, সে কথা স্বীকার করিতেই হইবে। অতএব, স্বাভাবিকতায় যেখানে গর্ত আছে সেখানে শাসনের হুঁটপাটকেল দিয়া ভরাট করিবার কথাটাই সর্বাগ্রে মনে আসে।

সমস্যাটা আমাদের পক্ষে শক্ত হইয়াছে এই কারণেই। এইজন্যই আমাদের স্বদেশীয় বিধেওরাও ছাত্রদিগকে পরামর্শ দিয়া থাকেন যে, ‘বাপু, তোমরা কোনোমতে এগ্জামিন পাস করিয়াই সমুপস্থ থাকো, মানুষ হইবার দুরাশা মনে রাখিয়ো না।’

এ বেশ ভালো কথা। কিন্তু সুবুদ্ধির কথা চিরদিন খাটে না; মানবপ্রকৃতি সুবুদ্ধির পাকা ভিতের উপরে পাথরে গাঁথিয়া তৈরি হয় নাই। তাকে বাড়িতে হইবে, এইজন্যই সে কাঁচা। এইজন্যই কৃত্রিম ঘেরটাকে সে খানিকটা দূর পর্যন্ত সহ্য করে; তার পরে প্রাণের বাড় আর আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, একদিন হঠাৎ বেড়া ফাটিয়া ভাঙিয়া পড়ে। যে প্রাণ কচি তারই জয় হয়, যে বাঁধন পাকা সে টেকে না।

অতএব, স্বভাবকে যদি কেবল এক পক্ষেই মানি এবং অপর পক্ষে একেবারেই অগ্রাহ্য করি তবে কিছুদিন মনে হয়, সেই এক-তরফা নিষ্পত্তিতে বেশ কাজ চলিতেছে। তার পরে একদিন হঠাৎ দেখিতে পাই কাজ একেবারেই চলিতেছে না। তখন দ্বিগুণ রাগ হয়; যা এতদিন ঠাণ্ডা ছিল তার অকস্মাৎ চঞ্চলতা গুরুতর অপরাধ বলিয়াই গণ্য হইতে থাকে এবং সেই কারণেই শাস্তির মাত্রা দণ্ডবিধির সহজ বিধানকে ছাড়াইয়া যায়। তার পর হইতে সমস্ত ব্যাপারটা এমনি জটিল হইয়া উঠে যে কমিশনের পঞ্চায়েত তার মধ্যে পথ খুঁজিয়া পায় না; তখন বলিতে বাধ্য হয় যে, ‘কুড়াল দিয়া কাটিয়া, আগুন দিয়া পোড়াইয়া, স্ত্রীম্রোলার দিয়া পিষিয়া রাস্তা তৈরি করো।’

কথাটা বেশ। কর্ণধার কানে ধরিয়া ঝাঁকা মারিতে মারিতে স্কুলের খেয়া পার করিয়া দিল, তার পরে লৌহশাসনের কলের গাড়িতে প্রাণরসকে অন্তররুদ্ধ তপ্তবাস্পে পরিণত করিয়া যুনিভার্সিটির শেষ ইস্টেশনে গিয়া নামিলাম, সেখানে চাকরির বালুময়ুগে দীর্ঘ মধ্যাহ্ন জীবিকা-মরীচিকার পিছনে ধুকিতে ধুকিতে চলিলাম, তার পরে সূর্য যখন অস্ত যায় তখন যমরাজের সদর গেটের কাছে গিয়া মাথার বোঝা নামাইয়া দিয়া মনে করিলাম ‘জীবন সার্থক হইল’। জীবনযাত্রার এমন নিরাপদ এবং শান্তিময় আদর্শ অন্য কোথাও নাই। এই আদর্শ আমাদের দেশে যদি চিরদিন টেকা সম্ভবপর হইত তাহা হইলে কোনো কথা বলিতাম না।

কিন্তু টিকিল না। তার কারণ, আমরা তো কেবলমাত্র খৃষ্টানকলেজের প্রধান অধ্যক্ষ এবং পতিত-উদ্ধারের দুঃসাধ্যব্রতধারীদের কাছ হইতেই শিক্ষা পাই নাই। আমরা যে ইংলন্ডের কাছ

হইতে শিখিতেছি। সেও আজ একশো বছরের উপর হইয়া গেল। সে শিক্ষা তো বন্ধ্য নহে, নূতন প্রাণকে সে জন্ম দিবেই। তার পরে সেই প্রাণের ক্ষুধাতৃষ্ণা যে অল্পপানীয়ের দাবি করিবে তাকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করিতে কেহ পারিবে না।

মনে আছে, ছেলেবেলা যখন ইংরেজি মাস্টারের কাছে ইংরেজি শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ মুখস্থ করিতে হইত তখন □ শব্দের একটা প্রতিশব্দ বহু কষ্টে কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম, সে হইতেছে : *Myself-I, by Myself* □। ইংরেজি এই □ শব্দের প্রতিশব্দটি আয়ত্ত করিতে কিছু দিন সময় লাগিয়াছে; ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প করিয়া ওটা একরকম সড়গড় হইয়া আসিল। এখন মাস্টারমশায় □ হইতে ঐ *myself*-টাকে কালির দাগে লাঞ্চিত করিয়া রবারের ঘর্ষণে একেবারে মুছিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিতেছেন। আমাদের খৃষ্টান হেডমাস্টার বলিতেছেন, ‘আমাদের দেশে □ শব্দের যে অর্থ তোমাদের দেশে সে অর্থ হইতেই পারে না।’ কিন্তু ওটাকে কণ্ঠস্থ করিতে যদি আমাদের দুইশো বছর লাগিয়া থাকে ওটাকে সম্পূর্ণ বহিস্কৃত করিতে তার ডবল সময়েও কুলায় কিনা সন্দেহ করি। কেননা, ঐ □ শব্দের ইংরেজি মন্ত্রটা ভয়ংকর কড়া, গুরু যদি গোড়া হইতেই ওটা সম্পূর্ণ চাপিয়া যাইতে পারিতেন তো কোনো বালাই থাকিত না; এখন ওটা কান হইতে প্রাণের মধ্যে পৌঁছিয়াছে, এখন প্রাণটাকে মারিয়া ওটাকে উপড়ানো যায়। কিন্তু প্রাণ বড়ো শক্ত জিনিস।

ইংলন্ড যতক্ষণ পর্যন্ত ভারতবর্ষের সঙ্গে আপন সম্পর্ক রাখিয়াছে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে আপনি লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। যাহা তার সর্বোচ্চ সম্পদ তাহা ইচ্ছা করিয়াই হউক, ইচ্ছার বিরুদ্ধেই হউক, আমাদিগকে দিতেই হইবে। ইহাই বিধাতার অভিপ্রায়, তার সঙ্গে প্রিন্সিপাল সাহেবের অভিপ্রায় মিলুক আর নাই মিলুক। তাই আজ আমাদের ছাত্রেরা কেবলমাত্র ইংরেজি কেতাবের ইংরেজি নোট কুড়ানোর উজ্জ্বলিতেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করিবে না, আজ তারা আত্মসম্মানকে বজায় রাখিতে চাহিবে; আজ তারা নিজেকে কলের পুতুল বলিয়া ভুল করিতে পারিবে না; আজ তারা জেলের দারোগাকে নিজের গুরু বলিয়া মানিয়া শাসনের চোটে তাকে গুরুভক্তি দেখাইতে রাজি হইবে না। আজ যাহা সত্য হইয়া উঠিয়াছে তাকে গালি দিলেও তাহা মিথ্যা হইবে না এবং তার গালে চড় মারিলেও সে যে সত্য ইহাই আরো বেশি করিয়া প্রমাণ হইতে থাকিবে।

যে কথা লইয়া আজ আলোচনা চলিতেছে এ যদি একটা সামান্য ও সাময়িক আন্দোলন মাত্র হইত তাহা হইলে আমি কোনো কথাই বলিতাম না। কিন্তু ইহার মূলে খুব একটা বড়ো কথা আছে, সেইজন্যই এই প্রসঙ্গে চুপ করিয়া থাকা অন্যায় মনে করি।

মানুষের ইতিহাস ভিন্ন দেশে ভিন্ন মূর্তি ধরে। ভারতবর্ষের ইতিহাসেরও বিশেষত্ব আছে। সেই ইতিহাসের গোড়া হইতেই আমরা দেখিয়া আসিতেছি, এ দেশ কোনো বিশেষ একটি জাতির বা বিশেষ একটি সভ্যতার দেশ নয়। এ দেশে আর্যসভ্যতাও যেমন সত্য দ্রাবিড়সভ্যতাও তেমনি সত্য, এ দেশে হিন্দুও যত বড়ো মুসলমানও তার চেয়ে নিতান্ত কম নয়। এইজন্যই এখানকার ইতিহাস নানা বিরোধের বাষ্পসংঘাতে প্রকাণ্ড নীহারিকার মতো ঝাপসা হইয়া আছে। এই ইতিহাসে আমরা নানা শক্তির আলোড়ন দেখিয়া আসিতেছি, কিন্তু একটা অখণ্ড ঐতিহাসিক মূর্তির উদ্ভাবন এখনো দেখি নাই। এই পরিব্যাপ্ত বিপুলতার মধ্য হইতে একটি নিরবচ্ছিন্ন ‘আমি’র সুস্পষ্ট ক্রন্দন জাগিল না।

স্বাভাবিক যখন দ্রব অবস্থায় থাকে তখন তাহা মূর্তিহীন; আমরা সেই অবস্থায় অনেক দিন কাটাইলাম। এমন সময় সমুদ্রপার হইতে একটি আঘাত এই তরল পদার্থের উপর হইতে নীচে, এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্তে সঞ্চারিত হইয়াছে; তাই অনুভব করিতেছি দানা বাঁধিবার মতো একটা সর্বব্যাপী আবেগ ইহার কণায় কণায় যেন নড়িয়া উঠিল। মূর্তি ধরিয়া উঠিবার একটা বেদনা ইহার সর্বত্র যেন চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে।

তাই দেখিতেছি, ভারতবর্ষের ইতিহাসে যেমন আর্য আছে দ্রাবিড় আছে, যেমন মুসলমান আছে, তেমনি ইংরেজও আসিয়া পড়িয়াছে। তাই, ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস কেবল আমাদের ইতিহাস নহে, তাহা ইংরেজেরও ইতিহাস। এখন আমাদের দেখিতে হইবে, ইতিহাসের এই-সমস্ত অংশগুলি ঠিকমত করিয়া মেলে, সমস্তটাই এক সজীব শরীরের অঙ্গ হইয়া উঠে। ইহার মধ্যে কোনো-একটা অংশকে বাদ দিব সে আমাদের সাধ্য নাই। মুসলমানকে বাদ দিতে পারি নাই; ইংরেজকেও বাদ দিতে পারিব না। এ কেবল বাহুবলের অভাববশত নহে, আমাদের ইতিহাসটার প্রকৃতিই এই; তাহা কোনো এক-জাতির ইতিহাস নয়, তাহা একটা মানব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ইতিহাস।

এই-যে নানা যুগ, নানা জাতি ও নানা সভ্যতা ভারতবর্ষের ইতিহাসকে গড়িয়া তুলিতেছে, আজ সেই ঐতিহাসিক অভিপ্রায়ের অনুগত করিয়া আমাদের অভিপ্রায়কে সজাগ করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে আমাদের দেশ ইংলন্ড নয়, ইটালি নয়, আমেরিকা নয়; সেখানকার মাপে

কোনোমতেই আমাদের ইতিহাসকে ছাঁটা চলবে না। এখানে একেবারে মূলে তফাত। ও-সকল দেশ মোটের উপরে একটা ঐক্যকে লইয়াই নিজেরা ইতিহাস ফাঁদিয়াছে, আমরা অনেকা লইয়াই প্রথম হইতে শুরু করিয়াছি এবং আজ পর্যন্ত কেবল তাহা বাড়িয়াই চলিয়াছে।

আমাদিগকে ভাবিতে হইবে, এই লইয়াই আমরা কী করিতে পারি। বাহিরকে কেমন করিয়া বাহির করিয়া দিব, স্বভাবতই অন্য ইতিহাসের এই ভাবনা; বাহিরকে কেমন করিয়া আপন করিয়া লইব, স্বভাবতই আমাদের ইতিহাসের এই ভাবনা।

ইংরেজকে আমাদের দেশের পক্ষে আপন করিয়া না লইতে পারিলে আমাদের স্বাস্থ্য নাই, কল্যাণ নাই। ইংরেজের শাসন যতক্ষণ আমাদের পক্ষে কলের শাসন থাকিবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সম্বন্ধ মানবসম্বন্ধ না হইবে, ততক্ষণ Pax Britannica আমাদিগকে ‘শান্তি’ দিবে, জীবন দিবে না। আমাদের অন্নের হাঁড়িতে জল চড়াইবে মাত্র, চুলাতে আগুন ধরাইবে না। অর্থাৎ, ততক্ষণ ইংরেজ ভারতবর্ষের সৃজনকার্যে বিশ্বকর্মার ঘনিষ্ঠ সহযোগী হইবে না, বাহির হইতে মজুরি করিয়া কেবল ইঁট কাঠ ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যাইবে। ইহাকেই একজন ইংরেজ কবি বলিয়াছেন the white man's burden। কিন্তু ‘বার্ডেন’ কেন হইতে যাইবে? এ কেন সৃজনকার্যের আনন্দ না হইবে? সৃষ্টিকর্তার ডাকে ইংরেজ এখানে আসিয়াছে, তাকে সৃষ্টিকার্যে যোগ দিতেই হইবে। যদি আনন্দের সঙ্গে যোগ দিতে পারে তবেই সব দিকে ভালো, যদি না পারে তবে এই land of regrets-এর তপ্ত বালুকাপথ তাহাদের কঙ্কালে খচিত হইয়া যাইবে, তবু ভার বহিতেই হইবে। ভারতইতিহাসের গঠনকাজে যদি তাহাদের প্রাণের যোগ না ঘটে, কেবলমাত্র কাজের যোগ ঘটে, তাহা হইলে ভারতবর্ষের বিধাতা বেদনা পাইবেন, ইংরেজও সুখ পাইবে না।

তাই ভারত-ইতিহাসের প্রধান সমস্যা এই, ইংরেজকে পরিহার করা নয়, ইংরেজের সঙ্গে ভারতবর্ষের

সম্বন্ধকে সজীব ও স্বাভাবিক করিয়া তোলা। এত দিন পর্যন্ত হিন্দু মুসলমান ও ভারতবর্ষের নানা বিচিত্র জাতিতে মিলিয়া এ দেশের ইতিহাস আপনা-আপনি যেমন-তেমন করিয়া গড়িয়া উঠিতেছিল। আজ ইংরেজ আসার পর এই কাজে আমাদের চেতনা জাগিয়াছে; ইতিহাসরচনায় আজ আমাদের ইচ্ছা কাজ করিতে উদ্যত হইয়াছে।

এইজন্যই ইচ্ছায় ইচ্ছায় মাঝে মাঝে দ্বন্দ্ব বাধিবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু যাঁরা এ দেশের সঞ্জীবনমন্ত্রের তপস্বী রাগদ্বেষ্টে ক্ষুব্ধ হইলে তাঁদের চলিবে না। তাঁহাদিগকে এ কথা মনে রাখিতে

হইবে যে, ইচ্ছায় ইচ্ছায় মিল করাই চাই। কারণ, ইংরেজ ভারতের ইতিহাস-ধারাকে বাধা দিতে আসে নাই, তাহাতে যোগ দিতে আসিয়াছে। ইংরেজকে নহিলে ভারত-ইতিহাস পূর্ণ হইতেই পারে না। সেইজন্যই আমরা কেবলমাত্র ইংরেজের আপিস চাই না, ইংরেজের হৃদয় চাই।

ইংরেজ যদি আমাদেরকে অবাধে অনায়াসে অবজ্ঞা করিতে পায় তাহা হইলেই আমরা তার হৃদয় হারাইব। শ্রদ্ধা আমাদেরকে দাবি করিতেই হইবে; আমরা খৃষ্টান প্রিন্সিপালের নিকট হইতেও এক গালে চড় খাইয়া অন্য গাল ফিরাইয়া দিতে পারিব না।

ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর জীবনের সম্বন্ধ কোথায় সহজে ঘটিতে পারে? বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নয়, রাজকীয় ক্ষেত্রেও নয়। তার সর্বোৎকৃষ্ট স্থান বিদ্যাদানের ক্ষেত্রে। জ্ঞানের আদানপ্রদানের ব্যাপারটি সাত্ত্বিক। তাহা প্রাণকে উদ্বেগিত করে। সেইজন্য এইখানেই প্রাণের নাগাল পাওয়া সহজ। এইখানেই গুরুর সঙ্গে শিষ্যের সম্বন্ধ যদি সত্য হয় তবে ইহজীবনে তার বিচ্ছেদ নাই। তাহা পিতার সঙ্গে পুত্রের সম্বন্ধের চেয়েও গভীরতর।

আমাদের যুনিভার্সিটিতে এই সুযোগ ঘটিয়াছিল। এইখানে ইংরেজ এমন একটি স্থান পাইতে পারিত যাহা সে রাজসিংহাসনে বসিয়াও পায় না। এই সুযোগ যখন ব্যর্থ হইতে দেখা যায় তখন আক্ষেপের সীমা থাকে না।

ব্যর্থতার কারণ আমাদের ছাত্ররাই, এ কথা আমি কিছুতেই মানিতে পারি না। আমাদের দেশের ছাত্রদের আমি ভালো করিয়াই জানি। ইংরেজ ছেলের সঙ্গে একটা বিষয়ে ইহাদের প্রভেদ আছে। ইহারা ভক্তি করিতে পাইলে আর কিছু চায় না। অধ্যাপকের কাছ হইতে একটুমাত্রও যদি ইহারা খাঁটি স্নেহ পায় তবে তাঁর কাছে হৃদয় উৎসর্গ করিয়া দিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। আমাদের ছেলেদের হৃদয় নিতান্তই সস্তা দামে পাওয়া যায়।

এইজন্যই আমার যে-একটি বিদ্যালয় আছে সেখানে ইংরেজ অধ্যাপক আনিবার জন্য অনেকদিন হইতে উদ্যোগ করিয়াছি। বহুকাল পূর্বে একজনকে আনিয়াছিলাম। তিনি সুদীর্ঘকাল ভারতবর্ষের আবহাওয়ায় পাকিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁর অন্তঃকরণে পিত্তাধিক্য ঘটিয়াছিল। তিনি তাঁর ক্লাসে ছেলেদের জাতি তুলিয়া গালি দিতেন; তারা বাঙালির ঘরে জন্মিয়াছে এই অপরাধ তিনি সহিতে পারিতেন না। সেই ছেলেরা যদিচ প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র নয়, তাদের বয়স নয়-দশ বৎসর হইবে, তবু তারা তাঁর ক্লাসে যাওয়া ছাড়িল। হেডমাস্টারের

তাড়নাতেও কোনো ফল হইল না। দেখিলাম হিতে বিপরীত ঘটিল। এই মাস্টারটিকে white man's burden হইতে সে যাত্রায় নিষ্কৃতি দিলাম।

কিন্তু, আশা ছাড়ি নাই এবং আমার কামনাও সফল হইয়াছে। আজ ইংরেজ গুরুর সঙ্গে বাঙালি ছাত্রের জীবনের গভীর মিলন ঘটিয়া আশ্রম পবিত্র হইয়াছে। এই পুণ্য মিলনটি সমস্ত ভারতক্ষেত্রে দেখিবার জন্য বিধাতা অপেক্ষা করিতেছেন। যে-দুটি ইংরেজ তাপস সেখানে আছেন তাঁরা নিজের ধর্ম প্রচার করিতে যান নাই, তাঁরা পতিত-উদ্ধারের দুঃসহ কর্তব্যভার গ্রহণ করেন নাই; তাঁরা গ্রীকদের মতো বর্বর জাতিকে সভ্যতায় দীক্ষিত করিবার জন্য ধরাধামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এমন অভিমান মনে রাখেন না। তাঁরা তাঁদের পরমগুরুর মতো করিয়াই দুই হাত বাড়াইয়া বলিয়াছেন, ‘ছেলেদের আসিতে দাও আমার কাছে, হোক-না তারা বাঙালির ছেলে। ছেলেরা তাঁদের অত্যন্ত কাছে আসিতে লেশমাত্র বিলম্ব করে নাই, হোন্-না তাঁরা ইংরেজ। আজ এই কথা বলিতে পারি, এই দুটি ইংরেজের সঙ্গে আমার ছেলেদের যে সম্বন্ধ ঘটিয়াছে তাহা তাহাদের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকিবে। এই ছেলেরা ইংরেজবিদ্বেষের বিষে জীবন পূর্ণ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিবে না।

প্রথমে যে শিক্ষকটি আসিয়াছিলেন তিনি শিক্ষকতায় পাকা ছিলেন। তাঁর কাছে পড়িতে পাইলে ছেলেদের ইংরেজি উচ্চারণ ও ব্যাকরণ দুরন্ত হইয়া যাইত। সেই লোভে আমি কঠোর শাসনে ছাত্রগুলিকে তাঁর ক্লাসে পাঠাইতে পারিতাম। মনে করিতে পারিতাম, শিক্ষক যেমনই দুর্ব্যবহার করুন ছাত্রদের কর্তব্য সমস্ত সহিয়া তাঁকে মানিয়া চলা। কিছুদিন তাদের মনে বাজিত, হয়তো কিছুদিন পরে তাদের মনে বাজিতও না, কিন্তু তাদের অ্যাক্সেসেন্ট বিশুদ্ধ হইত। তা হউক, কিন্তু এই মানবের ছেলেদের কি ভগবান নাই? আমরাই কি চুল পাকিয়াছে বলিয়া তাদের বিধাতাপুরুষ? ইংরেজি ভাষায় বিশুদ্ধ অ্যাক্সেসেন্টের জোরে সেই ভগবানের বিচারে আমি কি খালাস পাইতাম?

ইংরেজ অধ্যাপকের সহিত বাঙালি ছাত্রদের সম্বন্ধ সরল ও স্বাভাবিক হওয়া বর্তমানে বিশেষ কঠিন হইয়াছে। তার কারণ কী, একদিন ইংলন্ডে থাকিতে তাহা খুব স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম। রেলগাড়িতে একজন ইংরেজ আমার পাশে বসিয়াছিলেন; প্রথমটা আমাকে দেখিয়া তাঁর ভালোই লাগিল। এমন-কি, তাঁর মনে হইল ইংলন্ডে আমি ধর্মপ্রচার করিতে আসিয়াছি। যুরোপের লোককে সাধু উপদেশ দিবার অধিকার আমাদেরও আছে, এ মত তিনি

বিশেষ উৎসাহের সহিত প্রকাশ করিলেন। এমন সময় হঠাৎ তাঁর কৌতূহল হইল আমি ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশ হইতে আসিয়াছি তাহা জানিবার জন্য। আমি বলিলাম, আমি বাংলাদেশের লোক। শুনিয়া তিনি লাফাইয়া উঠিলেন। কোনো দুষ্কর্মই যে বাংলাদেশের লোকের অসাধ্য নহে, তাহা তিনি তীব্র উত্তেজনার সঙ্গে বলিতে লাগিলেন।

কোনো জাতির উপর যখন রাগ করি তখন সে জাতির প্রত্যেক মানুষ আমাদের কাছে একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট সত্তা হইয়া উঠে। তখন সে আর বিশেষ্য থাকে না, বিশেষণ হয়। আমার সহযাত্রী যতক্ষণ না জানিয়াছিলেন আমি বাঙালি ততক্ষণ তিনি আমার সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের মতো ব্যবহার করিতেছিলেন, সুতরাং আদব-কায়দার ঢাট্টা হয় নাই। কিন্তু যেই তিনি শুনিলেন আমি বাঙালি অমনি আমার ব্যক্তিবিশেষত্ব বাষ্প হইয়া গিয়া একটা বিকট বিশেষণে আসিয়া দাঁড়াইল, সেই বিশেষণটি অভিধানে যাকে বলে ‘নিদারুণ’। বিশেষণ-পদার্থের সঙ্গে সাধারণ ভদ্রতা রক্ষার কথা মনেই হয় না। কেননা, ওটা অপদার্থ বলিলেই হয়।

রাশিয়ানের উপর ইংরেজের যখন রাগ ছিল তখন রাশিয়ান-মাত্রেরই তার কাছে একটা বিশেষণ হইয়া উঠিয়াছিল। আজ ইংরেজি কাগজে প্রায়ই দেখিতে পাই, রাশিয়ানের ধর্মপরতা সহৃদয়তার সীমা নাই। মানুষকে বিশেষণ হইতে বিশেষ্যের কোঠায় ফেলিবা-মাত্র তার মানবধর্ম প্রকাশ হইয়া পড়ে; তখন তার সঙ্গে সহজ ব্যবহার করিতে আর বাধে না।

বাঙালি আজ ইংরেজের কাছে বিশেষণ হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্য বাঙালির বাস্তব সত্তা ইংরেজের চোখে পড়া আজ বড়ো কঠিন। এইজন্যই ইচ্ছা করিয়াছিলাম, বর্তমান যুরোপীয় যুদ্ধে বাঙালি যুবকদিগকে ভলন্টিয়ার রূপে লড়িতে দেওয়া হয়। ইংরেজের সঙ্গে এক যুদ্ধে মরিতে পারিলে বাঙালিও ইংরেজের চোখে বাস্তব হইয়া উঠিত, ঝাপসা থাকিত না; সুতরাং তার পর হইতে তাকে বিচার করা সহজ হইত।

সে সুযোগ তো চলিয়া গেল। এখনো আমরা অস্পষ্টতার আড়ালেই রহিয়া গেলাম। অস্পষ্টতাকে মানুষ সন্দেহ করে। আজ বাংলাদেশে একজন মানুষও আছে কি যে এই সন্দেহ হইতে মুক্ত?

যাহা হউক, আমাদের মধ্যে এই অস্পষ্টতার গোধূলি ঘনাইয়া আসিয়াছে। এইটেই ছায়াকে বস্তু ও বস্তুকে ছায়া ভ্রম করিবার সময়। এখন পরে পরে কেবলই ভুল-বোঝাবুঝির সময় বাড়িয়া চলিল।

কিন্তু এই অন্ধকারটাকে কি কড়া শাসনের ধূলা উড়াইয়াই পরিষ্কার করা যায়? এখনই কি আলোকের প্রয়োজন সব চেয়ে অধিক নয়? সে আলোক প্রীতির আলোক, সে আলোক সমবেদনার প্রদীপে পরস্পর মুখ-চেনাচিনি করিবার আলোক। এই দুর্যোগের সময়েই কি খৃষ্টান কলেজের কর্তৃপক্ষেরা তাঁহাদের গুরুর চরিত ও উপদেশ স্মরণ করিবেন না? এখনই কি ‘চারিটির’র প্রয়োজন সব চেয়ে অধিক নয়? এই-যে দেশব্যাপী সংশয় ঘনাইয়া উঠিয়া সত্যকে আচ্ছন্ন ও বিকৃত করিয়া তুলিতেছে, ইহাকে সম্পূর্ণ কাটাইয়া তুলিবার শক্তি তাঁদেরই হাতে য়াঁরা উপরে আছেন। পৃথিবীর কুয়াশা কাটাইয়া দিবার ভার আকাশের সূর্যের। যখন বারিবর্ষণের প্রয়োজন একান্ত তখন য়াঁরা বজ্র-বর্ষণের পরামর্শ দিতেছেন তাঁরা যে কেবলমাত্র সহৃদয়তা ও ঔদার্যের অভাব দেখাইতেছেন তাহা নহে, তাঁরা ভীৰুতার পরিচয় দিতেছেন। পৃথিবীর অধিকাংশ অন্যায় উপদ্রব ভয় হইতে, সাহস হইতে নয়।

উপসংহারে আমি এই কথা কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে স্মরণ করিতে অনুনয় করি। যে বিদ্যালয়ে ইংরেজ অধ্যাপকের কাছে বাঙালি ছাত্রেরা শিক্ষালাভ করিতেছে সেই বিদ্যালয় হইতে নবযুগের বাঙালি যুবক ইংরেজজাতির ‘পরে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি বহন করিয়া সংসারে প্রবেশ করিবে, ইহাই আশা করিতে পারিতাম। যে বয়সে যে ক্ষেত্রে নূতন নূতন জ্ঞানের আলোকে ও ভাবের বর্ষণে ছাত্রদের মধ্যে নবজীবনের প্রথম বিকাশ ঘটিতেছে সেই বয়সে ও সেই ক্ষেত্রেই ইংরেজ গুরু যদি তাহাদের হৃদয়কে প্রীতির দ্বারা আকর্ষণ করিতে পারেন তবেই এই যুবকেরা ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর সম্বন্ধকে সজীব ও সুদৃঢ় করিয়া তুলিতে পারিবে। এই শুভক্ষণে এবং এই পুণ্যক্ষেত্রে ইংরেজ অধ্যাপকের সঙ্গে বাঙালি ছাত্রের সম্বন্ধ যদি সন্দেহের বিদ্বেষের ও কঠিন শাসনের সম্বন্ধ হয় তবে আমাদের পরস্পরের ভিতরকার এই বিরোধের বিষ ক্রমশই দেশের নাড়ীর মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিবে; ইংরেজের প্রতি অবিশ্বাস পুরুষানুক্রমে আমাদের মজ্জাগত হইয়া অন্ধ সংস্কারে পরিণত হইতে থাকিবে। সে অবস্থায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রশাসন-ব্যাপারে জঞ্জাল কেবলই বাড়িতে থাকিবে বলিয়া যে আশঙ্কা তাহাকেও আমি তেমন গুরুতর বলিয়া মনে করি না; আমার ভয় এই যে, ইংরেজের কাছ হইতে আমরা যে দান দিনে দিনে আনন্দে গ্রহণ করিতে পারিতাম সে দান প্রত্যহ আমাদের হৃদয়ের দ্বার হইতে ফিরিয়া যাইতে থাকিবে। শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করিলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা সম্ভব হয়। যেখানে সেই শ্রদ্ধার সম্পর্ক নাই সেখানে আদানপ্রদানের সম্বন্ধ কলুষিত হইয়া উঠে। জেলখানার কয়েদিরা হাতে বেড়ি পরিয়া যে অন্ন

খাইতে বসে তাকে যজ্ঞের ভোজ বলা বিদ্রূপ করা। জ্ঞানের ভোজ আনন্দের ভোজ। সেখানেও যে-সকল কর্তারা ভোক্তার জন্য আজ লোহার হাতকড়ি ফর্মাশ দিতেছেন তাঁরা কাল নিতান্ত ভালোমানুষটির মতো আশ্চর্য হইয়া বলিবেন ‘এত করিয়াও বাঙালির ছেলের মন পাওয়া গেল না-কৃতজ্ঞতাবৃত্তি ইহাদের একেবারেই নাই’ এবং তাঁরা রাত্রে শুইতে যাইবার সময় এবং প্রাতঃকালে জাগিয়া উঠিয়া প্রার্থনা করিবেন: Father, do not forgive them!

অসন্তোষের কারণ

ভারতবর্ষের নানা স্থানেই নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে। ইহাতে বুঝা যায়, শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের মনে একটা অসন্তোষ জন্মিয়াছে। কেন সেই অসন্তোষ? দুইটি কারণ আছে; একটা বাহিরের, একটা ভিতরের।

সকলেই জানেন, আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষার যখন প্রথম পত্তন হইয়াছিল তখন তাহার লক্ষ্য ছিল এই যে, ব্রিটিশ ভারতের রাজ্যশাসন ও বাণিজ্যচালনের জন্য ইংরেজি জানা দেশি কর্মচারী গড়িয়া তোলা। অনেকদিন হইতেই সেই গড়নের কাজ চলিতেছে। যতকাল ছাত্রসংখ্যা অল্প ছিল ততকাল প্রয়োজনের সঙ্গে আয়োজনের সামঞ্জস্য ছিল; কাজেই সে দিক হইতে কোনো পক্ষে অসন্তোষের কোনো কারণ ঘটে নাই। যখন হইতে ছাত্রের পরিমাণ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে তখন হইতেই এই শিক্ষাব্যবস্থার একটা প্রধান উদ্দেশ্য অধিকাংশ ছাত্রেরই পক্ষে ব্যর্থ হইতেছে। যদি আমাদের দেশের শিক্ষায় ছাত্রদিগকে চাকরি ছাড়া অন্যান্য জীবিকার সংস্থানে পটু করিয়া তুলিত তাহা হইলে এই সম্বন্ধে নালিশের কথা থাকিত না। কিন্তু পটু না করিয়া সর্বপ্রকারে অপটুই করিতেছে, এ কথা আমরা নিজের প্রতি তাকাইলে বুঝিতে পারি।

এই তো গেল বাহিরের দিকের নালিশ। ভিতরের দিকের নালিশ এই যে, এত কাল ধরিয়া ইংরেজের স্কুলে পড়িতেছি, কিন্তু ছাত্রদশা তো কোনোমতেই ঘুচিল না। বিদ্যা বাহির হইতেই কেবল জমা করিলাম, ভিতর হইতে কিছু তো দিলাম না। কলসে কেবলই জল ভরিতে থাকিব, অথচ সে জল কোনোদিনই যথেষ্ট পরিমাণে দান-পানের উপযোগী ভরা হইবে না, এ যে বিষম বিপত্তি। ভয়ে ভয়ে ইংরেজের ডাক্তার ছাত্র পুঁথি মিলাইয়া ডাক্তারি করিয়া চলিল, কিন্তু শারীরবিদ্যায় বা চিকিৎসাশাস্ত্রে একটা-কোনো নূতন তত্ত্ব বা তথ্য যোগ করিল না। ইংরেজের

এঞ্জিনিয়ার ছাত্র সতর্কতার সহিত পুঁথি মিলাইয়া এঞ্জিনিয়ারি করিয়া পেন্সন লইতেছে, কিন্তু যন্ত্রতত্ত্বে বা যন্ত্র-উদ্ভাবনায় মনে রাখিবার মতো কিছুই করিতেছে না। শিক্ষার এই শক্তিহীনতা আমরা স্পষ্টই বুঝিতেছি। আমাদের শিক্ষাকে আমাদের বাহন করিলাম না, শিক্ষাকে আমরা বহন করিয়াই চলিলাম, ইহারই পরম দুঃখ গোচরে অগোচরে আমাদের মনের মধ্যে জমিয়া উঠিতেছে।

অথচ, বুদ্ধির এই কৃশতা নির্জীবতা যে আমাদের প্রকৃতিগত নয় তার বর্তমান প্রমাণ: জগদীশ বসু, প্রফুল্ল রায়, ব্রজেন্দ্র শীল। আমাদের শিক্ষার একান্তদীনতা ও পরবশতা সত্ত্বেও ইহাদের বুদ্ধি ও বিদ্যা বিশ্বজ্ঞানের মহাকাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। আর, অতীতকালের একটা মস্ত প্রমাণ এই যে, আমাদের প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্র নানা শাখায় প্রশাখায়, নানা পরীক্ষায় ও উদ্ভাবনায় বিচিত্র বৃহৎ ও প্রাণবান হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পরের-ইস্কুলে-শেখা চিকিৎসাবিদ্যায় আজ আমাদের এত ক্ষীণতা ও ভীর্ণতা কেন!

ইহার প্রধান কারণ, ভাণ্ডারঘর যেমন করিয়া আহাৰ্য দ্রব্য সঞ্চয় করে আমরা তেমনি করিয়াই শিক্ষা সঞ্চয় করিতেছি, দেহ যেমন করিয়া আহাৰ্য গ্রহণ করে তেমন করিয়া নহে। ভাণ্ডারঘর যাহা-কিছু পায় হিসাব মিলাইয়া সাবধানে তাহার প্রত্যেক কণাটিকে রাখিবার চেষ্টা করে। দেহ যাহা পায় তাহা রাখিবার জন্য নহে, তাহাকে অঙ্গীকৃত করিবার জন্য। তাহা গোরুর গাড়ির মতো ভাড়া খাটিয়া বাহিরে বহন করিবার জন্য নহে, তাহাকে অন্তরে রূপান্তরিত করিয়া রক্তে মাংসে স্বাস্থ্যে শক্তিতে পরিণত করিবার জন্য। আজ আমাদের মুশকিল হইয়াছে এই যে, এই এত বছরের নোটবুকের বস্তা-ভরা শিক্ষার মাল লইয়া আজ আমাদের গোরুর গাড়িও বাহিরে তেমন করিয় ভাড়া খাটিতেছে না, অথচ সেটাকে মনের আনন্দে দিব্য পাক করিয়া ও পরিপাক করিয়া পেট ভরাই সে ব্যবস্থাও কোথাও নাই। তাই আমাদের বাহিরের থলিটাও রহিল ফাঁকা, অন্তরের পাকযন্ত্রটাও রহিল উপবাসী। গাড়োয়ান তাহার লাইসেন্সের পদক গলায় ঝুলাইয়া মালখানার দ্বারে চোখের জল মুছিতেছে, তাহার একমাত্র আশাভরসা কন্যার পিতার কাছে। এমন অবস্থাতেও এখনো যে যথেষ্ট পরিমাণে অসন্তোষ জন্মে নাই তাহার কারণ, বৃথা আশা মরিতে মরিতেও মরে না এবং নিষ্ফল অভ্যাস আপন বেড়ার বাহিরে ফললাভের কোনো ক্ষেত্র চোখেই দেখিতে পায় না। উপবাসকৃশ অক্ষম আপন ব্যর্থতার মধ্যেই চিত হইয়া পড়িয়া মনে করিতে থকে, এইখানেই এক পাশ হইতে আর-এক পাশে ফিরিয়া কাঁদিয়া-কাটিয়া

দৈবকৃপায় যেমন-তেমন একটা সদুপায় হইবেই। জামা কিনিতে গোলাম, পাইলাম একপাটি মোজা; এখন ভাবিতেছি, ঐটেকেই কাটিয়া ছাঁটিয়া কোনোমতে জামা করিয়া পরিব। ভাগ্য আমাদের সেই চেষ্টা দেখিয়া অউ হাস্য করিতেছে।

বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীটাই যে আমাদের ব্যর্থতার কারণ, অভ্যাসগত অন্ধ মমতার মোহে সেটা আমরা কিছুতেই মনে ভাবিতে পারি না। ঘুরিয়া ফিরিয়া নূতন বিশ্ববিদ্যালয় গড়িবার বেলাতেও প্রণালী বদল করিবার কথা মনেই আসে না; তাই, নূতনের ঢালাই করিতেছি সেই পুরাতনের ছাঁচে। নূতনের জন্য ইচ্ছা খুবই হইতেছে অথচ ভরসা কিছুই হইতেছে না। কেননা ঐটেই যে রোগ, এতদিনের শিক্ষা-বোঝার চাপে সেই ভরসাটাই যে সমূলে মরিয়াছে।

অনেককাল এমনি করিয়া কাটিল, আর সময় নষ্ট করা চলিবে না। এখন মনুষ্যত্বের দিকে তাকাইয়া লক্ষ্যেরও পরিবর্তন করিতে হইবে। সাহস করিয়া বলিতে হইবে, যে শিক্ষা বাহিরের উপকরণ তাহা বোঝাই করিয়া আমরা বাঁচিব না, যে শিক্ষা অন্তরের অমৃত তাহার সাহায্যেই আমরা মৃত্যুর হাত এড়াইব।

শিক্ষাকে কেমন করিয়া সত্য এবং প্রাণের জিনিস করা যায়, সেই কথার আলোচনা যথাসাধ্য ক্রমে ক্রমে করা যাইবে।

বিদ্যার যাচাই

আমার মনে আছে, বালককালে একজনকে জানিতাম তিনি ইংরেজিতে পরম পণ্ডিত ছিলেন, বাংলাদেশে তিনি ইংরেজি শিক্ষার প্রথম যুগের শেষভাগের ছাত্র। ডিরোজিও প্রভৃতি শিক্ষকদের কাছে তিনি পাঠ লইয়াছিলেন। তিনি জানি না কী মনে করিয়া কিছুদিন আমাদিগকে ইংরেজি সাহিত্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতে ইচ্ছা করিলেন। ইংরেজি কবিদের সম্বন্ধে তিনি মনে একটা শ্রেণীবিভাগ-করা ফর্দ লট্কাইয়া রাখিয়াছিলেন। তার মধ্যে পয়লা দোসরা এবং তেসরা নম্বর পর্যন্ত সমস্ত পাকাপাকি ঠিক করা ছিল। সেই ফর্দ তিনি আমাদিগকে লিখিয়া দিয়া মুখস্থ করিতে বলিলেন। তখন আমাদের যেটুকু ইংরেজি জানা ছিল তাহাতে পয়লা নম্বর দূরে থাক্ তেসরা নম্বরেরও কাছ ঘেঁষিতে পারি এমন শক্তি আমাদের ছিল না। তথাপি ইংরেজি কবিদের সম্বন্ধে বাঁধা বিচারটা আগে হইতেই আমাদের আয়ত্ত করিয়া দেওয়াতে দোষ ছিল না। কেননা,

রুচিরসনা দিয়া রসবিচার ইংরেজি কাব্য সম্বন্ধে আমাদের পক্ষে প্রশস্ত নহে। যেহেতু আমাদের কাছে চাখিয়া নহে কিন্তু গিলিয়া খাইতে হইবে, কাজেই কোন্টা মিষ্ট কোন্টা অম্ল সেটা নোটবুকে লেখা না থাকিলে ভুল করার আশঙ্কা আছে। ইহার ফল কী হইয়াছে বলি। আমাদের শিশু বয়সে দেখিতাম, কবি বায়্রন সম্বন্ধে আমাদের দেশের ইংরেজি-পোড়োদের মনে অসীম ভক্তি ছিল। আধুনিক পোড়োদের মনে সে ভক্তি আদবেই নাই। অল্প কিছু দিন আগেই আমাদের যুবকেরা টেনিসনের নাম শুনিলেই যেরূপ রোমাঞ্চিত হইতেন এখন আর সেরূপ হন না। উক্ত কবিদের সম্বন্ধে ইংলণ্ডে কাব্যবিচারকদের রায় অল্পবিস্তর বদল হইয়া গিয়াছে, ইহা জানা কথা। সেই বদল হইবার স্বাভাবিক কারণ সেখানকার মনের গতি ও সামাজিক গতির মধ্যেই আছে। কিন্তু, সে কারণ তো আমাদের মধ্যে নাই। অথচ তাহার ফলটা ঠিক ঠিক মিলিতেছে। আদালতটাই আমাদের এখানে নাই, কাজেই বিদেশের বিচারের নকল আনাইয়া আমাদের কাছে বড়ো সাবধানে কাজ চালাইতে হয়। যে কবির যে দর আধুনিক বাজারে প্রচলিত পাছে তাহার উল্টা বলিলেই আহাম্মক বলিয়া দাগা পড়ে, এইজন্য বিদেশের সাহিত্যের বাজার-দরটা সর্বদা মনে রাখিতে হয়। নহিলে আমাদের ইস্কুল-মাস্টারি চলে না, নহিলে মাসিকপত্রে ইব্‌সেন মেটর্লিঙ্ক ও রাশিয়ান ঔপন্যাসিকদের কথা পাড়িবার বেলা লজ্জা পাইতে হয়। শুধু সাহিত্য নহে, অর্থনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধেও বিদেশের পরিবর্তনশীল বিচারবুদ্ধির সঙ্গে অবিকল তাল মিলাইয়া যদি না চলি, যদি জন স্টুয়ার্ট মিলের মন্ত্র কার্লাইল-রাঙ্কিনের আমলে আওড়াই, বিলাতে যে সময়ে ব্যক্তিস্বতন্ত্র্যবাদের হাওয়া বদল হইয়াছে সেই সময় বুঝিয়া আমরাও যদি সংঘবাদের সুরে কণ্ঠ না মিলাই, তবে আমাদের দেশের হাই ইংরেজি স্কুলের মাস্টার ও ছাত্রদের কাছে মুখ দেখাইবার জো থাকিবে না।

ইংরেজি ইস্কুলে এত দীর্ঘ কাল দাগা বুলাইয়াও কেন আমরা কোনো বিষয় জোরের সঙ্গে মৌলিন্য প্রকাশ করিতে পারিলাম না, এই প্রশ্ন আমাদের মনে উঠিয়াছে। ইহার কারণ, বিদ্যাটাও যেখান হইতে ধার করিয়া লইতেছি বুদ্ধিটাও সেখান হইতে ধার-করা। কাজেই নিজের বিচার খাটাইয়া এ বিদ্যা তেজের সঙ্গে ব্যবহার করিতে ভরসা পাই না। বিদ্যা এবং বুদ্ধির ক্ষেত্রে ইংরেজের ছেলে পরবশ নহে, তাহার চারি দিকেই স্বাধীন সৃষ্টি ও স্বাধীন বিচারের হাওয়া বহিতেছে। একজন ফরাসি বিদ্বান নির্ভয়ে ইংরেজি বিদ্যার বিচার করিতে পারে; তার কারণ যে

ফরাসি বিদ্যা তাহার নিজের সেই বিদ্যার মধ্যেই বিচারের শক্তি ও বিধি রহিয়াছে। এইজন্য মাল যেখান হইতেই আসে যাচাই করিবার ভার তাহার নিজেরই হাতে, এইজন্য নিজের হিসাব মতো সে মূল্য দেয় এবং কোন্টা লইবে কোন্টা ছাড়িবে সে সম্বন্ধে নিজের রুচি ও মতই তাহার পক্ষে প্রামাণ্য। কাজেই জ্ঞানের ও ভাবের কারবারে নিজের ‘পরেই ইহাদের ভরসা। এই ভরসা না থাকিলে মৌলিন্য কিছুতেই থাকিতে পারে না।

আমাদের মুশকিল এই যে, আগাগোড়া সমস্ত বিদ্যাটাই আমরা পরের কাছ হইতে পাই। সে বিদ্যা মিলাইব কিসের সঙ্গে, বিচার করিব কী দিয়া? নিজের যে বাটখারা দিয়া পরিমাপ করিতে হয় সেই বাটখারাই নাই। কাজেই আমদানি মালের উপরে ওজনের ও দামের যে টিকিট মারা থাকে সেই টিকিটটাকেই ষোলো আনা মানিয়া লইতে হয়। এইজন্যই ইন্সকুলমাস্টার এবং মাসিকপত্র-লেখকদের মধ্যে এই টিকিটে লিখিত মালের পরিচয় ও অঙ্ক যে যতটা ঠিকমতো মুখস্থ রাখিতে ও আওড়াইতে পারে তাহার ততই পসার বাড়ে। এতকাল ধরিয়া কেবল এমনি করিয়াই কাটিল, কিন্তু চিরকাল ধরিয়াই কি এমনি করিয়া কাটিবে?

বিদ্যাসমবায়

এলাহাবাদ ইংরেজি-বাংলা স্কুলের কোনো ছাত্রকে একদা এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে ‘রিভার’ শব্দের সংজ্ঞা কী। মেধাবী বালক তার নির্ভুল উত্তর দিয়াছিল। তাহার পরে যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল কোনো দিন সে কোনো রিভার দেখিয়াছে কি না, তখন গঙ্গাযমুনার তীরে বসিয়া এই বালক বলিল যে, ‘না, আমি দেখি নাই।’ অর্থাৎ এই বালকের ধারণা হইয়াছিল, যাহা চেষ্টা করিয়া, কষ্ট করিয়া, বানান করিয়া, অভিধান ধরিয়া, পরের ভাষায় শেখা যায় তাহা আপন জিনিস নয়; তাহা বহুদূরবর্তী, অথবা তাহা কেবল পুঁথিলোক-ভুক্ত। এই ছেলে তাই নিজের জানা দেশটাকে মনে মনে জিয়োগ্রাফি বিদ্যা হইতে বাদ দিয়াছিল। অবশ্য, পরে এক সময়ে এ শিখিয়াছিল যে, যে দেশে তাহার জন্ম ও বাস সেও ভূগোলবিদ্যার সামগ্রী, সেও একটা দেশ, সেখানকার রিভারও রিভার। কিন্তু মনে করা যাক, তার বিদ্যাচর্চার শেষ পর্যন্ত এই খবরটি সে পায় নাই-শেষ পর্যন্তই সে জানিয়াছে যে আর-সকল জাতিরই দেশ আছে, কেবল তারই দেশ নাই-তবে কেবল যে তার পক্ষে সমস্ত পৃথিবীর জিয়োগ্রাফি অস্পষ্ট ও অসমাপ্ত থাকিয়া যাইবে তাহা নহে, তাহার মনটা অন্তরে অন্তরে গৃহহীন গৌরবহীন হইয়া রহিবে। অবশেষে বহুকাল পরে যখন কোনো বিদেশী জিয়োগ্রাফি-পণ্ডিত আসিয়া কথাচ্ছলে

তাহাকে বলে যে ‘তোমাদের একটা প্রকাণ্ড বড়ো দেশ আছে, তার হিমালয় প্রকাণ্ড বড়ো পাহাড় তার সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র প্রকাণ্ড বড়ো নদী’, তখন হঠাৎ এই-সমস্ত খবরটায় তাহার মাথা ঘুরিয়া যায়; নূতন জ্ঞানটাকে সে সংযতভাবে বহন করিতে পারে না; অনেককালের অগৌরবটাকে একদিনে শোধ দিবার জন্য সে চীৎকারশব্দে চার দিকে বলিয়া বেড়ায়, ‘আর-সকলের দেশ দেশমাত্র, আমাদের দেশ স্বর্গ।’ একদিন যখন সে মাথা হেঁট করিয়া আওড়াইয়াছে যে ‘পৃথিবীতে আর-সকলেরই দেশ আছে, কেবল আমাদেরই নাই’ তখনো বিশ্বসত্যের সঙ্গে তার অজ্ঞানকৃত বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল; আর আজ যখন সে মাথা তুলিয়া অসংগত তারস্বরে হাঁকিয়া বেড়ায় যে ‘আর-সকলের দেশ আছে, আর আমাদের আছে স্বর্গ’ তখনো বিশ্বসত্যের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ। পূর্বের বিচ্ছেদ ছিল অজ্ঞানের, সুতরাং তাহা মার্জনীয়; এখনকার বিচ্ছেদ শিক্ষিত মূঢ়তার, সুতরাং তাহা হাস্যকর এবং ততোধিক অনিষ্টকর।

সাধারণত, ভারতীয় বিদ্যা সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা সেও এই শ্রেণীর। শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে আমাদের নিজ দেশের বিদ্যার স্থান নাই, অথবা তার স্থান সব-পিছনে; সেইজন্য আমাদের সমস্ত শিক্ষার মধ্যে এই কথাটি প্রচ্ছন্ন থাকে যে, আমাদের নিজ দেশের বিদ্যা বলিয়া পদার্থই নাই, যদি থাকে সেটা অপদার্থ বলিলেই হয়। এমন সময় হঠাৎ বিদেশী পণ্ডিতের মুখে আমাদের বিদ্যার সম্বন্ধে একটু যদি বাহবা শুনিতে পাই অমনি উন্মত্ত হইয়া বলিতে থাকি, পৃথিবীতে আর-সকলের বিদ্যা মানবী, আমাদের বিদ্যা দৈবী। অর্থাৎ, আর-সকল দেশের বিদ্যা মানবের স্বাভাবিক বুদ্ধিবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ ভ্রম কাটাইয়া বাড়িয়া উঠিতেছে, কেবল আমাদের দেশেই বিদ্যা ব্রহ্মা বা শিবের প্রসাদে এক মুহূর্তে ঋষিদের ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া ভ্রমলেশবিবর্জিত হইয়া অনন্ত কালের উপযোগী আকারে বাহির হইয়া আসিয়াছে। ইংরেজিতে যাকে বলে স্পেশাল ক্রিয়েশন্ ইহা তাই, ইহাতে ক্রমবিকাশের প্রাকৃতিক নিয়ম খাটে না, ইহা ইতিহাসের ধারাবাহিক পথের অতীত, সুতরাং ইহাকে ঐতিহাসিক বিচারের অধীন করা চলে না; ইহাকে কেবলমাত্র বিশ্বাসের দ্বারা বহন করিতে হইবে, বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণ করিতে হইবে না। অহংকারের আঁধি লাগিয়া এ কথা আমরা একেবারে ভুলিয়া যাই যে, কোনো-একটি বিশেষ জাতির জন্যই বিধাতা সর্বাপেক্ষা অনুকূল ব্যবস্থা স্বহস্তে করিয়া দিয়াছেন, এ-সব কথা বর্বরকালের কথা। স্পেশাল ক্রিয়েশনের কথা আজিকার দিনে আর ঠাঁই পায় না। আজ আমরা এই বুঝি যে, সত্যের সহিত সত্যের সম্বন্ধ, সকল বিদ্যার উদ্ভব যে নিয়মে বিশেষ বিদ্যার উদ্ভব সেই নিয়মেই। পৃথিবীতে

কেবলমাত্র কয়েদীই অপর সাধারণের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া সলিটারি সেলে থাকে। সত্যের অধিকার সম্বন্ধে বিধাতা কেবলমাত্র ভারবর্ষকেই সেই সলিটারি সেলে অন্তরায়িত করিয়া রাখিয়াছেন, এ কথা ভারতের গৌরবের কথা নয়।

দীর্ঘকাল আমাদের বিদ্যাকে আমরা একঘরে করিয়া রাখিয়াছিলম। দুই রকম করিয়া একঘরে করা যায়—এক অবজ্ঞার দ্বারা, আর-এক অতিসম্মানের দ্বারা। দুইয়েরই ফল এক। দুইয়েতেই তেজ নষ্ট করে। এক কালে জাপানের মিকাডো তাঁর দুর্ভেদ্য রাজকীয় সম্মানের বেড়ার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিতেন, প্রজাদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ছিল না বলিলেই হয়। তার ফলে, শোগুন ছিল সত্যকার রাজা আর মিকাডো ছিলেন নামমাত্র রাজা। যখন মিকাডোকে যথার্থই আধিপত্য দিবার সংকল্প হইল তখন তাঁর অতিসম্মানের দুর্লভ্য প্রাচীর ভাঙিয়া তাঁহাকে সর্বসাধারণের গোচর করিয়া দেওয়া হইল। আমাদের ভারতীয় বিদ্যার প্রাচীরও তেমনি দুর্লভ্য ছিল। নিজেকে তাহা সকল দেশের বিদ্যা হইতে একান্ত স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছিল, পাছে বিপুল বিশ্বসাধারণের সম্পর্কে তার মধ্যে বিকার আসে। তার ফলে আমাদের দেশে সে হইল বিদ্যারাজ্যের মিকাডো, আর যে বিদেশী বিদ্যা বিশ্ববিদ্যার সঙ্গে অবিরত যোগ রক্ষা করিয়া নিয়তই আপন প্রাণশক্তিতে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতেছে সেই শোগুন হইয়া আমাদের প্রবল প্রতাপে শাসন করিতেছে। আমরা অন্যটিকে উদ্দেশে নমস্কার করিয়া ইহাকেই প্রত্যক্ষ সেলাম করিলাম, ইহাকেই খাজনা দিলাম এবং ইহারই কানমলা খাইলাম। ঘরে আসিয়া ইহাকে ম্লেচ্ছ বলিয়া গাল দিলাম; ইহার শাসনে আমাদের মতিগতি বিকৃত হইতেছে বলিয়া আক্ষেপ করিলাম; এ দিকে স্ত্রীর গহনা বেচিয়া, নিজের বাস্তববাড়ি বন্ধক রাখিয়া, ইহার খাজনার শেষ কড়িটি শোধ করিবার জন্য ছেলেটাকে নিত্য ইহার কাছারিতে হাঁটাহাঁটি করাইতে লাগিলাম।

শিশু যে সেই ধাত্রীর কোলে থাকে। সাধারণের ভিড় হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়াই মানুষ করিতে হয়। তাহার ঘরটি নিভৃত, তাহার দোলাটি নিরাপদ। কিন্তু, তাহাকে যদি চিরদিনই ঢাকাটুকি দিয়া ঘরের কোণে অঞ্চলের আড়াল করিয়া রাখি তাহা হইলে উল্টা ফল হয়। অর্থাৎ, যে শিশু একদা অত্যন্ত স্বতন্ত্র ও সুরক্ষিত ছিল বলিয়াই পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল সেই শিশুই বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাহার নিভৃত বেষ্টনের মধ্যে অকর্মণ্য, কাণ্ডজ্ঞানবিবর্জিত হইয়া উঠে। গুঁটির মধ্যে যে বীজ লালিত হইয়াছে খেতের মধ্যে সেই বীজের বর্ধিত হওয়া চাই।

একদিন চৈন পারসিক মৈশর গ্রীক রোমীয় প্রভৃতি প্রত্যেক বড়ো জাতিই ভারতীয়ের মতোই ন্যূনাধিক পরিমাণে নিজের সুরক্ষিত স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে নিজ সভ্যতাকে বড়ো করিয়া তুলিয়াছিল। পৃথিবীর এখন বয়স হইয়াছে; জাতিগত বিদ্যাস্বাতন্ত্র্যকে একান্তভাবে লালন করিবার দিন আজ আর নাই। আজ বিদ্যাসমবায়ের যুগ আসিয়াছে। সেই, সমবায়ে যে বিদ্যা যোগ দিবে না, যে বিদ্যা কৌলীন্যের অভিমানে অনুঢ়া হইয়া থাকিবে সে নিষ্ফল হইয়া মরিবে।

অতএব, আমাদের দেশে বিদ্যাসমবায়ের একটি বড়ো ক্ষেত্র চাই, যেখানে বিদ্যার আদান প্রদান ও তুলনা হইবে, সেখানে ভারতীয় বিদ্যাকে মানবের সকল বিদ্যার ক্রমবিকাশের মধ্যে রাখিয়া বিচার করিতে হইবে।

তাহা করিতে গেলে ভারতীয় বিদ্যাকে তাহার সমস্ত শাখা-উপশাখার যোগে সমগ্র করিয়া জানা চাই। ভারতীয় বিদ্যার সমগ্রতার জ্ঞানটিকে মনের মধ্যে পাইলে তাহার সঙ্গে বিশ্বের সমস্ত বিদ্যার সম্বন্ধনির্ণয় স্বাভাবিক প্রণালীতে হইতে পারে। কাছের জিনিসের বোধ দূরের জিনিসের বোধের সহজ ভিত্তি।

বিদ্যার নদী আমাদের দেশে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, প্রধানত এই চারি শাখায় প্রবাহিত। ভারতচিন্তাগঙ্গোদ্রীতে ইহার উদ্ভব। কিন্তু যে দেশে নদী চলিতেছে কেবল সেই দেশের জলেই সেই নদী পুষ্ট না হইতেও পারে। ভারতের গঙ্গার সঙ্গে তিব্বতের ব্রহ্মপুত্র মিলিয়াছে। ভারতের বিদ্যার স্রোতেও সেইরূপ মিলন ঘটিয়াছে। বাহির হইতে মুসলমান যে জ্ঞান ও ভাবের ধারা এখানে বহন করিয়া আনিয়াছে সেই ধারা ভারতের চিন্তাকে স্তরে স্তরে অভিষিক্ত করিয়াছে, তাহা আমাদের ভাষায় আচারে শিল্পে সাহিত্যে সংগীতে নানা আকারে প্রকাশমান। অবশেষে সম্প্রতি যুরোপীয় বিদ্যার বন্যা সকল বাঁধ ভাঙিয়া দেশকে প্লাবিত করিয়াছে; তাহাকে হাসিয়া উড়াইতেও পারি না, কাঁদিয়া ঠেকানোও সম্ভবপর নহে।

অতএব, আমাদের বিদ্যায়তনের বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান ও পার্সি বিদ্যার সমবেত চর্চায় আনুষঙ্গিকভাবে যুরোপীয় বিদ্যাকে স্থান দিতে হইবে।

সমস্ত পৃথিবীকে বাদ দিয়া যাহারা ভারতকে একান্ত করিয়া দেখে তাহারা ভারতকে সত্য করিয়া দেখে না।

তেমনি যাহারা ভারতের কেবল এক অংশকেই ভারতের সমগ্রতা হইতে খণ্ডিত করিয়া দেখে তাহারাও ভারতচিন্তাকে নিজের চিন্তার মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারে না। এই কারণ-

বশতই পোলিটিক্যাল ঐক্যের অপেক্ষা গভীরতর উচ্চতর মহত্তর যে ঐক্য আছে তার কথা আমরা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে পারি না। পৃথিবীর সকল ঐক্যের যাহা শাস্বত ভিত্তি তাহাই সত্য ঐক্য। সে ঐক্য চিত্তের ঐক্য, আত্মার ঐক্য। ভারতে সেই চিত্তের ঐক্যকে পোলিটিক্যাল ঐক্যের চেয়ে বড়ো বলিয়া জানিতে হইবে; কারণ, এই ঐক্যে সমস্ত পৃথিবীকে ভারতবর্ষ আপন অঙ্গনে আহ্বান করিতে পারে। অথচ, দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের বর্তমান শিক্ষা এমন যে, সেই শিক্ষার গুণেই ভারতীয় চিত্তকে আমরা তাহার স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেছি না। ভারতের হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মুসলমান শিখ পার্শ্বি খৃষ্টানকে এক বিরাট চিত্তক্ষেত্রে সত্যসাধনার যজ্ঞে সমবেত করাই ভারতীয় বিদ্যায়তনের প্রধান কাজ-ছাত্রদিগকে কেবল ইংরেজি মুখস্থ করানো, অঙ্ক কষানো, সায়ান্স শেখানো নহে। লইবার জন্য অঞ্জলিকে বাঁধিতে হয়, দিবার জন্যও; দশ আঙুল ফাঁক করিয়া দেওয়াও যায় না, লওয়াও যায় না। ভারতের চিত্তকে একত্র সন্নিবিষ্ট করিলে তবে আমরা সত্যভাবে লইতেও পারিব, দিতেও পারিব।

শিক্ষার মিলন

এ কথা মানতেই হবে যে, আজকের দিনে পৃথিবীতে পশ্চিমের লোক জয়ী হয়েছে। পৃথিবীকে তারা কামধেনুর মতো দোহন করছে, তাদের পাত্র ছাপিয়ে গেল। আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছি, দিন দিন দেখছি আমাদের ভোগে অন্নের ভাগ কম পড়ে যাচ্ছে। ক্ষুধার তাপ বাড়তে থাকলে ক্রোধের তাপও বেড়ে ওঠে; মনে মনে ভাবি, যে মানুষটা খাচ্ছে ওটাকে একবার সুযোগমত পেলে হয়। কিন্তু ওটাকে পাব কি, ঐ-ই আমাদের পেয়ে বসেছে; সুযোগ এ পর্যন্ত ওরই হাতে আছে, আমাদের হাতে এসে পৌঁছয় নি।

কিন্তু কেন এসে পৌঁছয় নি? বিশ্বকে ভোগ করবার অধিকার ওরা কেন পেয়েছে? নিশ্চয়ই সে কোনো-একটা সত্যের জোরে। আমরা কোনো উপায়ে দল বেঁধে বাইরে থেকে ওদের খোরাক বন্ধ করে নিজের খোরাক বরাদ্দ করব, কথাটা এতই সোজা নয়। ড্রাইভারটার মাথায় বাড়ি দিলেই যে এঞ্জিনটা তখনই আমার বশে চলবে, এ কথা মনে করা ভুল। বস্তুত, ড্রাইভারের মূর্তি ধরে ওখানে একটা বিদ্যা এঞ্জিন চালাচ্ছে। অতএব শুধু আমার রাগের আগুনে এঞ্জিন চলবে না, বিদ্যাটা দখল করা চাই-তা হলেই সত্যের বর পাব।

মনে করো এক বাপের দুই ছেলে। বাপ স্বয়ং মোটর হাঁকিয়ে চলেন। তাঁর ভাবখানা এই, ছেলেদের মধ্যে মোটর চালাতে যে শিখবে মোটর তারই হবে। ওর মধ্যে একটি চালাক ছেলে আছে, তার কৌতূহলের অন্ত নেই। সে তন্ন তন্ন করে দেখে গাড়ি চলে কী করে। অন্য ছেলেটি ভালোমানুষ, সে ভক্তিভরে বাপের পায়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে; তাঁর দুই হাত মোটরের হাল্ যে কোন্ দিকে কেমন করে ঘোরাচ্ছে তার দিকেও খেয়াল নেই। চালাক ছেলেটি মোটরের কলকারখানা পুরোপুরি শিখে নিলে এবং একদিন গাড়িখানা নিজের হাতে বাগিয়ে নিয়ে উর্ধ্বস্বরে বাঁশি বাজিয়ে দৌড় মারলে। গাড়ি চালাবার শখ দিন রাত এমনি তাকে পেয়ে বসল যে, বাপ আছেন কি নেই সে হুঁশই তার রইল না। তাই বলেই তার বাপ যে তাকে তলব করে গালে চড় মেরে তার গাড়িটা কেড়ে নিলেন তা নয়; তিনি স্বয়ং যে রথের রথী তাঁর ছেলেও যে সেই রথেরই রথী, এতে তিনি প্রসন্ন হলেন। ভালোমানুষ ছেলে দেখলে, ভায়াটি তার পাকা ফসলের খেত লগুভগু করে তার মধ্যে দিয়ে দিনে দুপুরে হাওয়া গাড়ি চালিয়ে বেড়াচ্ছে; তাকে রোখে কার সাধ্য, তার সামনে দাঁড়িয়ে বাপের দোহাই পাড়লে মরণং ধুবং-তখনো সে বাপের পায়ের দিকে তাকিয়ে রইল আর বললে, ‘আমার আর কিছুতে দরকার নেই।’

কিন্তু দরকার নেই বলে কোনো সত্যকার দরকারকে যে মানুষ খাটো করেছে তাকে দুঃখ পেতেই হবে। প্রত্যেক দরকারেরই একটা মর্যাদা আছে, সেইটুকুর মধ্যে তাকে মানলে তবেই ছাড়পত্র পাওয়া যায়। দরকারকে অবজ্ঞা করলে তার কাছে চিরঋণী হয়ে সুদ দিতে দিতে জীবন কেটে যায়। তাকে ঠিক পরিমাণে মেনে তবে আমরা মুক্তি পাই। পরীক্ষকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার সব চেয়ে প্রশস্ত রাস্তা হচ্ছে পরীক্ষায় পাস করা।

বিশ্বের একটা বাইরের দিক আছে, সেই দিকে সে মস্ত একটা কল। সে দিকে তার বাঁধা নিয়মের এক চুল এদিক-ওদিক হবার জো নেই। এই বিরাট বস্তুবিশ্ব আমাদের নানা রকম বাধা দেয়; কুঁড়েমি করে বা মূর্থতা করে যে তাকে এড়াতে গেছে বাধাকে সে ফাঁকি দিতে পারে নি, নিজেকেই ফাঁকি দিয়েছে। অপর পক্ষে বস্তুর নিয়ম যে শিখেছে শুধু যে বস্তুর বাধা তার কেটেছে তা নয়, বস্তু স্বয়ং তার সহায় হয়েছে-বস্তুবিশ্বের দুর্গম পথে ছুটে চলবার বিদ্যা তার হাতে, সকল জায়গায় সকলের আগে গিয়ে সে পৌঁছতে পারে বলে বিশ্বভোজের প্রথম ভাগটা পড়ে

তারই পাতে; আর, পথ হাঁটতে হাঁটতে যাদের বেলা বয়ে যায় তারা গিয়ে দেখে যে, তাদের ভাগ্যে হয় অতি সামান্যই বাকি, নয় সমস্তই ফাঁকি।

এমন অবস্থায়, পশ্চিমের লোকে যে বিদ্যার জোরে বিশ্ব জয় করেছে সেই বিদ্যাকে গাল পাড়তে থাকলে দুঃখ কমবে না, কেবল অপরাধ বাড়বে। কেননা, বিদ্যা যে সত্য। কিন্তু এ কথা যদি বল' শুধু তো বিদ্যা নয় বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে শয়তানিও আছে তা হলে বলতে হবে, ঐ শয়তানির যোগেই ওদের মরণ। কেননা, শয়তানি সত্য নয়।

জন্তুরা আহাৰ পায় বাঁচে, আঘাত পায় মরে, যেটাকে পায় সেটাকেই বিনা তর্কে মেনে নেয়। কিন্তু মানুষের সব চেয়ে বড়ো স্বভাব হচ্ছে মেনে না নেওয়া। জন্তুরা বিদ্রোহী নয়, মানুষ বিদ্রোহী। বাইরে থেকে যা ঘটে, যাতে তার নিজের কোনো হাত নেই, কোনো সায নেই, সেই ঘটনাকে মানুষ একেবারে চূড়ান্ত বলে স্বীকার করে নি বলেই জীবের ইতিহাসে সে আজ এত বড়ো গৌরবের পদ দখল করে বসেছে। আসল কথা, মানুষ একেবারেই ভালোমানুষ নয়। ইতিহাসের আদিকাল থেকে মানুষ বলেছে, বিশ্বঘটনার উপরে সে কর্তৃত্ব করবে। কেমন করে করবে? না, ঘটনার পিছনে যে প্রেরণা আছে, যার থেকে ঘটনাগুলো বেরিয়ে এসেছে, তারই সঙ্গে কোনোমতে যদি রফা করতে বা তাকে বাধ্য করতে পারে তা হলেই সে আর ঘটনার দলে থাকবে না, ঘটনিতার দলে গিয়ে ভর্তি হবে। সাধনা আরম্ভ করলে মন্ত্রতন্ত্র নিয়ে। গোড়ায় তার বিশ্বাস ছিল, জগতে যা-কিছু ঘটছে এ-সমস্তই একটা অদ্ভুত জাদুশক্তির জোরে, অতএব তারও যদি জাদুশক্তি থাকে তবেই শক্তির সঙ্গে অনুরূপ শক্তির যোগে সে কর্তৃত্ব লাভ করতে পারে।

সেই জাদুমন্ত্রের সাধনায় মানুষ যে চেষ্টা শুরু করেছিল আজ বিজ্ঞানের সাধনায় তার সেই চেষ্টার পরিণতি। এই চেষ্টার মূল কথাটা হচ্ছে: মান্ব না, মানাব। অতএব, যারা এই চেষ্টায় সিদ্ধি লাভ করেছে তারাই বাহিরের বিশ্বে প্রভু হয়েছে, দাস নেই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নিয়মের কোথাও একটুও ত্রুটি থাকতে পারে না, এই বিশ্বাসটাই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের জোরেই জিত হয়। পশ্চিমের লোকে এই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসে ভর করে নিয়মকে চেপে ধরেছে, আর তারা বাইরের জগতের সকল সংকট তরে যাচ্ছে। এখনো যারা বিশ্বব্যাপারে জাদুকে আত্মীকার করতে ভয় পায় এবং দায়ে ঠেকলে জাদুর শরণাপন্ন হবার জন্যে যাদের মন ঝোঁকে, বাইরের বিশ্বে তারা সকল দিকেই মার খেয়ে মরছে, তারা আর কর্তৃত্ব পেল না।

পূর্বদেশে আমরা যে সময়ে রোগ হলে ভূতের ওঝাকে ডাকছি, দৈন্য হলে গ্রহশান্তির জন্যে দৈবজ্ঞের দ্বারে দৌড়াচ্ছি, বসন্তমারীকে ঠেকিয়ে রাখবার ভার দিচ্ছি শীতলাদেবীর ‘পরে, আর

শত্রুকে মারবার জন্যে মারণ উচাটন মন্ত্র আওড়াতে বসেছি, ঠিক সেই সময়ে পশ্চিম মহাদেশে ভল্টেয়ারকে একজন মেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘শুনেছি নাকি মন্ত্রগুণে পালকে পাল ভেড়া মেয়ে ফেলা যায়, সে কি সত্য?’ ভল্টেয়ার জবাব দিয়েছিলেন, ‘নিশ্চয়ই মেয়ে ফেলা যায়, কিন্তু তার সঙ্গে যথোচিত পরিমাণে সৈঁকো বিষ থাকা চাই।’ যুরোপের কোনো কোণে-কানাচে জাদুমন্ত্রের ‘পরে বিশ্বাস কিছুমাত্র নেই এমন কথা বলা যায় না, কিন্তু এ সম্বন্ধে সৈঁকো বিষটার প্রতি বিশ্বাস সেখানে প্রায় সর্ববাদিসম্মত। এইজন্যেই ওরা ইচ্ছা করলেই মারতে পারে, আর আমরা ইচ্ছে না করলেও মরতে পারি।

আজ এ কথা বলা বাহুল্য যে, বিশ্বশক্তি হচ্ছে ত্রুটিবিহীন বিশ্বনিয়মেরই রূপ; আমাদের নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধি এই নিয়ন্ত্রিত শক্তিকে উপলব্ধি করে। বুদ্ধির নিয়মের সঙ্গে এই বিশ্বের নিয়মের সামঞ্জস্য আছে; এইজন্যে, এই নিয়মের ‘পরে অধিকার আমাদের প্রত্যেকের নিজের মধ্যেই নিহিত এই কথা জেনে তবেই আমরা আত্মশক্তির উপর নিঃশেষে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পেরেছি। বিশ্বব্যাপারে যে মানুষ আকস্মিকতাকে মানে সে নিজেকে মানতে সাহস করে না, সে যখন-তখন যাকে-তাকে মেনে বসে; শরণাগত হবার জন্যে সে একেবারে ব্যাকুল। মানুষ যখন ভাবে বিশ্বব্যাপারে তার নিজের বুদ্ধি খাটে না তখন সে আর সন্ধান করতে চায় না, প্রশ্ন করতে চায় না; তখন সে বাইরের দিকে কর্তাকে খুঁজে বেড়ায়। এইজন্যে বাইরের দিকে সকলেরই কাছে সে ঠকছে, পুলিশের দারোগা থেকে ম্যালেরিয়ার মশা পর্যন্ত। বুদ্ধির ভীৰুতাই হচ্ছে শক্তিহীনতার প্রধান আড্ডা।

পশ্চিমদেশে পোলিটিকাল স্বাতন্ত্র্যের যথার্থ বিকাশ হতে আরম্ভ হয়েছে কখন থেকে? অর্থাৎ কখন থেকে দেশের সকল লোক এই কথা বুঝেছে যে, রাষ্ট্রনিয়ম ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের খেয়ালের জিনিস নয়, সেই নিয়মের সঙ্গে তাদের প্রত্যেকের সম্মতির সম্বন্ধ আছে? যখন থেকে বিজ্ঞানের আলোচনায় তাদের মনকে ভয়মুক্ত করেছে। যখন থেকে তারা জেনেছে, সেই নিয়মই সত্য যে নিয়ম ব্যক্তিবিশেষের কল্পনার দ্বারা বিকৃত হয় না, খেয়ালের দ্বারা বিচলিত হয় না। বিপুলকায় রাশিয়া সুদীর্ঘকাল রাজার গোলামি করে এসেছে, তার দুঃখের আর অন্ত ছিল না। তার প্রধান কারণ, সেখানার আধিকাংশ প্রজাই সকল বিষয়েই দৈবকে মেনেছে, নিজের বুদ্ধিকে মানে নি। আজ যদি বা তার রাজা গেল, কাঁধের উপরে তখনি আর-এক উৎপাত চড়ে বসে তাকে রক্তসমুদ্র সাঁতারিয়ে নিয়ে দুর্ভিক্ষের মরুডাঙায় আধমরা করে

পৌঁছিয়ে দিলে। এর কারণ স্বরাজের প্রতিষ্ঠা বাইরে নয়, যে আত্মবুদ্ধির প্রতি আস্থা আত্মশক্তির প্রধান অবলম্বন সেই আস্থার উপরে।

আমি একদিন একটি গ্রামের উন্নতি করতে গিয়েছিলুম। গ্রামের লোকেদের জিজ্ঞাসা করলুম, ‘সেদিন তোদের পাড়ায় আগুন লাগল, একখানা চালাও বাঁচাতে পরলি নে কেন?’ তারা বললে, ‘কপাল!’ আমি বললেম, ‘কপাল নয় রে, কুয়োর অভাব। পাড়ায় একখানা কুয়ো দিস নে কেন?’ তারা তখনি বললে, ‘আজ্ঞে কর্তার ইচ্ছে হলেই হয়।’ যাদের ঘরে আগুন লাগাবার বেলায় থাকে দৈব তাদেরই জল দান করবার ভার কোনো-একটি কর্তার। সুতরাং, যে করে হোক এরা একটা কর্তা পেলে বেঁচে যায়। তাই এদের কপালে আর-সকল অভাবই থাকে, কিন্তু কোনো কালেই কর্তার অভাব হয় না।

বিশ্বরাজ্যে দেবতা আমাদের স্বরাজ দিয়ে বসে আছেন। অর্থাৎ, বিশ্বের নিয়মকে তিনি সাধারণের নিয়ম করে দিয়েছেন। এই নিয়মকে নিজের হাতে গ্রহণ করার দ্বারা আমরা প্রত্যেকে যে কর্তৃত্ব পেতে পারি তার থেকে কেবলমাত্র আমাদের মোহ আমাদের বঞ্চিত করতে পারে, আর-কেউ না, আর-কিছুতে না। এইজন্যেই আমাদের উপনিষৎ এই দেবতা সম্বন্ধে বলছেন : যথা তথ্যতোহর্থান্ ব্যদধাৎ শাস্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ। অর্থাৎ, অর্থের বিধান তিনি যা করেছেন সে বিধান যথা তথ, তাতে খামখেয়ালি এতটুকুও নেই, এবং সে বিধান শাস্বত কালের, আজ একরকম কাল একরকম নয়। এর মানে হচ্ছে, আর্থরাজ্যে তাঁর বিধান তিনি চিরকালের জন্যে পাকা করে দিয়েছেন। এ না হলে মানুষকে চিরকাল তাঁর আঁচল-ধরা হয়ে দুর্বল হয়ে থাকতে হত; কেবলই এ ভয়ে, ও ভয়ে সে ভয়ে, পেয়াদার ঘুষ জুগিয়ে ফতুর হতে হত। কিন্তু, তাঁর পেয়াদার ছদ্মবেশধারী মিথ্যা বিভীষিকার হাত থেকে আমাদের বাঁচিয়েছে যে দলিল সে হচ্ছে তাঁর বিশ্বরাজ্যে আমাদের স্বরাজের দলিল; তারই মহা আশ্বাসবাণী হচ্ছে : যথা তথ্যতোহর্থান্ ব্যদধাৎ শাস্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ। তিনি অনন্তকাল থেকে অনন্তকালের জন্য অর্থের যে বিধান করেছেন তা যথা তথ। তিনি তাঁর সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রে এই কথা লিখে দিয়েছেন, ‘বস্তুরাজ্যে আমাকে না হলেও তোমার চলবে, ওখান থেকে আমি আড়ালে দাঁড়ালুম। এক দিকে রইল আমার বিশ্বের নিয়ম, আর-এক দিকে রইল তোমার বুদ্ধির নিয়ম, এই দুয়ের যোগে তুমি বড়ো হও। জয় হোক তোমার, এ রাজ্য তোমারই হোক, এর ধন তোমার, অস্ত্র তোমারই।’ এই

বিধিদত্ত স্বরাজ যে গ্রহণ করেছে অন্য সকল রকম স্বরাজ সে পাবে, আর পেয়ে রক্ষা করতে পারবে।

কিন্তু নিজের বুদ্ধিবিভাগে যে লোক কর্তাভজা পোলিটিক্যাল বিভাগেও কর্তাভজা হওয়া ছাড়া তার আর গতি নেই। বিধাতা স্বয়ং যেখানে কর্তৃত্ব দাবি করেন না সেখানেও যারা কর্তা জুটিয়ে বসে, যেখানে সম্মান দেন সেখানেও যারা আত্মাবমাননা করে, তাদের স্বরাজে রাজার পর রাজার আমদানি হবে; কেবল ছোট্টো ঐ স্ব'টুকুকে বাঁচানোই দায় হবে।

মানুষের বুদ্ধিকে ভূতের উপদ্রব এবং অদ্ভুতের শাসন থেকে মুক্তি দেবার ভার যে পেয়েছে তার বাসাটা পূর্বেই হোক আর পশ্চিমেই হোক তাকে ওস্তাদ বলে কবুল করতে হবে। দেবতার অধিকার আধ্যাত্মিক মহলে, আর দৈত্যের অধিকার বিশ্বের আধিভৌতিক মহলে। দৈত্য বলছি আমি বিশ্বের সেই শক্তিরূপকে যা সূর্যনক্ষত্র নিয়ে আকাশে আকাশে তালে তালে চক্রে চক্রে লাঠিম ঘুরিয়ে বেড়ায়। সেই আধিভৌতিক রাজ্যের প্রধান বিদ্যাটা আজ গুণ্ডাচার্যের হাতে। সেই বিদ্যাটার নাম সঞ্জীবনী বিদ্যা। সেই বিদ্যার জোরে সম্যকরূপে জীবনরক্ষা হয়, জীবনপোষণ হয়, জীবনের সকলপ্রকার দুর্গতি দূর হতে থাকে; অন্নের অভাব, বস্ত্রের অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব মোচন হয়; জড়ের অত্যাচার, জন্তুর অত্যাচার, মানুষের অত্যাচার থেকে এই বিদ্যাই রক্ষা করে। এই বিদ্যা যথাযথ বিধির বিদ্যা; এ যখন আমাদের বুদ্ধির সঙ্গে মিলবে তখনই স্বাভাব্যলাভের গোড়াপত্তন হবে, অন্য উপায় নেই।

এই শিক্ষা থেকে ভ্রষ্টতার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। হিন্দুর কুয়ো থেকে মুসলমানে জল তুললে তাতে জল অপবিত্র করে। এটা বিষম মুশকিলের কথা। কেননা, পবিত্রতা হল আধ্যাত্মিক রাজ্যের আর কুয়োর জলটা হল বস্তুরাজ্যের। যদি বলা যেত, মুসলমানকে ঘৃণা করলে মন অপবিত্র হয় তা হলে সে কথা বোঝা যেত; কেননা, সেটা আধ্যাত্মিক মহলের কথা। কিন্তু মুসলমানের ঘড়ার মধ্যে অপবিত্রতা আছে বললে তর্কের সীমানাগত জিনিসকে তর্কের সীমানার বাইরে নিয়ে গিয়ে বুদ্ধিকে ফাঁকি দেওয়া হয়। পশ্চিম-ইস্কুল-মাস্টারের আধুনিক হিন্দু ছাত্র বলবে, আসলে ওটা স্বাস্থ্যতত্ত্বের কথা। কিন্তু স্বাস্থ্যতত্ত্বের কোনো অধ্যায়ে তো পবিত্রতার বিচার নেই; ইংরেজের ছাত্র বলবে, আধিভৌতিকে যাদের শ্রদ্ধা নেই আধ্যাত্মিকের দোহাই দিয়ে তাদের ভুলিয়ে কাজ করাতে হয়। এ জবাবটা একেবারেই ভালো নয়। কারণ, যাদের বাইরে থেকে ভুলিয়ে কাজ আদায় করতে হয় চিরদিনই বাইরে থেকে তাদের কাজ করাতে হবে;

নিজের থেকে কাজ করার শক্তি তাদের থাকবে না, সুতরাং কৰ্তা না হলে তাদের অচল হবে। আর-একটি কথা, ভুল যখন সত্যের সহায়তা করতে যায় তখনো সে সত্যকে চাপা দেয়। ‘মুসলমানের ঘড়া হিন্দুর কুয়োর জল অপরিষ্কার করে’ না বলে যেই বলা হয় ‘অপবিত্র করে’, তখনই সত্যনির্ণয়ের সমস্ত পথ বন্ধ করা হয়। কেননা কোনো জিনিস কিছুকে অপরিষ্কার করে কি না-করে সেটা প্রমাণসাপেক্ষ। সে স্থলে হিন্দুর ঘড়া, মুসলমানের ঘড়া-হিন্দুর কুয়োর জল, মুসলমানের কুয়োর জল-হিন্দুপাড়ার স্বাস্থ্য, মুসলমানপাড়ার স্বাস্থ্য-যথানিয়মে ও যথেষ্ট পরিমাণে তুলনা করে পরীক্ষা করে দেখা চাই। পবিত্রতাঘটিত দোষ অন্তরের; কিন্তু স্বাস্থ্যঘটিত দোষ বাইরের, অতএব বাইরে থেকে তার প্রতিকার চলে। স্বাস্থ্যতত্ত্ব হিসাবে ঘড়া পরিষ্কার রাখার নিয়ম বৈজ্ঞানিক নিয়ম; তা মুসলমানের পক্ষেও যেমন হিন্দুর পক্ষেও তেমনি; সেটা যাতে উভয় পক্ষে সমান গ্রহণ করে উভয়ের কুয়ো উভয়েই ব্যবহার করতে পারে সেইটেই চেষ্টার বিষয়। কিন্তু বাহ্য বস্তুকে অপরিষ্কার না বলে অপবিত্র বলার দ্বারা চিরকালের জন্যেই এ সমস্যাকে সাধারণের বুদ্ধি ও চেষ্টার বাইরে নির্বাসিত করে রাখা হয়। এটা কি কাজ সারার পক্ষেও ভালো রাস্তা? এক দিকে বুদ্ধিকে মুগ্ধ রেখে আর- একদিকে সেই মূঢ়তার সাহায্য নিয়েই ফাঁকি দিয়ে কাজ চালানো, এটা কি কোনো উচ্চ অধিকারের পথ? চালিত যে তার দিকে অবুদ্ধি, আর চালক যে তার দিকে অসত্য, এই দু’য়ের সম্মিলনে কি কোনো কল্যাণ হতে পারে? এইরকম বুদ্ধিগত কাপুরুষতা থেকে দেশকে বাঁচাবার জন্যে আমাদের যেতে হবে গুরুাচার্যের ঘরে। সে ঘর পশ্চিম-দুয়ারি বলে যদি খামকা বলে বসি ‘ও ঘরটা অপবিত্র’ তা হলে যে বিদ্যা বাইরের নিয়মের কথা শেখায় তার থেকে বঞ্চিত হব, আর যে বিদ্যা অন্তরের পবিত্রতার কথা বলে তাকেও ছোটো করা হবে।

এই প্রসঙ্গে একটা তর্ক ওঠবার আশঙ্কা আছে। এ কথা অনেকে বলবেন, পশ্চিমদেশ যখন বুনো ছিল, পশুচর্ম পরে মৃগয়া করত, তখন কি আমরা নিজের দেশকে অন্ন জোগাই নি? বস্ত্র জোগাই নি? ওরা যখন দলে দলে সমুদ্রের এ পারে, ও পারে, দস্যুবৃত্তি করে বেড়াত আমরা কি তখন স্বরাজশাসনবিধি আবিষ্কার করি নি? নিশ্চয় করেছি, কিন্তু কারণটা কী? আর তো কিছুই নয়, বস্তুবিদ্যা ও নিয়মতত্ত্ব ওরা যতটা শিখেছিল আমরা তার চেয়ে বেশি শিখেছিলাম। পশুচর্ম পরতে যে বিদ্যা লাগে তাঁত বুনতে তার চেয়ে অনেক বেশি বিদ্যার দরকার, পশু মেরে খেতে

যে বিদ্যা খাটাতে হয় চাষ করে খেতে তার চেয়ে অনেক বেশি বিদ্যা লাগে। দস্যুবৃত্তিতে যে বিদ্যা রাজ্য-চালনে ও পালনে তার চেয়ে অনেক বেশি। আজ আমাদের পরস্পরের অবস্থাটা যদি একেবারে উল্টে গিয়ে থাকে তার মধ্যে দৈবের কোনো ফাঁকি নেই। কলিঙ্গের রাজাকে পথে ভাসিয়ে দিয়ে বনের ব্যাধকে আজ সিংহাসনে যে চড়িয়ে দিয়েছে সে তো কোনো দৈব নয়, সে ঐ বিদ্যা। অতএব, আমাদের সঙ্গে ওদের প্রতিযোগিতার জোর কোনো বাহ্য ক্রিয়াকলাপে কমবে না; ওদের বিদ্যাকে আমাদের বিদ্যা করতে পারলে তবেই ওদের সামলানো যাবে। এ কথার একমাত্র অর্থ, আমাদের সর্বপ্রধান সমস্যা শিক্ষাসমস্যা। অতএব গুরুনাথের আশ্রমে আমাদের যেতে হচ্ছে।

এই পর্যন্ত এগিয়ে একটা কথায় এসে মন ঠেকে যায়। সামনে এই প্রশ্নটা দেখা দেয়, ‘সব মানলেম, কিন্তু পশ্চিমের যে শক্তিরূপ দেখে এলে তাতে কি তৃপ্তি পেয়েছ?’ না, পাই নি। সেখানে ভোগের চেহারা দেখেছি, আনন্দের না। অনবচ্ছিন্ন সাত মাস আমেরিকায় ঐশ্বর্যের দানবপুরীতে ছিলাম। দানব মন্দ অর্থে বলেছি নে, ইংরেজিতে বলতে হলে হয়তো বলবেন, টাইট্যানিক্ ওয়েলথ্। অর্থাৎ, যে ঐশ্বর্যের শক্তি প্রবল, আয়তন বিপুল। হোটেলের জানলার কাছে রোজ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশতলা বাড়ির দ্রুতগতির সামনে বসে থাকতেম আর মনে মনে বলতেম, লক্ষ্মী হলেন এক, আর কুবের হল আর-অনেক তফাত। লক্ষ্মীর অন্তরের কথাটি হচ্ছে কল্যাণ, সেই কল্যাণের দ্বারা ধন শ্রীলাভ করে। কুবেরের অন্তরের কথাটি হচ্ছে সংগ্রহ, সেই সংগ্রহের দ্বারা ধন বহুলত্ব লাভ করে। বহুলত্বের কোনো চরম অর্থ নেই। দুই দুগুণে চার, চার দুগুণে আট, আট দুগুণে ষোলো, অঙ্কগুলো ব্যাঙের মতো লাফিয়ে চলে; সেই লাফের পাল্লা কেবলই লম্বা হতে থাকে। এই নিরন্তর উল্লম্বনের ঝোঁকের মাঝখানে যে প’ড়ে গেছে তার রোখ চেপে যায়, রক্ত গরম হয়ে ওঠে, বাহাদুরির মত্ততায় সে ভোঁ হয়ে যায়। আর, যে লোক বাইরে বসে আছে তার যে কত বড়ো পীড়া এইখানে তার একটা উপমা দিই।

একদিন আশ্বিনের ভরা নদীতে আমি বজরার জানলায় বসেছিলাম, সেদিন পূর্ণিমার সন্ধ্যা। অদূরে ডাঙার উপরে এক গহনার নৌকোর ভোজপুরি মাঝার দল উৎকট উৎসাহে আত্মবিনোদনের কাজে লেগে গিয়েছিল। তাদের কারো হাতে ছিল মাদল, কারো হাতে করতাল। তাদের কণ্ঠে সুরের আভাসমাত্র ছিল না, কিন্তু বাহুতে শক্তি ছিল সে কথা কার সাধ্য অস্বীকার করে। খচমচ শব্দে তালের নাচন ক্রমে দূন চৌদূন লয়ে চড়তে লাগল। রাত এগারোটা

হয়, দুপুর বাজে, ওরা থামতেই চায় না। কেননা, থামবার কোনোই সংগত কারণ নেই। সঙ্গে যদি গান থাকত তা হলে সমও থাকত; কিন্তু অরাজক তালের গতি আছে শান্তি নেই, উত্তেজনা আছে পরিতৃপ্তি নেই। সেই তাল মাতালের দল প্রতিক্ষণেই ভাবছিল ভরপুর মজা হচ্ছে। আমি ছিলাম তাণ্ডবের বাইরে, আমিই বুঝছিলাম গানহীন তালের দৌরাত্ম্য বড়ো অসহ্য।

তেমনি করেই আটলান্টিকের ওপারে হুঁটপাথরের জঙ্গলে ব'সে আমার মন প্রতিদিনই পীড়িত হয়ে বলেছে, তালের খচমচ'র অন্ত নেই, কিন্তু সুর কোথায়! আরো চাই, আরো চাই, আরো চাই, এ বাণীতে তো সৃষ্টির সুর লাগে না। তাই সেদিন সেই ঝকুটিকুটিল অভভেদী ঐশ্বর্যের সামনে দাঁড়িয়ে ধনমানহীন ভারতের একটি সন্তান প্রতিদিন ধিক্কারের সঙ্গে বলেছে : ততঃ কিম্!

এ কথা বার বার বলেছি, আবার বলি, আমি বৈরাগ্যের নাম করে শূন্য ঝুলির সমর্থন করি নে। আমি এই বলি, অন্তরে গান ব'লে সত্যটি যদি ভরপুর থাকে তবে তার সাধনায় সুর-তালের চেষ্টা থাকে রসের সংযমরক্ষার; বাহিরের বৈরাগ্য অন্তরের পূর্ণতার সাক্ষ্য দেয়। কোলাহলের উচ্ছৃঙ্খল নেশায় সংযমের কোনো বালাই নেই। অন্তরে প্রেম ব'লে সত্যটি যদি থাকে তবে তার সাধনায় ভোগকে হতে হয় সংযত, সেবাকে হতে হয় খাঁটি। এই সাধনার সতীত্ব থাকা চাই। এই সতীত্বের যে বৈরাগ্য অর্থাৎ সংযম সেই হল প্রকৃত বৈরাগ্য। অল্পপূর্ণার সঙ্গে বৈরাগীর যে মিলন সেই হল প্রকৃত মিলন।

যখন জাপানে ছিলাম তখন প্রাচীন জাপানের যে রূপ সেখানে দেখেছি সে আমাকে গভীর তৃপ্তি দিয়েছে। কেননা, অর্থহীন বহুলতা তার বাহন নয়। প্রাচীন জাপান আপন হৃৎপদ্যের মাঝখানে সুন্দরকে পেয়েছিল। তার সমস্তই বেশভূষা, কর্ম খেলা, তার বাসা আসবাব, তার শিষ্টাচার ধর্মানুষ্ঠান, সমস্ত একটি মূল ভাবের দ্বারা অধিকৃত হয়ে সেই এককে সেই সুন্দরকে বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রকাশ করেছে। একান্ত রিক্ততাও নিরর্থক, একান্ত বহুলতাও তেমনি। প্রাচীন জাপানের যে জিনিসটি আমার চোখে পড়েছিল তা রিক্ততাও নয়, বহুলতাও নয়, তা পূর্ণতা। এই পূর্ণতাই মানুষের হৃদয়কে আতিথ্য দান করে; সে ডেকে আনে, সে তাড়িয়ে দেয় না। আধুনিক জাপানকেও এর পাশাপাশি দেখেছি। সেখানে ভোজপুরি মাল্লার দল আড্ডা করেছে; তালের যে প্রচণ্ড খচমচ উঠেছে সুন্দরের সঙ্গে তার মিল হল না, পূর্ণিমাকে তা ব্যঙ্গ করতে লাগল।

পূর্বে যা বলেছি তার থেকে এ কথা সবাই বুঝবেন যে, আমি বলি নে রেলওয়ে টেলিগ্রাফ কল কারখানার কোনোই প্রয়োজন নেই। আমি বলি, প্রয়োজন আছে কিন্তু তার বাণী নেই; বিশ্বের কোনো সুরে সে সাই দেয় না, হৃদয়ের কোনো ডাকে সে সাড়া দেয় না। মানুষের যেখানে অভাব সেইখানে তৈরি হয় তার উপকরণ, মানুষের যেখানে পূর্ণতা সেইখানে প্রকাশ হয় তার অমৃতরূপ। এই অভাবের দিকে উপকরণের মহলে মানুষের ঈর্ষা বিদ্বেষ; এইখানে তার প্রাচীর, তার পাহারা; এইখানে সে আপনাকে বাড়ায়, পরকে তাড়ায়। সুতরাং এইখানেই তার লড়াই। যেখানে তার অমৃত, যেখানে মানুষ-বস্তুকে নয়-আত্মাকে প্রকাশ করে, সেখানে সকলকে সে ডেকে আনে; সেখানে ভাগের দ্বারা ভোজের ক্ষয় হয় না। সুতরাং সেইখানেই শান্তি।

যুরোপ যখন বিজ্ঞানের চাবি দিয়ে বিশ্বের রহস্যনিকেতনের দরজা খুলতে লাগল তখন যে দিকে চায় সেই দিকেই দেখে বাঁধা নিয়ম। নিয়ত এই দেখার অভ্যাসে তার এই বিশ্বাসটা ঢিলে হয়ে এসেছে যে, নিয়মেরও পশ্চাতে এমন কিছু আছে যার সঙ্গে আমাদের মানবত্বের অন্তরঙ্গ আনন্দময় মিল আছে। নিয়মকে কাজে খাটিয়ে আমরা ফল পাই, কিন্তু ফল পাওয়ার চেয়েও মানুষের একটা বড়ো লাভ আছে। চা-বাগানের ম্যানেজার কুলিদের 'পরে যে নিয়ম চালনা করে সে নিয়ম যদি পাকা হয় তা হলে চায়ের ফলনের পক্ষে কাজে লাগে। কিন্তু, বন্ধু সম্বন্ধে ম্যানেজারের তো পাকা নিয়ম নেই। তার বেলায় নিয়মের কথাই ওঠে না। ঐ জায়গাটাতে চায়ের আয় নেই, ব্যয় আছে। কুলির নিয়মটা আধিভৌতিক বিশ্বনিয়মের দলে, সেইজন্যে সেট চা-বাগানেও খাটে। কিন্তু, যদি এমন ধারণা হয় যে, ঐ বন্ধুতার সত্য কোনো বিরাট সত্যের অঙ্গ নয়, তা হলে সেই ধারণায় মানবত্বকে শুকিয়ে ফেলে; কলকে তো আমরা আত্মীয় বলে বরণ করতে পারি নে; তা হলে কলের বাইরে কিছু যদি না থাকে তবে আমাদের যে আত্মা আত্মীয়কে খোঁজে সে দাঁড়ায় কোথায়? এক রোখে বিজ্ঞানের চর্চা করতে করতে পশ্চিমদেশে এই আত্মাকে কেবলই সরিয়ে সরিয়ে ওর জন্যে আর জায়গা রাখলে না। একে-ঝোঁকা আধ্যাত্মিক বুদ্ধিতে আমরা দারিদ্র্যে দুর্বলতায় কাত হয়ে পড়েছি, আর ওরাই কি একে-ঝোঁকা আধিভৌতিক চালে এক পায়ে লাফিয়ে মনুষ্যত্বের সার্থকতার মধ্যে গিয়ে পৌঁচছে?

বিশ্বের সঙ্গে যাদের এমনিতরো চা-বাগানের ম্যানেজারির সম্বন্ধ তাদের সঙ্গে যে-সে লোকের পেরে ওঠা শক্ত। সুদক্ষতার বিদ্যাটা এরা আয়ত্ত করে নিয়েছে। ভালোমানুষ লোক

তাদের সন্ধানপর আড়কাঠির হাতে ঠকে যায়, ধরা দিলে ফেরবার পথ পায় না। কেননা, ভালোমানুষ লোকের নিয়মবোধ নেই, যেখানে বিশ্বাস করবার নয় ঠিক সেইখানেই আগে-ভাগে সে বিশ্বাস করে বসে আছে-তা সে বৃহস্পতিবারের বারবেলা হোক, রক্ষামন্ত্রের তাবিজ হোক, উকিলের দালাল হোক, আর চা-বাগানের আড়কাঠি হোক। কিন্তু এই নেহাত ভালোমানুষেরও একটা জায়গা আছে যেটা নিয়মের উপরকার; সেখানে দাঁড়িয়ে সে বলতে পারে, ‘সাত জনে আমি যেন চা-বাগানের ম্যানেজার না হই, ভগবান, আমার ‘পরে এই দয়া করো।’ অথচ এই অনবচ্ছিন্ন চাবোগানের ম্যানেজারসম্প্রদায় নিখুঁত করে উপকার করতে জানে; জানে তাদের কুলির বস্তি কেমন করে ঠিক যেন কাঁচিছাঁটা সোজা লাইনে পরিপাটি করে বানিয়ে দিতে হয়; দাওয়াইখানা ডাক্তারখানা হাট-বাজারের যে ব্যবস্থা করে সে খুব পরিপাটি। এদের এই নির্মানুষিক সুব্যবস্থায় নিজেদের মুনফা হয়, অন্যদের উপকারো হতে পারে। কিন্তু নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যং।

কেউ না মনে করেন, আমি কেবলমাত্র পশ্চিমের সঙ্গে পূর্বের সম্বন্ধ নিয়েই এই কথাটা বলছি। যান্ত্রিকতাকে অন্তরে বাহিরে বড়ো ক’রে তুলে পশ্চিম-সমাজে মানবসম্বন্ধের বিশ্লিষ্টতা ঘটেছে। কেননা, স্ত্রু দিয়ে আঁটা, আঠা দিয়ে জোড়ার বন্ধনকেই ভাবনায় এবং চেষ্টায় প্রধান ক’রে তুললে, অন্তরতম যে আত্মিক বন্ধনে মানুষ স্বতঃপ্রসারিত আকর্ষণে পরস্পর গভীরবাবে মিলে যায় সেই সৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন বন্ধন শিথিল হতে থাকে। অথচ, মানুষকে কলের নিয়মে বাঁধার আশ্চর্য সফলতা আছে; তাতে পণ্যদ্রব্য রাশীকৃত হয়, বিশ্ব জুড়ে হাট বসে, মেঘ ভেদ করে কোঠাবাড়ি ওঠে। এ দিকে সমাজব্যাপারে শিক্ষা বলো, আরোগ্য বলো, জীবিকার সুযোগসাধন বলো, নানাপ্রকার হিতকর্মেও মানুষের ষোলো আনা জিত হয়। কেননা, পূর্বেই বলেছি, বিশ্বের বাহিরের দিকে এই কল জিনিসটা সত্য। সেইজন্যে এই যান্ত্রিকতায় যাদের মন পেকে যায় তারা যতই ফললাভ করে, ফললাভের দিকে তাদের লোভের ততই অন্ত থাকে না। লোভ যতই বাড়তে থাকে মানুষকে মানুষ খাটো করতে ততই আর দ্বিধা করে না।

কিন্তু লোভ তো একটা তত্ত্ব নয়, লোভ হচ্ছে রিপু। রিপুর কর্ম নয় সৃষ্টি করা। তাই, ফললাভের লোভ যখন কোনো সভ্যতার অন্তরে প্রধান আসন গ্রহণ করে তখন সেই সভ্যতায় মানুষের আত্মিক যোগ বিশ্লিষ্ট হতে থাকে। সেই সভ্যতা যতই ধন লাভ করে, বল লাভ করে, সুবিধাসুযোগের যতই বিস্তার করতে থাকে, মানুষের আত্মিক সত্যকে ততই সে দুর্বল করে।

একা মানুষ ভয়ংকর নিরর্থক; কেননা, একার মধ্যে ঐক্য নেই। বহুকে নিয়ে যে এক সেই হল সত্য এক। বহু থেকে বিচ্ছিন্ন যে সেই লক্ষ্মীছাড়া এক ঐক্য থেকে বিচ্ছিন্ন এক। ছবি এক লাইনে হয় না, সে হয় নানা লাইনের ঐক্যে। ছবির মধ্যে প্রত্যেক লাইনটি ছোটো বড়ো সমস্ত লাইনের আত্মীয়। এই আত্মীয়তার সামঞ্জস্যে ছবি হল সৃষ্টি। এঞ্জিনিয়ার সাহেব নীলরঙের মোমজামার উপর বাড়ির প্ল্যান আঁকেন, তাকে ছবি বলি নে; কেননা, সেখানে লাইনের সঙ্গে লাইনের অন্তরের আত্মিক সম্বন্ধ নয়, বাহির-মহলের ব্যবহারিক সম্বন্ধ। তাই ছবি হল সৃজন, প্ল্যান হল নির্মাণ।

তেমনি ফললাভের লোভের ব্যবসায়িকতাই যদি মানুষের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে তবে মানবসমাজ প্রকাণ্ড প্ল্যান হয়ে উঠতে থাকে, ছবির আর কিছু বাকি থাকে না। তখন মানুষের মধ্যে আত্মিক সম্বন্ধ খাটো হতে থাকে। তখন ধন হয় সমাজের রথ, ধনী হয় সমাজের রথী, আর শক্ত বাঁধনে বাঁধা মানুষগুলো হয় রথের বাহন। গড়গড় শব্দে এই রথটা এগিয়ে চলাকেই মানুষ বলে সভ্যতার উন্নতি। তা হোক, কিন্তু এই কুবেরের রথযাত্রায় মানুষের আনন্দ নেই। কেননা কুবেরের 'পরে মানুষের অন্তরের ভক্তি নেই। ভক্তি নেই বলেই মানুষের বাঁধন দড়ির বাঁধন হয়, নাড়ীর বাঁধন হয় না। দড়ির বাঁধনের ঐক্যকে মানুষ সহিতে পারে না, বিদ্রোহী হয়। পশ্চিমদেশে আজ সামাজিক বিদ্রোহ কালো হয়ে ঘনিয়ে এসেছে এ কথা সুস্পষ্ট। ভারতে আচারের বাহ্য বন্ধনে যেখানে মানুষকে এক করতে চেয়েছে সেখানে সেই ঐক্যে সমাজকে নির্জীব করেছে, যুরোপে ব্যবহারের বাহ্য বন্ধনে যেখানে মানুষকে এক করতে চেয়েছে সেখানে সেই ঐক্যে সমাজকে সে বিশ্লিষ্ট করেছে। কেননা আচারই হোক তার ব্যবহারই হোক, তারা তো তত্ত্ব নয়; তাই তারা মানুষের আত্মাকে বাদ দিয়ে সকল ব্যবস্থা করে।

তত্ত্ব কাকে বলে? যিশু বলেছেন : আমি আর আমার পিতা এক। এ হল তত্ত্ব। পিতার সঙ্গে আমার যে ঐক্য সেই হল সত্য ঐক্য, ম্যানেজারের সঙ্গে কুলির যে ঐক্য সে সত্য ঐক্য নয়।

চরম তত্ত্ব আছে উপনিষদে-

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।

পশ্চিমসভ্যতার অন্তরাসনে লোভ রাজা হয়ে বসেছে, পূর্বেই তার নিন্দা করেছি। কিন্তু, নিন্দাটা কিসের? ঈশোপনিষদে তত্ত্বস্বরূপে এরই উত্তরটি দেওয়া হয়েছে। ঋষি বলেছেন : মা গৃধঃ। লোভ কোরো না। কেন করব না? যেহেতু লোভে সত্যকে মেলে না। নাইবা মিলল, আমি

ভোগ করতে চাই। ভোগ কোরো না, এ কথা তো বলা হচ্ছে না। ভুঞ্জীথাঃ, ভোগই করবে; কিন্তু সত্যকে ছেড়ে আনন্দকে ভোগ করবার পছন্দ নেই। তা হলে সত্যটা কী? সত্য হচ্ছে এই : ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্। সংসারে যা কিছু চলছে সমস্ত ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছন্ন। যা-কিছু চলছে সেইটেই যদি চরম সত্য হত, তার বাইরে আর-কিছুই না থাকত, তা হলে চলমান বস্তুকে যথাসাধ্য সংগ্রহ করাই মানুষের সব চেয়ে বড়ো সাধনা হত। তা হলে লোভই মানুষকে সব চেয়ে বড়ো চরিতার্থতা দিত। কিন্তু ঈশ সমস্ত পূর্ণ করে রয়েছেন এইটেই যখন শেষ কথা তখন আত্মার দ্বারা এই সত্যকে ভোগ করাই হবে পরম সাধনা। আর, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। ত্যাগের দ্বারাই এই ভোগের সাধন হবে, লোভের দ্বারা নয়। সাত মাস ধরে আমেরিকায় আকাশের বক্ষোবিদারী ঐশ্বর্যপুরীতে বসে এই সাধনার উল্টোপথে চলা দেখে এলেম। সেখানে ‘যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ’ সেটাই মস্ত হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে, আর ‘ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্’ সেটাই ডলারের ঘন ধুলায় আচ্ছন্ন। এইজন্যেই সেখানে ‘ভুঞ্জীথাঃ’ এই বিধানের পালন সত্যকে নিয়ে নয়, ধনকে নিয়ে; ত্যাগকে নিয়ে নয়, লোভকে নিয়ে।

ঐক্য দান করে সত্য। ভেদবুদ্ধি ঘটায় ধন। তা ছাড়া সে অন্তরাত্মাকে শূন্য রাখে; সেইজন্যে সেই শূন্যতার ক্ষোভে পূর্ণতাকে বাইরের দিক থেকে ছিনিয়ে নিতে ইচ্ছা করে। সুতরাং কেবল সংখ্যাবুদ্ধির দিকে দিনরাত উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে হয়; ‘আরো’ ‘আরো’ হাঁকতে-হাঁকতে হাঁপাতে-হাঁপাতে নামতার কোঠায় কোঠায় আকাজক্ষার ঘোড়দৌড় করাতে-করাতে ঘূর্ণি লাগে; ভুলেই যেতে হয় অন্য যা-কিছু পাই আনন্দ পাচ্ছি নে।

তা হলে চরিতার্থতা কোথায়? তার উত্তর একদিন ভারতবর্ষের ঋষিরা দিয়েছেন। তাঁরা বলেন, চরিতার্থতা পরম একের মধ্যে। গাছ থেকে আপেল পড়ে একটা, দুটো, তিনটে, চারটে। আপেল পড়ার অন্তবিহীন সংখ্যাগণনার মধ্যেই আপেল পড়ার সত্যকে পাওয়া যায় এ কথা যে বলে প্রত্যেক সংখ্যার কাছে এসে তাকে তার মন ধাক্কা দিয়ে বলবে ‘ততঃ কিম্’। তার দৌড়ও থামবে না, তার প্রশ্নের উত্তরও মিলবে না। কিন্তু অসংখ্য আপেল পড়া যেমনি একটি আকর্ষণতত্ত্বে এসে ঠেকে অমনি বুদ্ধি খুশি হয়ে বলে ওঠে, ‘বাস্! হয়েছে।’

এই তো গেল আপেল পড়ার সত্য। মানুষের সত্যটা কোথায়? সেন্সস্ রিপোর্টে? এক দুই তিন চার পাঁচে? মানুষের স্বরূপপ্রকাশ কি অন্তহীন সংখ্যায়? এই প্রকাশের তত্ত্বটি উপনিষৎ বলেছেন-

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।

সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগপ্সতে।

যিনি সর্বভূতকে আপনারই মতো দেখেন এবং আত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দেখেন তিনি প্রচ্ছন্ন থাকেন না। আপনাকে আপনাতেই যে বদ্ধ করে সে থাকে লুপ্ত; আপনাকে সকলের মধ্যে যে উপলব্ধি করে সেই হয় প্রকাশিত। মনুষ্যত্বের এই প্রকাশ ও প্রচ্ছন্নতার একটা মস্ত দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আছে। বুদ্ধদেব মৈত্রীবুদ্ধিতে সকল মানুষকে এক দেখেছিলেন, তাঁর সেই ঐক্যতত্ত্ব চীনকে অমৃত দান করেছিল। আর যে বণিক লোভের প্রেরণায় চীনে এল এই ঐক্যতত্ত্বকে সে মানলে না; সে অকুণ্ঠিতচিত্তে চীনকে মৃত্যুদান করেছে, কামান দিয়ে ঠেয়ে ঠেয়ে তাকে আফিম গিলিয়েছে। মানুষ কিসে প্রকাশ পেয়েছে আর কিসে প্রচ্ছন্ন হয়েছে, এর চেয়ে স্পষ্ট করে ইতিহাসে আর কখনো দেখা যায় নি।

আমি জানি, আজকের দিনে আমাদের দেশে অনেকেই বলে উঠবেন, ‘ঐ কথাটাই তো আমরা বার বার বলে আসছি। ভেদবুদ্ধিটা যাদের এত উগ্র, বিশ্বটাকে তাল পাকিয়ে পাকিয়ে এক-এক গ্রাসে গেলবার জন্যে যাদের লোভ এত বড়ো হাঁ করেছে, তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো কারবার চলতে পারে না। কেননা, ওরা আধ্যাত্মিক নয়, আমরা আধ্যাত্মিক। ওরা অবিদ্যাকেই মানে, আমরা বিদ্যাকে। এমন অবস্থায় ওদের সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা বিষের মতো পরিহার করা চাই।’ এক দিকে এটাও ভেদবুদ্ধির কথা, অপর দিকে এটা সাধারণ বিষয়বুদ্ধির কথাও নয়। ভারতবর্ষ এই মোহকে সমর্থন করেন নি। তাই মনু বলেছেন—

ন তথৈতানি শক্যন্তে সংনিয়ন্তুমসেবয়া।

বিষয়েষু প্রজুষ্ঠানি যথা জ্ঞানেন নিত্যশঃ।

বিষয়ের সেবা-ত্যাগের দ্বারা তেমন করে সংযমন হয় না, বিষয়ে নিযুক্ত থেকে জ্ঞানের দ্বারা নিত্য-নিত্য যেমন করে হয়। এর কারণ, বিষয়ের দায় আধিভৌতিক বিশ্বের দায়, সে দায়কে ফাঁকি দিয়ে আধ্যাত্মিকের কোঠায় ওঠা যায় না; তাকে বিশুদ্ধরূপে পূর্ণ করে তবে উঠতে হয়। তাই উপনিষৎ বলেছেন : অবিদ্যায়া মৃত্যুং তীৰ্ত্বা বিদ্যায়া-মৃতমশ্নুতে। অবিদ্যার পথ দিয়ে মৃত্যু থেকে বাঁচতে হবে, তার পরে বিদ্যার তীর্থে অমৃত লাভ হবে। গুত্রাচার্য এই মৃত্যু থেকে বাঁচবার বিদ্যা নিয়ে আছেন, তাই অমৃতলোকের ছাত্র কচকেও এই বিদ্যা শেখবার জন্যে দৈত্যপাঠশালার খাতায় নাম লেখাতে হয়েছিল।

আত্মিক সাধনার একটা অঙ্গ হচ্ছে জড়বিশ্বের অত্যাচার থেকে আত্মাকে মুক্ত করা। পশ্চিম-মহাদেশের লোকেরা সাধনার সেই দিকটার ভার নিয়েছে। এইটে হচ্ছে সাধনার সব

নিচেকার ভিত, কিন্তু এটা পাকা করতে না পারলে অধিকাংশ মানুষের অধিকাংশ শক্তিই পেটের দায়ে জড়ের গোলামি করতে ব্যস্ত থাকবে। পশ্চিম তাই হাতের আস্তিন গুটিয়ে খন্তা কোদাল নিয়ে এমনি করে মাটির দিকে ঝুঁকে পড়েছে যে উপর-পানে মাথা তোলবার ফুরসত তার নেই বললেই হয়। এই পাকা ভিতের উপর উপর-তলা যখন উঠবে তখনই হাওয়া-আলোর যারা ভক্ত তাদের বাসাটি হবে বাধাহীন। তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞানীরা বলেছেন, না-জানাই বন্ধনের কারণ, জানাতেই মুক্তি। বস্তুবিশ্বেও সেই একই কথা। এখানকার নিয়মতত্ত্বকে যে না জানে সেই বদ্ধ হয়, যে জানে সেই মুক্তিলাভ করে। তাই বিষয়রাজ্যে আমরা যে বাহ্য বন্ধন কল্পনা করি সেও মায়া; এই মায়া থেকে নিষ্কৃতি দেয় বিজ্ঞানে। পশ্চিম-মহাদেশ বাহ্য বিশ্বে মায়ামুক্তির সাধনা করেছে; সেই সাধনা ক্ষুধা তৃষ্ণা শীত গ্রীষ্ম রোগ দৈন্যের মূল খুঁজে বের করে সেইখানে লাগাচ্ছে ঘা; এই হচ্ছে মৃত্যুর মার থেকে মানুষকে রক্ষা করবার চেষ্টা আর পূর্ব-মহাদেশ অন্তরাত্মার যে সাধনা করেছে সেই হচ্ছে অমৃতের অধিকার লাভ করবার উপায়। অতএব, পূর্বপশ্চিমের চিত্ত যদি বিচ্ছিন্ন হয় তা হলে উভয়েই ব্যর্থ হবে; তাই পূর্বপশ্চিমের মিলনমন্ত্র উপনিষৎ দিয়ে গেছেন। বলেছেন-

বিদ্যাঞ্চবিদ্যাঞ্চ যন্তদ্বৈদোভয়ং সহ
অবিদ্যায়া মৃত্যুং তীৰ্ত্বা বিদ্যায়ামৃতমশুতে।

যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ, এইখানে বিজ্ঞানকে চাই। ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্, এইখানে তত্ত্বজ্ঞানকে চাই। এই উভয়কে মেলাবার কথা যখন ঋষি বলেছেন তখন পূর্বপশ্চিমকে মিলতে হবে। এই মিলনের অভাবে পূর্বদেশ দৈন্যপীড়িত, সে নির্জীব; আর এই মিলনের অভাবে পশ্চিম অশান্তির দ্বারা ক্ষুব্ধ, সে নিরানন্দ।

এই ঐক্যতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার কথা ভুল বোঝবার আশঙ্কা আছে। তাই যে কথাটা একবার আভাসে বলেছি সেইটে আর-একবার স্পষ্ট বলা ভালো। একাকার হওয়া এক হওয়া নয়। যারা স্বতন্ত্র তারাই এক হতে পারে। পৃথিবীতে যারা পরজাতির স্বাতন্ত্র্য লোপ করে তারাই সর্বজাতির ঐক্য লোপ করে। ইম্পিরিয়ালিজম হচ্ছে অজগর সাপের ঐক্যনীতি; গিলে খায়াকেই সে এক করা বলে প্রচার করে। পূর্বে আমি বলেছি, আধিভৌতিককে আধ্যাত্মিক যদি আত্মসাৎ করে বসে তা হলে সেটাকে সমন্বয় বলা চলে না; পরস্পরের স্ব-ক্ষেত্রে উভয়ে স্বতন্ত্র থাকলে তবেই সমন্বয় সত্য হয়। তেমনি মানুষ যেখানে স্বতন্ত্র সেখানে তার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করলে তবেই মানুষ

যেখানে এক সেখানে তার সত্য ঐক্য পাওয়া যায়। সেদিনকার মহাযুদ্ধের পর যুরোপ যখন শান্তির জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠল তখন থেকে সেখানে কেবলই ছোটো ছোটো জাতির স্বাতন্ত্র্যের দাবি প্রবল হয়ে উঠছে। যদি আজ নবযুগের আরম্ভ হয়ে থাকে তা হলে এই যুগে অতিকায় ঐশ্বর্য, অতিকায় সাম্রাজ্য, সংঘবন্ধনের সমস্ত অতিশয়তা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাবে। সত্যকার স্বাতন্ত্র্যের উপর সত্যকার ঐক্যের প্রতিষ্ঠা হবে। যারা নবযুগের সাধক ঐক্যের সাধনার জন্যেই তাদের স্বাতন্ত্র্যের সাধনা করতে হবে আর তাদের মনে রাখতে হবে, এই সাধনায় জাতিবিশেষের মুক্তি নয়, নিখিল মানবের মুক্তি।

যারা অন্যকে আপনার মতো জেনেছে ‘ন ততো বিজুগপসতে’, তারাই প্রকাশ পেয়েছে, এই তত্ত্বটি কি মানুষের পুঁথিতেই লেখা আছে? মানুষের সমস্ত ইতিহাসই কি এই তত্ত্বের নিরন্তর অভিব্যক্তি নয়? ইতিহাসের গোড়াতেই দেখি মানুষের দল পর্বতসমুদ্রের এক-একটি বেড়ার মধ্যে একত্র হয়েছে। মানুষ যখন একত্র হয় তখন যদি এক হতে না পারে তা হলেই সে সত্য হতে বঞ্চিত হয়। একত্রিত মনুষ্যদলের মধ্যে যারা যদুবংশের মাতাল বীরদের মতো কেবলই হানাহানি করেছে, কেউ কাউকে বিশ্বাস করে নি, পরস্পরকে বঞ্চিত করতে গিয়েছে, তারা কোন্ কালে লোপ পেয়েছে। আর, যারা এক আত্মাকে সকলের মধ্যে দেখতে চেয়েছিল তারাই মহা জাতিরূপে প্রকাশ পেয়েছে।

বিজ্ঞানের কল্যাণে জলে স্থলে আকাশে আজ এত পথ খুলেছে, এত রথ ছুটেছে যে, ভূগোলের বেড়া আজ আর বেড়া নেই। আজ, কেবল নানা ব্যক্তি নয়, নানা জাতি কাছাকাছি এসে জুটল; অমনি মানুষের সত্যের সমস্যা বড়ো হয়ে দেখা দিল। বৈজ্ঞানিক শক্তি যাদের একত্র করেছে তাদের এক করবে কে? মানুষের যোগ যদি সংযোগ হল তো ভালোই, নইলে সে দুর্যোগ। সেই মহাদুর্যোগ আজ ঘটেছে। একত্র হবার বাহ্যশক্তি হু হু করে এগোল, এক করবার আন্তর শক্তি পিছিয়ে পড়ে রইল। ঠিক যেন গাড়িটা ছুটেছে এঞ্জিনের জোরে, বেচারা ড্রাইভারটা ‘আরে আরে! হাঁ হাঁ’ করতে করতে তার পিছন পিছন দৌড়েছে—কিছুতে নাগাল পাচ্ছে না। অথচ, এক দল লোক এঞ্জিনের প্রচণ্ড বেগ দেখে আনন্দ করে বললে, ‘শাবাশ! একেই তো বলে উন্নতি।’ এ দিকে, আমরা পূর্বদেশের ভালোমানুষ যারা ধীরমন্দগমনে পায়ে হেঁটে চলি ওদের ঐ উন্নতির ধাক্কা আজও সামলে উঠতে পারছি নে। কেননা যারা কাছেও আসে, তফাতেও থাকে, তারা যদি চঞ্চল পদার্থ হয় তা হলে পদে পদে ঠকাঠক ধাক্কা দিতে থাকে। এই ধাক্কার মিলন সুখকর নয়, অবস্থা বিশেষে কল্যাণকর হতেও পারে।

যাই হোক, এর চেয়ে স্পষ্ট আজ আর কিছুই নয় যে, জাতিতে জাতিতে একত্র হচ্ছে অথচ মিলছে না। এরই বিষম বেদনায় সমস্ত পৃথিবী পীড়িত। এত দুঃখেও দুঃখের প্রতিকার হয় না কেন? তার কারণ এই যে, গণ্ডির ভিতরে যারা এক হতে শিখেছিল গণ্ডির বাইরে তারা এক হতে শেখে নি।

মানুষ সাময়িক ও স্থানিক কারণে গণ্ডির মধ্যে সত্যকে পায় ব'লেই সত্যের পূজা ছেড়ে গণ্ডির পূজা ধরে; দেবতার চেয়ে পাণ্ডাকে মানে; রাজাকে ভোলে, দারোগাকে কিছুতে ভুলতে পারে না। পৃথিবীতে নেশন গড় উঠল সত্যের জোরে; কিন্তু ন্যাশন্যালিজম্ সত্য নয়, অথচ সেই জাতীয় গণ্ডি-দেবতার পূজার অনুষ্ঠানে চারি দিক থেকে নরবলির জোগান চলতে লাগল। যতদিন বিদেশী বলি জুটত ততদিন কোনো কথা ছিল না; হঠাৎ ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে পরস্পরকে বলি দেবার জন্যে স্বয়ং যজমানদের মধ্যে টানাটানি পড়ে গেল। তখন থেকে ওদের মনে সন্দেহ জাগতে আরম্ভ হল, একেই কি বলে ইষ্টদেবতা! এ যে ঘর পর কিছুই বিচার করে না! এ যখন একদিন পূর্বদেশের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোমল অংশ বেছে তাতে দাঁত বসিয়েছিল এবং ‘ভিক্ষু যথা ইক্ষু খায় ধরি ধরি চিবায় সমস্ত’-তখন মহাপ্রসাদের ভোজ খুব জমেছিল, সঙ্গে সঙ্গে মদমত্ততারও অবধি ছিল না। আজ মাথায় হাত দিয়ে ওদের কেউ কেউ ভাবছে, ‘এর পূজো আমাদের বংশে সহিবে না।’ যুদ্ধ যখন পুরোদমে চলছিল তখন সকলেই ভাবছিল, যুদ্ধ মিটলেই অকল্যাণ মিটবে। যখন মিটল তখন দেখা গেল, ঘুরে ফিরে সেই যুদ্ধটাই এসেছে সন্ধিপত্রের মুখোশ পরে। কিস্কিন্দ্যাকাণ্ডে যার প্রকাণ্ড লেজটা দেখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আঁতকে উঠেছিল, আজ লঙ্কাকাণ্ডের গোড়ায় দেখি সেই লেজটার উপর মোড়কে মোড়কে সন্ধিপত্রের স্নেহসিক্ত কাগজ জড়ানো চলেছে; বোঝা যাচ্ছে, ঐটাতে আগুন যখন ধরবে তখন কারোর ঘরের চাল আর বাকি থাকবে না। পশ্চিমের মনীষী লোকেরা ভীত হয়ে বলছেন যে, যে দুর্বুদ্ধি থেকে দুর্ঘটনার উৎপত্তি এত মারের পরেও তার নাড়ী বেশ তাজা আছে। এই দুর্বুদ্ধিরই নাম ন্যাশন্যালিজম্, দেশের সর্বজনীন আত্মসত্ত্ব। এ হল রিপু, ঐক্যতত্ত্বের উলটো দিকে অর্থাৎ আপনার দিকটাতেই এর টান। কিন্তু জাতিতে জাতিতে আজ একত্র হয়েছে এই কথাটা যখন অস্বীকার করবার জো নেই, এত বড়ো সত্যের উপর যখন কোনো একটামাত্র প্রবল জাতি আপন সাম্রাজ্যরথ চালিয়ে দিয়ে চাকার তলায় একে ধুলো করে দিতে পারে না, তখন এর সঙ্গে সত্য ব্যবহার করতেই হবে।

তখন ঐ রিপুটাকে এর মাঝখানে আনলে শকুনির মতো কপট দ্যুতের ডিপ্লমাসিতে বারে বারে সে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দেবে।

বর্তমান যুগের সাধনার সঙ্গেই বর্তমান যুগের শিক্ষার সংগতি হওয়া চাই। রাষ্ট্রীয় গণ্ডি-দেবতার যারা পূজারি তারা শিক্ষার ভিতর দিয়ে নানা ছুতোয় জাতীয় আত্মস্তরিতার চর্চা করাকে কর্তব্য মনে করে। জার্মানি একদা শিক্ষাব্যবস্থাকে তার রাষ্ট্রনৈতিক ভেদবুদ্ধির ত্রীতদাসী করেছিল বলে পশ্চিমের অন্যান্য নেশন তার নিন্দা করেছে। পশ্চিমের কোন্ বড়ো নেশন এ কাজ করে নি? আসল কথা, জার্মানি সকল বিভাগেই বৈজ্ঞানিক রীতিতে অন্যান্য সকল জাতির চেয়ে বেশি আয়ত্ত করেছে, সেইজন্যে পাকা নিয়মের জোরে শিক্ষাবিধিকে নিয়ে স্বাজাত্যের ডিমে তা দেবার ইনক্যুবেটার যন্ত্র সে বানিয়েছিল; তার থেকে যে বাচ্ছা জন্মছিল দেখা গেছে অন্যদেশী বাচ্ছার চেয়ে তার দম অনেক বেশি। কিন্তু তার প্রতিপক্ষ পক্ষীদের ডিমেতেও তা দিয়েছিল সেদিককার শিক্ষাবিধি। আর, আজ ওদের অধিকাংশ খবরের কাগজের প্রধান কাজটা কী? জাতীয় আত্মস্তরিতার কুশল কামনা করে প্রতিদিন অসত্যপীরের সিন্ধি মানা।

স্বাজাত্যের অহমিকা থেকে মুক্তিদান করার শিক্ষাই আজকের দিনের প্রধান শিক্ষা। কেননা কালকের দিনের ইতিহাস সার্বজাতিক সহযোগিতার অধ্যায় আরম্ভ করবে। যে-সকল রিপু যে-সকল চিন্তার অভ্যাস ও আচারপদ্ধতি এর প্রতিকূল তা আগামী কালের জন্যে আমাদের অযোগ্য করে তুলবে। স্বদেশের গৌরববুদ্ধি আমার মনে আছে, কিন্তু আমি একান্ত আগ্রহে ইচ্ছা করি যে, সেই বুদ্ধি যেন কখনো আমাকে এ কথা না ভোলায় যে একদিন আমার দেশে সাধকেরা যে মন্ত্র প্রচার করেছিলেন সে হচ্ছে ভেদবুদ্ধি দূর করবার মন্ত্র। শুনতে পাচ্ছি সমুদ্রের ওপারের মানুষ আজ আপনাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছে, ‘আমাদের কোন্ শিক্ষা কোন্ চিন্তা, কোন্ কর্মের মধ্যে মোহ প্রচ্ছন্ন হয়েছিল যার জন্যে আমাদের আজ এমন নিদারুণ শোক।’ তার উত্তর আমাদের দেশ থেকেই দেশে দেশান্তরে পৌঁছুক যে, ‘মানুষের একত্বকে তোমরা সাধনা থেকে দূরে রেখেছিলে, সেইটেই মোহ, এবং তার থেকেই শোক।’ -

যস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাবুদ্ বিজানতঃ

তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ। আমরা শুনতে পাচ্ছি সমুদ্রের ও পারে মানুষ ব্যাকুল হয়ে বলছে, ‘শান্তি চাই।’ এই কথা তাদের জানাতে হবে, শান্তি সেখানেই যেখানে মঙ্গল, সেখানেই যেখানে ঐক্য। এইজন্য পিতামহেরা বলেছেন : শান্তং শিবমদ্বৈতম্। অদ্বৈতই শান্ত,

কেননা অদ্বৈতই শিব। স্বদেশের গৌরববুদ্ধি আমার মনে আছে, সেইজন্যে এই সম্ভাবনার কল্পনাতেও আমার লজ্জা হয় যে, অতীত যুগের যে আবর্জনাভার সরিয়ে ফেলবার জন্যে আজ রুদ্রদেবতার হুকুম এসে পৌঁছেছে এবং পশ্চিমদেশ সেই হুকুমে জাগতে শুরু করেছে আমরা পাছে স্বদেশে সেই আবর্জনার পীঠ স্থাপন করে আজ যুগান্তরের প্রত্যুষেও তামসী পূজাবিধি দ্বারা তার অর্চনা করবার আয়োজন করতে থাকি। যিনি শান্ত, যিনি শিব, যিনি সার্বজাতিক মানবের পরমাশ্রয় অদ্বৈত, তাঁরই ধ্যানমন্ত্র কি আমাদের ঘরে নেই? সেই ধ্যানমন্ত্রের সহযোগেই কি নবযুগের প্রথম প্রভাতরশ্মি মানুষের মনে সনাতন সত্যের উদ্‌বোধন এনে দেবে না?

এইজন্যেই আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতনকে পূর্বপশ্চিমের মিলননিকেতন ক'রে তুলতে হবে, এই আমার অন্তরের কামনা। বিষয়লাভের ক্ষেত্রে মানুষের বিরোধ মেটে নি, সহজে মিটেও চায় না। সত্যলাভের ক্ষেত্রে মিলনের বাধা নেই। যে গৃহস্থ কেবলমাত্র আপন পরিবারকে নিয়েই থাকে, আতিথ্য করতে যার কৃপণতা, সে দীনাত্মা। শুধু গৃহস্থের কেন, প্রত্যেক দেশেরই কেবল নিজের ভোজনশালা নিয়ে চলবে না, তার অতিথিশালা চাই যেখানে বিশ্বকে অভ্যর্থনা করে সে ধন্য হবে। শিক্ষাক্ষেত্রেই তার প্রধান অতিথিশালা। দুর্ভাগা ভারতবর্ষে বর্তমান কালে শিক্ষার যত-কিছু সরকারি ব্যবস্থা আছে তার পনেরো-আনা অংশই পরের কাছে বিদ্যাভিক্ষার ব্যবস্থা। ভিক্ষা যার বৃত্তি আতিথ্য করে না বলে লজ্জা করাও তার ঘুচে যায়। সেইজন্যেই বিশ্বের আতিথ্য করে না বলে ভারতীয় আধুনিক শিক্ষালয়ের লজ্জা নেই। সে বলে, 'আমি ভিখারি, আমার কাছে আতিথ্যের প্রত্যাশা কারো নেই।' কে বলে নেই? আমি তো শুনেছি পশ্চিমদেশ বারংবার জিজ্ঞাসা করছে, 'ভারতের বাণী কই?' তার পর সে যখন আধুনিক ভারতের দ্বারে এসে কান পাতে তখন বলে, 'এ তো সব আমারই বাণীর ক্ষীণ প্রতিধ্বনি, যেন ব্যঙ্গের মতো শোনাচ্ছে।' তাই তো দেখি, আধুনিক ভারত যখন ম্যাক্সম্যুলরের পাঠশালা থেকে বাহির হয়েই আর্যসভ্যতার দম্ভ করতে থাকে তখন তার মধ্যে পশ্চিম গড়ের বাদ্যের কড়িমধ্যম লাগে, আর পশ্চিমকে যখন সে প্রবল ধিক্কারের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে তখনো তার মধ্যে সেই পশ্চিম রাগেরই তারসপ্তকের নিখাদ তীব্র হয়ে বাজে।

আমার প্রার্থনা এই যে, ভারত আজ সমস্ত পূর্বভূভাগের হয়ে সত্যসাধনার অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করুক। তার ধনসম্পদ নেই জানি, কিন্তু তার সাধনসম্পদ আছে। সেই সম্পদের জোরে সে বিশ্বকে নিমন্ত্রণ করবে এবং তার পরিবর্তে সে বিশ্বের সর্বত্র নিমন্ত্রণের অধিকার পাবে।

দেউড়িতে নয়, বিশ্বের ভিতর-মহলে তার আসন পড়বে। কিন্তু আমি বলি, এই মানসসম্মানের কথা এও বাহিরের, একেও উপেক্ষা করা চলে। এই কথাই বলবার কথা যে, সত্যকে চাই অন্তরে উপলব্ধি করতে এবং সত্যকে চাই বাহিরে প্রকাশ করতে; কোনো সুবিধার জন্যে নয়, সম্মানের জন্যে নয়, মানুষের আত্মাকে তার প্রচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি দেবার জন্যে। মানুষের সেই প্রকাশতত্ত্বটি আমাদের শিক্ষার মধ্যে প্রচার করতে হবে, কর্মের মধ্যে প্রচলিত করতে হবে, তা হলেই সকল মানুষের সম্মান করে আমরা সম্মানিত হব; নবযুগের উদ্‌বোধন করে আমরা জরামুক্ত হব। আমাদের শিক্ষালয়ের সেই শিক্ষামন্ত্রটি এই-

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ

অপরিচিত আসনে অনভ্যস্ত কর্তব্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে আহ্বান করেছেন। তার প্রত্যুত্তরে আমি আমার সাদর অভিবাদন জানাই।

এই উপলক্ষে নিজের ন্যূনতা-প্রকাশ হয়তো শোভন রীতি। কিন্তু প্রথার এই অলংকারগুলি বস্তুত শোভন নয়, এবং তা নিষ্ফল। কর্তব্যক্ষেত্রে প্রবেশ করার উপক্রমেই আগে থাকতে ক্ষমা প্রার্থনা করে রাখলে সাধারণের মন অনুকূল হতে পারে, এই ব্যর্থ আশার ছলনায় মনকে ভোলাতে চাই নে। ক্ষমা প্রার্থনা করলেই অযোগ্যতার ত্রুটি সংশোধন হয় না, তাতে কেবল ত্রুটি স্বীকার করাই হয়। যাঁরা অকরণ তাঁরা সেটাকে বিনয় বলে গ্রহণ করেন না, আত্মগ্লানি বলেই গণ্য করেন।

যে কর্মে আমাকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে সে সম্বন্ধে আমার সম্বল কী আছে তা কারো অগোচর নেই। অতএব ধরে নিতে পারি, কর্মটি আমার যে উপযুক্ত সে বিচার কর্তৃপক্ষদের দ্বারা পূর্বেই হয়ে গেছে।

এই ব্যবস্থার মধ্যে কিছু নূতনত্ব আছে-তার থেকে অনুমান করা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সম্প্রতি কোনো-একটি নূতন সংকল্পের সূচনা হয়েছে। হয়তো মহৎ তার গুরুত্ব। এইজন্য সুস্পষ্টরূপে তাকে উপলব্ধি করা চাই।

বহুকাল থেকে কোনো-একটি বিশেষ পরিচয়ে আমি সাধারণের দৃষ্টির সম্মুখে দিন কাটিয়েছি। আমি সাহিত্যিক; অতএব, সাহিত্যিকরূপেই আমাকে এখানে আহ্বান করা হয়েছে এ কথা স্বীকার করতেই হবে। সাহিত্যিকের পদবী আমার পক্ষে নিরুদ্বেগের বিষয় নয়, বহু দিনের কঠোর অভিজ্ঞতায় সে আমি নিশ্চিত জানি। সাহিত্যিকের সমাদর রুচির উপরে নির্ভর করে, যুক্তিপ্রমাণের উপর নয়। এ ভিত্তি কোথাও কাঁচা, কোথাও পাকা, কোথাও কুটিল; সর্বত্র এ সমান ভার সয় না। তাই বলি কবির কীর্তি কীর্তিস্তম্ভ নয়, সে কীর্তিতরণী। আবর্তসংকুল বহুদীর্ঘ কালস্রোতের সকল পরীক্ষা সকল সংকট উত্তীর্ণ হয়েও যদি তার এগিয়ে চলা বন্ধ না হয়, অন্তত নোঙর ক'রে থাকবার একটা ভদ্র ঘাট যদি সে পায়, তবেই সাহিত্যের পাকা খাতায় কোনো-একটা বর্গে তার নাম চিহ্নিত হতে পারে। ইতিমধ্যে লোকের মুখে মুখে নানা অনুকূল প্রতিকূল বাতাসের আঘাত খেতে খেতে তাকে ঢেউ কাটিয়ে চলতে হবে। মহাকালের বিচারদরবারে চূড়ান্ত শুনানির লগ্ন ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঘটে না, বৈতরণীর পরপারে তাঁর বিচারসভা।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্বানের আসন চিরপ্রসিদ্ধ। সেই পাণ্ডিত্যের গৌরব-গম্ভীর পদে সহসা সাহিত্যিককে বসানো হল। সুতরাং এই রীতিবিপর্যয় অত্যন্ত বেশি ক'রে চোখে পড়বার বিষয় হয়েছে। এরকম বহুতীক্ষ্ণদৃষ্টি-সংকুল কুশাক্ষুরিত পথে সহজে চলাফেরা করা আমার চেয়ে অনেক শক্ত মানুষের পক্ষেও দুঃসাধ্য। আমি যদি পণ্ডিত হতুম তবে নানা লোকের সম্মতি-অসম্মতির দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও পথের বাধা কঠোর হত না। কিন্তু স্বভাবতই এবং অভ্যাসবশতই আমার চলন অব্যবসায়ীর চালে। বাহির থেকে আমি এসেছি আগন্তুক, এইজন্য প্রশ্ন প্রত্যাশা করতে আমার ভরসা হয় না।

অথচ আমাকে নির্বাচন করার মধ্যেই আমার সম্বন্ধে একটি অভয়পত্রী প্রচ্ছন্ন আছে, সেই আশ্বাসের আভাস পূর্বেই দিয়েছি। নিঃসন্দেহ আমি এখানে চলে এসেছি কোনো-একটি ঋতুপরিবর্তনের মুখে। পুরাতনের সঙ্গে আমার অসংগতি থাকতে পারে, কিন্তু নূতন বিধানের নবোদ্যম হয়তো আমাকে তার আনুচর্য্যে গ্রহণ করতে অপ্রসন্ন হবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মক্ষেত্রে প্রথম-পদার্পণ-কালে এই কথাটির আলোচনা ক'রে অন্যের কাছে না হোক, অন্তত নিজের কাছে বিষয়টিকে স্পষ্ট ক'রে তোলার প্রয়োজন আছে। অতএব, আমাকে জড়িত করে যে ব্রতটির উপক্রম হল তার ভূমিকা এখানে স্থির করে নিই।

বিশ্ববিদ্যালয় একটি বিশেষ সাধনার ক্ষেত্র। সাধারণভাবে বলা চলে, সে সাধনা বিদ্যার সাধনা। কিন্তু তা বললে কথাটা সুনির্দিষ্ট হয় না; কেননা বিদ্যা শব্দের অর্থ ব্যাপক এবং তার সাধনা বহুবিচিত্র।

এ দেশে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষ আকার প্রকার ক্রমশ পরিণতি হয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসেই তার মূল নিহিত। এই উপলক্ষে তার বিস্তারিত বিচার অসংগত হবে না। বাল্যকাল হতে যাঁরা এই বিদ্যালয়ের নিকট-সংস্রবে আছেন তাঁরা আপন অভ্যাস ও মমত্বের বেষ্টনী থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একে বৃহৎ কালের পরিপ্রেক্ষণিকায় দেখতে হয়তো কিছু বাধা পেতে পারেন। সামীপ্যের এবং অভ্যাসের সম্বন্ধ না থাকাতে আমার পক্ষে সেই ব্যক্তিগত বাধা নেই; অতএব আমার অসংস্কৃত মনে এর স্বরূপ কিরকম প্রতিভাত হচ্ছে সেটা সকলের পক্ষে স্বীকার করবার যোগ্য না হলেও বিচার করবার যোগ্য।

বলা বাহুল্য, যুরোপীয় ভাষায় যাকে যুনিভার্সিটি বলে প্রধানত তার উদ্ভব যুরোপে। অর্থাৎ যুনিভার্সিটির যে চেহারার সঙ্গে আমাদের আধুনিক পরিচয় এবং যার সঙ্গে আধুনিক শিক্ষিতসমাজের ব্যবহার সেটা সমূলে ও শাখা-প্রশাখায় বিলিতি। আমাদের দেশের অনেক ফলের গাছকে আমরা বিলিতি বিশেষণ দিয়ে থাকি, কিন্তু দিশি গাছের সঙ্গে তাদের কুলগত প্রভেদ থাকলেও প্রকৃতিগত ভেদ নেই। আজ পর্যন্ত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে সে কথা সম্পূর্ণ বলা চলবে না। তার নামকরণ, তার রূপকরণ, এ দেশের সঙ্গে সংগত নয়; এ দেশের আবহাওয়ায় তার স্বভাবীকরণও ঘটে নি।

অথচ এই যুনিভার্সিটির প্রথম প্রতিরূপ একদিন ভারতবর্ষেই দেখা দিয়েছিল। নালন্দা বিক্রমশিলা তক্ষশিলার বিদ্যায়তন কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার নিশ্চিত কালনির্ণয় এখনো হয় নি, কিন্তু ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, যুরোপীয় যুনিভার্সিটির পূর্বেই তাদের আভির্ভাব। তাদের উদ্ভব ভারতীয় চিন্তের আন্তরিক প্রেরণায়, স্বভাবের অনিবার্য আবেগে। তার পূর্ববর্তী কালে বিদ্যার সাধনা ও শিক্ষা বিচিত্র আকারে ও বিবিধ প্রণালীতে দেশে নানা স্থানে ব্যাপ্ত হয়েছিল, এ কথা সুনিশ্চিত। সমাজের সেই সর্বত্রপরিকীর্ণ সাধনাই পুঞ্জীভূত কেন্দ্রীভূত রূপে এক সময়ে স্থানে স্থানে দেখা দিল।

এর থেকে মনে পড়ে ভারতবর্ষে বেদব্যাসের যুগ, মহাভারতের কাল। দেশে যে বিদ্যা, যে মননধারা, যে ইতিহাসকথা দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত ছিল, এমন-কি দিগন্তের কাছে বিলীনপ্রায় হয়ে

এসেছে, এক সময়ে তাকে সংগ্রহ করা তাকে সংহত করার নিরতিশয় আগ্রহ জেগেছিল সমস্ত দেশের মনে। নিজের চিত্তপ্রকর্ষের যুগব্যাপী ঐশ্বর্যকে সুস্পষ্টরূপে নিজের গোচর করতে না পারলে তা ক্রমশ অনাদরে অপরিচয়ে জীর্ণ হয়ে বিলুপ্ত হয়। কোনো এক কালে এই আশঙ্কায় দেশ সচেতন হয়ে উঠেছিল; দেশ একান্ত ইচ্ছা করেছিল, আপন সূত্রচ্ছিন্ন রত্নগুলিকে উদ্ধার করতে, সংগ্রহ করতে, তাকে সূত্রবদ্ধ করে সমগ্র করতে এবং তাকে সর্বলোকের ও সর্বকালের ব্যবহারে উৎসর্গ করতে। দেশ আপন বিরাট চিনুয়ী প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষরূপে সমাজে স্থিরপ্রতিষ্ঠ করতে উৎসুক হয়ে উঠল। যা আবদ্ধ ছিল বিশেষ বিশেষ পণ্ডিতের অধিকারে তাকেই অনবচ্ছিন্নরূপে সর্বসাধারণের আয়ত্তগোচর করবার এই এক আশ্চর্য অধ্যবসায়। এর মধ্যে একটি প্রবল চেষ্টা, অক্লান্ত সাধনা, একটি সমগ্রদৃষ্টি ছিল। এই উদ্যোগের মহিমাকে শক্তিমতী প্রতিভা আপন লক্ষ্যীভূত করেছিল, তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় মহাভারত নামটিতেই। মহাভারতের মহৎ সমুজ্জ্বল রূপ যাঁরা ধ্যানে দেখেছিল ‘মহাভারত’ নামকরণ তাঁদেরই কৃত। সেই রূপটি একই কালে ভৌমিগুলিক রূপ এবং মানস রূপ। ভারতবর্ষের মনকে দেখেছিলেন তাঁরা মনে। সেই বিশ্বদৃষ্টির প্রবল আনন্দে তাঁরা ভারতবর্ষে চিরকালের শিক্ষার প্রশস্ত ভূমি পত্তন করে দিলেন। সে শিক্ষা ধর্মে কর্মে রাজনীতিতে সমাজনীতিতে তত্ত্বজ্ঞানে বহুব্যাপক। তার পর থেকে ভারতবর্ষ আপন নির্ধূর ইতিহাসের হাতে আঘাতের পর আঘাত পেয়েছে, তার মর্মগ্রন্থি বার বার বিশ্লিষ্ট হয়ে গেছে, দৈন্য এবং অপমানে সে জর্জর কিন্তু ইতিহাসবিস্মৃত সেই যুগের সেই কীর্তি এতকাল লোকশিক্ষার অবাধ জলসেকপ্রণালীকে নানা ধারায় পূর্ণ ও সচল করে রেখেছে। গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তার প্রভাব আজও বিরাজমান। সেই মূল প্রস্রবণ থেকে এই শিক্ষার ধারা যদি নিরন্তর প্রবাহিত না হত তা হলে দুঃখে দারিদ্র্যে অসম্মানে দেশ বর্বরতার অন্ধকূপে মনুষ্যত্ব বিসর্জন করত। সেইদিন ভারতবর্ষে যথার্থ আপন সজীব বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি। তার মধ্যে জীবনীশক্তির বেগ যে কত প্রবল তা স্পষ্টই বুঝতে পারি যখন দেখতে পাই সমুদ্রপারে জাভাদ্বীপে সর্বসাধারণের সমস্ত জীবন ব্যাপ্ত করে কী-একটি কল্পলোকের সৃষ্টি সে করেছে; এই আর্যেতর জাতির চরিত্রে, তার কল্পনায়, তার রূপরচনায় কিরকম সে নিরন্তর সক্রিয়। জ্ঞানের একটা দিক আছে, তা বৈষয়িক। সে রয়েছে জ্ঞানের বিষয় সংগ্রহ করবার লোভকে অধিকার করে, সে উত্তেজিত করে পাণ্ডিত্যের অভিমানকে। এই কৃপণের ভাণ্ডারের

অভিमुखে কোনো মহৎ প্রেরণা উৎসাহ পায় না। ভারতে এই-যে মহাভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-যুগের উল্লেখ করলেম সেই যুগের মধ্যে তপস্যা ছিল; তার কারণ ভাণ্ডার-পূরণ তার লক্ষ্য ছিল না; তার উদ্দেশ্য ছিল সর্বজনীন চিত্তের উদ্দীপন, উদ্‌বোধন, চারিত্রসৃষ্টি। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের যে আদর্শ জ্ঞানে কর্মে হৃদয়ভাবে ভারতের মনে উদ্ভাসিত হয়েছিল এই উদ্যোগ তাকেই সঞ্চারিত করতে চেয়েছিল চিরদিনের জন্য সর্বসাধারণের জীবনের মধ্যে, তার আর্থিক ও পারমার্থিক সদগতির দিকে, কেবলমাত্র তার বুদ্ধিতে নয়।

নালন্দা বিক্রমশিলার বিদ্যায়তন সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। সে যুগে সে বিদ্যার মহৎমূল্য দেশের লোক গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিল; তাকে সমগ্র সম্পূর্ণতায় কেন্দ্রীভূত করে সর্বজনীন জ্ঞানসত্র রচনা করবার ইচ্ছা স্বতই ভারতবর্ষের মনে সমুদ্যত হয়েছিল সন্দেহ নেই। ভগবান বুদ্ধ একদিন যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন স ধর্ম তার নানা তত্ত্ব, নানা অনুশাসন, তার সাধনার নানা প্রণালী নিয়ে সাধারণচিত্তের আন্তর্ভৌম স্তরে প্রবেশ করে ব্যাপ্ত হয়েছিল। তখন দেশ প্রবলভাবে কামনা করেছিল এই বহুশাখায়িত পরিব্যাপ্ত ধারাকে কোনো কোনো সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রস্থলে উৎসরূপে উৎসারিত করে দিতে সর্বসাধারণের স্নানের জন্য, পানের জন্য, কল্যাণের জন্য।

এই ইচ্ছাটি যে কিরকম সত্য ছিল, কিরকম উদার, কিরকম বেগবান ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই অনুষ্ঠানের মধ্যেই, এর অকৃপণ ঐশ্বর্যে। বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ বিস্ময়োচ্ছ্বাসিত ভাষায় এই বিদ্যানিকেতনের বর্ণনা করেছেন। তার লেখনীচিত্রে দেখতে পাই এর অলংকরণরেখায়িত গুপ্তিরক্ত স্তম্ভশ্রেণী, এর অভ্রভেদী হর্ম্যশিখর, ধূপসুগন্ধি মন্দির, ছায়ানিবিড়আম্রবন, নীলপদ্মে-প্রফুল্ল গভীর সরোবর। তিনটি বড়ো বড়ো বাড়িতে এখানকার গ্রন্থাগার ছিল; তাদের নাম রত্নসাগর, রত্নোদধি, রত্নরঞ্জক। রত্নোদধি নয়তলা; সেইখানে প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র এবং অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ রক্ষিত ছিল। বহু রাজা পরে পরে এই সংঘের বিস্তারসাধন করেছেন; চারি দিকে উন্নত চৈত্য উঠেছে, সেই চৈত্যগুলির মধ্যে মধ্যে শিক্ষাভবন, তর্কসভাগৃহ, প্রত্যেক সরোবরের চারি দিকে বেদী ও মন্দির; স্থানে স্থানে শিক্ষক ও প্রচারকদের জন্যে চারতলা বাসস্থান। এখানকার গৃহনির্মাণে কিরকম সযত্ন সতর্কতা সেই প্রসঙ্গে ডাক্তার স্পুনার বলেন, আধুনিক কালে যে রকমের হুঁট ও গাঁথুনি প্রচলিত এখানকার গৃহনির্মাণের উপকরণ ও যোজনাপদ্ধতি তার চেয়ে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। ইংসিঙ বলেন, এই বিদ্যালয়ের

প্রয়োজননির্বাহের জন্য দুই শতের অধিক গ্রাম উৎসর্গ করা হয়েছে; বহুসহস্র ছাত্র ও অধ্যাপকের জীবিকার উপযুক্ত ভোজ্য প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে গ্রামের অধিবাসীরা নিয়মিত জুগিয়ে থাকে।

এই বিদ্যায়তনগুলির মধ্যে, শুধু বিদ্যার সঞ্চয় মাত্র নয়, বিদ্যার গৌরব ছিল প্রতিষ্ঠিত। যে-সকল আচার্য অধ্যাপক ছিলেন, হিউয়েন সাঙ বলেন, তাঁদের যশ বহুদূরব্যাপী; তাঁদের চরিত্র পবিত্র, অনিন্দনীয়। তাঁরা সন্ধর্মের অনুশাসন অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করেন। অর্থাৎ যে বিদ্যা প্রচারের ভার ছিল তাঁদের ‘পরে সমস্ত দেশ এবং দূরদেশের ছাত্ররা তাকে সম্মান করত; সেই সম্মানকে উজ্জ্বল করে রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল তাঁদের ‘পরে-কেবল মেধা দ্বারা নয়, বহুশ্রুতের দ্বারা নয়, চরিত্রের দ্বারা, অস্থূলিত কঠোর তপস্যার দ্বারা। এটা সম্ভব হতে পেরেছিল, কেননা সমস্ত দেশের শ্রদ্ধা এই সাত্ত্বিক আদর্শ তাঁদের কাছে প্রত্যাশা করেছে। আচার্যেরা জানতেন, দূর দূর দেশকে জ্ঞানবিতরণের মহৎ ভার তাঁদের ‘পরে; সমুদ্র পার হয়ে, প্রাণপণ কঠিন দুঃখ স্বীকার করে, বিদেশের ছাত্রেরা আসছে তাঁদের কাছে জ্ঞানপিপাসায়। এইভাবে বিদ্যার ‘পরে সর্বজনীন শ্রদ্ধা থাকলে যাঁরা বিদ্যা বিতরণ করেন আপন যোগ্যতা সম্বন্ধে শৈথিল্য তাঁদের পক্ষে সহজ হয় না। সমস্ত দেশের কলাপ্রতিভাও আপন শ্রদ্ধার অর্থ্য এখানে পূর্ণ শক্তিতে নিবেদন করেছিল। সেই উপলক্ষে দেশ আপন শিল্পরচনার উৎকর্ষ এই বিদ্যামন্দিরের ভিত্তিতে ভিত্তিতে মিলিত করেছে, ঘোষণা করেছে; ভারতের কলাবিদ্যা ভারতের বিশ্ববিদ্যাকে প্রমাণ করেছে।

একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা চাই, তখনকার রাজাদের প্রাসাদভবন বা ভোগের স্থান কোনো বিশেষ সমারোহে ইতিহাসের স্মৃতিকে অধিকারচেষ্টা করেছিল, তার প্রমাণ পাই নে। এই চেষ্টা যে নিন্দনীয় তা বলি নে; কেননা সাধারণত দেশ আপন ঐশ্বর্যগৌরব প্রকাশ করবার উপলক্ষ রচনা করে আপন নৃপতিকে বেষ্টন করে, সমস্ত প্রজার আত্মসম্মান সেইখানে কলানৈপুণ্যে শোভাপ্রাচুর্যে সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যে কারণেই হোক, অতীত ভারতবর্ষের সেই চেষ্টাকে আমরা আজ দেখতে পাই নে। হয়তো রাজাসনের ধ্রুবত্ব ছিল না বলেই সেখানে ক্রমাগতই ধ্বংসধুমকেতুর সম্মার্জনী কাজ করেছে। কিন্তু নালন্দা বিক্রমশিলা প্রভৃতি স্থানে স্মৃতিরক্ষাচেষ্টার বিরাম ছিল না। তার প্রতি দেশের ভক্তি, দেশের বেদনা যে কত প্রবল ছিল এই তার একটি প্রমাণ।

আপন সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যার প্রতি সর্বজনের যে উদার শ্রদ্ধা প্রভূতত্যাগস্বীকারে অকুণ্ঠিত সেই অকৃত্রিম শ্রদ্ধাই ছিল স্বদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যথার্থ প্রাণ-উৎস।

এ কথা সহজেই কল্পনা করা যায় যে, জ্ঞানসাধনার এই-সকল বিরাট যজ্ঞভূমিতে মানুষের মনের সঙ্গে মনের কিরকম অতি বৃহৎ ও নিবিড় সংঘর্ষ চলেছিল, তাতে ধীশক্তি বহিঃশিখা কিরকম নিরন্তর প্রোজ্জ্বল হয়ে থাকত। ছাপানো টেক্সট বুক থেকে নোট দেওয়া নয়, অন্তর থেকে অন্তরে অবিশ্রাম উদ্যম সঞ্চারণ করা। বিদ্যায় বুদ্ধিতে জ্ঞানে দেশের যাঁরা সুধীশ্রেষ্ঠ দূর দূরান্তর থেকে এখানে তাঁরা সম্মিলিত। ছাত্রেরাও তীক্ষ্ণবুদ্ধি, শ্রদ্ধাবান, সুযোগ্য; দ্বারপণ্ডিতের কাছে কঠিন পরীক্ষা দিয়ে তবে তারা পেয়েছে প্রবেশের অধিকার। হিউয়েন সাঙ লিখেছেন, এই পরীক্ষায় দশ জনের মধ্যে অন্তত সাত-আট জন বর্জিত হত। অর্থাৎ তৎকালীন ম্যাট্রিকুলেশনের যে ছাঁকনি ছিল তাতে মোটা মোটা ফাঁক ছিল না। তার কারণ, সমস্ত পৃথিবীর হয়ে আদর্শকে বিশুদ্ধ ও উন্নত রাখবার দায়িত্ব ছিল জাগরুক। লোকের মনে উদ্বেগ ছিল, পাছে অযথা প্রশ্নের দ্বারা বিদ্যার অধঃপতনে দেশের পক্ষে মানসিক আত্মঘাত ঘটে। নানা প্রকৃতির মন এখানে এক জায়গায় সমবেত হত; তারা একজাতীয় নয়, একদেশীয় নয়। এক লক্ষ্য দৃঢ় রেখে এক জীবিকাব্যবস্থায় তারা পরস্পরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ঐক্য লাভ করেছিল। বিদ্যার সম্মিলনক্ষেত্রে এই ঐক্যের মূল্য যে কতকানি তাও মনে রাখা চাই। তখন পৃথিবীর আরো নানা স্থানে বড়ো বড়ো সভ্যতার উদ্ভব হয়েছিল; কিন্তু, জ্ঞানের তপস্যা-উপলক্ষে মানবমনের এমন বিশাল সমবায় আর কোথাও শোনা যায় নি। এর মূল কারণ, বিশ্বজনীন মনুষ্যত্বের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা, বিদ্যার প্রতি গৌরববোধ, চিত্তসম্পদ যাঁরা নিজে পেয়েছেন বা সৃষ্টি করেছেন সেই পাওয়ার ও সৃষ্টির পরম আনন্দে সেই সম্পদ দেশবিদেশের সকলকে দান করবার একাগ্র দায়িত্বজ্ঞান। আজ নিজের প্রতি, মানুষের প্রতি, নিজের সাধনার প্রতি, আলস্যবিজড়িত অশ্রদ্ধার দিনে বিশেষ ক'রে আমাদের মনে করবার সময় এসেছে যে, মানব-ইতিহাসে সর্বাত্মে ভারতবর্ষেই জ্ঞানের বিশ্বদানযজ্ঞ উদার দাক্ষিণ্যের সঙ্গে প্রবর্তিত হয়েছিল। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আরো-একটি কথা আমাদের মনে রাখবার যোগ্য, নালন্দায় হিউয়েন সাঙের যিনি গুরু ছিলেন তিনি ছিলেন বাঙালি, তাঁর নাম শীলভদ্র। তিনি বাংলাদেশের কোনো-এক স্থানের রাজা ছিলেন, রাজ্য ত্যাগ করে বেরিয়ে আসেন। এই সজ্জে যাঁরা শিক্ষাদান করতেন তাঁদের সকলের মধ্যে একলা কেবল ইনিই সমস্ত শাস্ত্র, সমস্ত সূত্র ব্যাখ্যা করতে পারতেন।

সেকালে বৌদ্ধভারতে সজ্জ ছিল নানা স্থানে। সেই-সকল সজ্জে সাধকেরা শাস্ত্রজ্ঞেরা তত্ত্বজ্ঞানীরা শিষ্যেরা সমবেত হয়ে জ্ঞানের আলোক জ্বালিয়ে রাখতেন, বিদ্যার পুষ্টিসাধন করতেন। নালন্দা বিক্রমশিলা তাদেরই বিশ্বরূপ, তাদেরই স্বাভাবিক পরিণতি।

উপনিষদের কালেও ভারতবর্ষে এরকম বিদ্যাকেন্দ্রের সৃষ্টি হয়েছিল, তার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। শতপথব্রাহ্মণের অন্তর্গত বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, আরুণির পুত্র শ্বেতকেতু পাঞ্চগলদেশের ‘পরিষদ’-এ জৈবালি প্রবাহণের কাছে এসেছিলেন। এই স্থানটি আলোচনা করলে বোঝা যায়, ঐ পরিষদ ঐ দেশের বড়ো বড়ো জ্ঞানীদের সমবায়ে। এই পরিষদ জয় করতে পারলে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ হত। অনুমান করা যায় যে, সমস্ত পাঞ্চগলদেশের মধ্যে উচ্চতম শিক্ষার উদ্দেশে সম্মিলিতভাবে একটা প্রতিষ্ঠান ছিল, বিদ্যার পরীক্ষা দেবার জন্যে সেখানে অন্যত্র থেকে লোক আসত। উপনিষদ-কালের বিদ্যা যে স্বভাবতই স্থানে স্থানে শিক্ষা-আলোচনা তর্কবিতর্ক ও জ্ঞানসংগ্রহের জন্যে আপন আশ্রয়রূপে পরিষদ রচনা করেছিল, তা নিশ্চিত অনুমান করা যেতে পারে।

যুরোপের ইতিহাসেও সেইরকম ঘটেছে। সেখানে খৃষ্টধর্মের আরম্ভকালে পুরাতন ধর্মের সঙ্গে নূতন ধর্মের দ্বন্দ্ব এবং নিষ্ঠুর উৎপীড়নের দ্বারা নবদীক্ষিতদের ভক্তির পরীক্ষা চলেছিল। অবশেষে ক্রমে যখন এই ধর্ম সাধারণে স্বীকৃত হল তখন স্বভাবতই পূজার ধারার পাশেপাশেই তত্ত্বের ধারা প্রবাহিত হল। বাঁধ যদি বেঁধে না দেওয়া যায় তবে ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ প্রকৃতির প্ররোচনায় ভক্তির বিষয় বিচিত্র রূপ ও বিকৃত রূপ নিতে থাকে। তখন তর্ক অবলম্বন করে বিচারের প্রয়োজন হয়। বিশ্বাস তখন বুদ্ধির সাহায্যে, জ্ঞানের সাহায্যে আপন স্থায়ী ও বিশুদ্ধ ভিত্তির সন্ধান করে। তখন তার প্রশ্ন ওঠে : কন্মে দেবায় হবিষা বিধেম। ভক্তি তখন কেবলমাত্র পূজার বিষয় না হয়ে বিদ্যার বিষয় হয়ে ওঠে। এইরকম অবস্থায় যুরোপের নানা স্থানে আচার্য ও ছাত্রদের সঙ্ঘ সৃষ্টি হচ্ছিল। তার মধ্যে থেকে নির্বাচনের দরকার হল। কোথায় শিক্ষা শ্রদ্ধেয়, কোথায় তা প্রামাণিক, তা স্থির করবার ভার নিলে রোমের প্রধান ধর্মসঙ্ঘ, তারই সঙ্গে রাজার শাসন ও উৎসাহ।

সকলেই জানেন, সে সময়কার আলোচ্য বিদ্যায় প্রধান স্থান ছিল তর্কশাস্ত্রের। তখনকার পণ্ডিতেরা জানতেন, ডায়েলেক্টিক সকল বিজ্ঞানের মূলবিজ্ঞান। এর কারণ স্পষ্টই বোঝা যায়। শাস্ত্রের উপদেশগুলি বাক্যের দ্বারা বদ্ধ। সেই-সকল আপ্তবাক্যের অবিসম্বাদিত অর্থে পৌঁছতে গেলে শাস্ত্রিক তর্কের প্রয়োজন হয়। যুরোপের মধ্যযুগে সেই তর্কের যুক্তিজাল যে কিরকম সূক্ষ্ম ও জটিল হয়ে উঠেছিল তা সকলেরই জানা আছে। শাস্ত্রজ্ঞানের বিশুদ্ধতার জন্যে এই ন্যায়শাস্ত্র। সমাজরক্ষার জন্যে আর দুটি বিদ্যার বিশেষ প্রয়োজন, আইন এবং চিকিৎসা।

তখনকার যুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয় এই কয়টি বিদ্যাকেই প্রধানত গ্রহণ করেছিল। নালন্দাতে বিশেষভাবে শিক্ষার বিষয় ছিল হেতুবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, শব্দবিদ্যা। তার সঙ্গে ছিল তন্ত্র।

ইতিমধ্যে যুরোপের মানুষের অন্তর ও বাহিরের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার যুনিভার্সিটিতে মস্ত দুটি মূলগত পরিবর্তন ঘটেছে। ধর্মশাস্ত্রের প্রতি সেখানকার মনুষ্যত্বের ঐকান্তিক যে নির্ভর ছিল সেটা ক্রমে ক্রমে শিথিল হয়ে এল। একদিন সেখানে মানুষের জ্ঞানের ক্ষেত্রের প্রায় সমস্তটা ধর্মশাস্ত্রের সম্পূর্ণ অন্তর্গত না হোক, অন্তত শাসনগত ছিল। লড়াই করতে করতে অবশেষে সেই অধিকারের কর্তৃত্বভার তার হাত থেকে স্থলিত হয়েছে। বিজ্ঞানের সঙ্গে যেখানে শাস্ত্রবাক্যের বিরোধ সেখানে শাস্ত্র আজ পরাভূত, বিজ্ঞান আজ আপন স্বতন্ত্র বেদীতে একেশ্বররূপে প্রতিষ্ঠিত। ভূগোল ইতিহাস প্রভৃতি মানুষের অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয় বৈজ্ঞানিক যুক্তিপদ্ধতির অনুগত হয়ে ধর্মশাস্ত্রের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছে। বিশ্বের সমস্ত জ্ঞাতব্য ও মন্তব্য বিষয় সম্বন্ধে মানুষের জিজ্ঞাসার প্রবণতা আজ বৈজ্ঞানিক। আগুবােক্যের মোহ তার কেটে গেছে।

এইসঙ্গে আর-একটা বড়ো পরিবর্তন ঘটেছে ভাষা নিয়ে। একদিন লাতিন ভাষাই ছিল সমস্ত যুরোপের শিক্ষার ভাষা, বিদ্যার আধার। তার সুবিধা এই ছিল, সকল দেশের ছাত্রই এক পরিবর্তনহীন সাধারণভাষার যোগে শিক্ষালাভ করতে পারত। কিন্তু তার প্রধান ক্ষতি ছিল এই যে, বিদ্যার আলোক পাণ্ডিত্যের ভিত্তিসীমা এড়িয়ে বাইরে অতি অল্পই পৌঁছত। যখন থেকে যুরোপের প্রত্যেক জাতিই আপন আপন ভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে স্বীকার করলে তখন শিক্ষা ব্যাপ্ত হল সর্বসাধারণের মধ্যে। তখন বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত দেশের চিত্তের সঙ্গে অন্তরঙ্গরূপে যুক্ত হল। শুনতে কথাটা স্বতোবিরুদ্ধ, কিন্তু সেই ভাষাস্বাতন্ত্র্যের সময় থেকেই সমস্ত যুরোপে বিদ্যার যথার্থ সমবায়সাধন হয়েছে। এই স্বাতন্ত্র্য যুরোপের চিত্তপ্রকর্ষকে খণ্ডিত না করে আশ্চর্যরূপে সম্মিলিত করেছে। যুরোপে এই স্বদেশী ভাষার বিদ্যার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে তার জ্ঞানের ঐশ্বর্য বেড়ে উঠল, ব্যাপ্ত হল সমস্ত প্রজার মধ্যে, যুক্ত হল প্রতিবেশী ও দূরবাসীদের জ্ঞানসাধনার সঙ্গে, স্বতন্ত্র ক্ষেত্রের সমস্ত শস্য সংগৃহীত হল যুরোপের সাধারণ ভাণ্ডারে। এখন সেখানে যুনিভার্সিটি যেমন-উদারভাবে সকল দেশের তেমনি একান্তভাবে আপন দেশের। এইটিই হচ্ছে মানুষের প্রকৃতির অনুগত। কারণ, মানুষ যদি সত্যভাবে নিজেকে উপলব্ধি না করে তা হলে সত্যভাবে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারে না। বিশ্বজনীনতার দাক্ষিণ্য বাস্তব হতে

পারে না সেইসঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উৎকর্ষ যদি বাস্তব না হয়। এশিয়ার মধ্যযুগে বৌদ্ধধর্মকে তিব্বত চীন মঙ্গোলিয়া গ্রহণ করেছিল, কিন্তু গ্রহণ করেছিল নিজের ভাষাতেই। এইজন্যেই সে-সকল দেশে সে ধর্ম সর্বজনের অন্তরের সামগ্রী হতে পেরেছে, এক-একটি সমগ্রজাতিকে মানুষ করেছে, তাকে মোহান্ধকার থেকে উদ্ধার করেছে।

যুনিভার্সিটির উৎপত্তি সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নেই। আমার বলবার মোট কথাটি এই যে, বিশেষ দেশ, বিশেষ জাতি যে বিদ্যার সম্বন্ধে বিশেষ প্রীতি গৌরব ও দায়িত্ব অনুভব করেছে তাকেই রক্ষা ও প্রচারের জন্যে স্বভাবতই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সৃষ্টি। যে ইচ্ছা সকল সৃষ্টির মূলে, সমস্ত দেশের সেই ইচ্ছাশক্তির থেকেই তার উদ্ভব। এই ইচ্ছার মূলে থাকে শক্তির ঐশ্বর্য। সেই ঐশ্বর্য দাক্ষিণ্য দ্বারা নিজেকে স্বতই প্রকাশ করতে চায়; তাকে নিবারণ করা যায় না।

সমস্ত সভ্যদেশ আপন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে জ্ঞানের অব্যবহিত আতিথ্য করে থাকে। যার সম্পদে উদ্ভূত আছে সেই ডাকে অতিথিকে। গৃহস্থ আপন অতিথিশালায় বিশ্বকে স্বীকার করে। নালন্দায় ভারত আপন জ্ঞানের অল্পসত্র খুলেছিল স্বদেশ-বিদেশের সকল অভ্যাগতের জন্য। ভারত সেদিন অনুভব করেছিল, তার এমন সম্পদ পর্যাণ্ড পরিমাণে আছে সকল মানুষকে দিতে পারলে তবেই যার চরম সার্থকতা। পাশ্চাত্য মহাদেশের অধিকাংশ দেশেই বিদ্যার এই অতিথিশালা বর্তমান। সেখানে স্বদেশী-বিদেশীর ভেদ নেই। সেখানে জ্ঞানের বিশ্বক্ষেত্রে সব মানুষই পরস্পর আপন। সমাজের আর-আর প্রায় সকল অংশেই ভেদের প্রাচীর প্রতিদিন দুর্লভ্য হয়ে উঠেছে : কেবল মানুষের আমন্ত্রণ রইল জ্ঞানের এই মহাতীর্থে। কেননা এইখানে দৈন্যস্বীকার, এইখানে কৃপণতা, ভদ্রজাতির পক্ষে সকলের চেয়ে আত্মলাঘব। সৌভাগ্যবান দেশের প্রাঙ্গণ এইখানে বিশ্বের দিকে উন্মুক্ত।

আমাদের দেশে যুনিভার্সিটির পত্তন হল বাহিরের দানের থেকে। সে দানে দাক্ষিণ্য অধিক নেই। তার রাজানুচিত কৃপণতা থেকে আজ পর্যন্ত দুঃখ পাচ্ছি। ইংরেজের দেশে রাজদ্বারে যে অতিথিশালা খোলা আছে লণ্ডন যুনিভার্সিটিতে, এ দেশের দরিদ্রপাড়ায় তারই একটা ছোটো শাখা স্থাপন হল। ভারতীয় বিদ্যা বলে কোনো-একটি পদার্থ যে কোথাও আছে এই বিদ্যালয়ে গোড়াতেই তাকে অস্বীকার করা হয়েছে। এর স্বভাবটা পৃথিবীর সকল যুনিভার্সিটির একেবারে বিপরীত। এর দানের বিভাগ অবরুদ্ধ, কেবল গ্রহণের বিভাগ আপন ক্ষুধিত কবল উদঘাটিত

করে আছে। তাতে গ্রহণের কাজও ঠিকমত ঘটে না। কেননা, যেখানে দেওয়া-নেওয়া চলাচল নেই সেখানে পাওয়াটাই থাকে অসম্পূর্ণ।

আধুনিককালে জীবনযাত্রা সকল দিকেই জটিল। নূতন নূতন নানা সমস্যার আলোড়নে মানুষের মন সর্বদাই উৎক্ষুব্ধ। নিয়ত তার নানা প্রশ্নের নানা উত্তর, তার নানা বেদনার নানা প্রকাশ সমাজে তরঙ্গিত, সাহিত্যে বিচিত্র ভঙ্গিতে আবর্তিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা যুগের ধ্রুব আদর্শগুলি যেমন মনের সামনে বিধৃত, সঞ্চিত, তেমনি প্রচলিত সাহিত্যে প্রকাশ পাচ্ছে প্রবহমান চিন্তের লীলাচঞ্চল্য। পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বাহিরের এই চিন্তামথনের সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন নয়। মানুষের শিক্ষার এই দুই ধারা সেখানে গঙ্গাযমুনার মতো মেলে। কেননা সেখানে সমস্ত দেশের একই চিত্র তার বিদ্যাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে সৃষ্টি করে তুলছে, পৃথিবীর সৃষ্টিকার্য যেমন জলে স্থলে উভয়তই সক্রিয়।

এ সংবাদ বোধ হয় সকলেই জানেন যে, বর্তমান কালের সঙ্গে পদক্ষেপ মিলিয়ে চলবার জন্যে ইংলণ্ডের যুনিভার্সিটিগুলিতে সম্প্রতি বিশেষভাবে আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা প্রবৃত্ত। গত যুরোপীয় যুদ্ধের পরে অক্সফোর্ডে দর্শন রাষ্ট্রতত্ত্ব অর্থনীতির আধুনিক ধারার চর্চা স্বীকার করা হয়েছে। চারি দিকে কী ঘটছে, সমাজ কোন্ দিকে চলেছে, সেইটে যারা ভালো করে জানতে চায় তাদের সাহায্য করবার জন্যে যুনিভার্সিটির এই উদ্যোগ। ম্যাঞ্চেস্টার যুনিভার্সিটি আধুনিক অর্থতত্ত্ব এবং আধুনিক ইতিহাসের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ করছে। বর্তমান কালের চিন্তাদ্বন্দ্ব ও কর্মসংঘাতের দিনে এইরূপ শিক্ষার ফলে ছাত্র ও ছাত্রীরা উপযুক্তভাবে আপন কর্তব্য ও জীবনযাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে পারে।

আমাদের দেশে বিদেশ-থেকে-পাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে দেশের মনের এরকম সম্মিলন ঘটতে পারে নি। তা ছাড়া যুরোপীয় বিদ্যাও এখানে বদ্ধজলের মতো, তার চলৎ রূপ আমরা দেখতে পাই নে। যে-সকল প্রবীণ মত আসন্ন পরিবর্তনের মুখে, আমাদের সম্মুখে তারা স্থির থাকে ধ্রুবসিদ্ধান্তরূপে। সনাতনত্বমুগ্ধ আমাদের মন তাদের ফুলচন্দন দিয়ে পূজা করে থাকে। যুরোপীয় বিদ্যাকে আমরা স্থাবরভাবে পাই এবং তার থেকে বাচ্য চয়ন করে আবৃত্তি করাকেই আধুনিক রীতির বৈদগ্ধ্য বলে জানি, এই কারণে তার সম্বন্ধে নূতন চিন্তার সাহস আমাদের থাকে না। দেশের জনসাধারণের সমস্ত দুরূহ প্রশ্ন, গুরুতর প্রয়োজন, কঠোর বেদনা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিচ্ছিন্ন। এখানে দূরের বিদ্যাকে আমরা আয়ত্ত করি জড় পদার্থের

মতো বিশ্লেষণের দ্বারা, সমগ্র উপলব্ধির দ্বারা নয়। আমরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে বাক্য মুখস্থ করি এবং সেই টুকরো-করা মুখস্থবিদ্যার পরীক্ষা দিয়ে নিষ্কৃতি পাই। টেক্সটবুক-সংলগ্ন আমাদের মন পরাশ্রিত প্রাণীর মতো নিজের খাদ্য নিজে সংগ্রহ করবার, নিজে উদ্ভাবন করবার শক্তি হারিয়েছে।

ইংরেজি ভাষা আমাদের প্রয়োজনের ভাষা, এইজন্যে সমস্ত শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে এই বিদেশী ভাষার প্রতি আমাদের লোভ; সে প্রেমিকের প্রীতি নয়, কৃপণের আসক্তি। ইংরেজি সাহিত্য পড়ি, প্রধান লক্ষ্য থাকে ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করা। অর্থাৎ ফুলের কীটের মতো আমাদের মন, মধুকরের মতো নয়। মুষ্টিভিক্ষায় যে দান সংগ্রহ করি ফর্দ ধরে তার পরীক্ষা দিয়ে থাকি। সে পরীক্ষায় পরিমাণের হিসাব দেওয়া; সেই পরিমাণগত পরীক্ষার তাগিদ শিক্ষা করতে হয় ওজনদরে। বিদ্যাকে চিত্তের সম্পদ বলে গ্রহণ করা অনাবশ্যক হয় যদি তাকে বাহ্যবস্তুরূপে বহন করি। এরকম বিদ্যার দানেও গৌরব নেই, গ্রহণেও না। এমন দৈন্যের অবস্থাতেও কখনো কখনো এমন শিক্ষক মেলে শিক্ষাদান যাঁর স্বভাবসিদ্ধ। তিনি নিজগুণেই জ্ঞান দান করেন, নিজের অন্তর থেকে শিক্ষাকে অন্তরের সামগ্রী করেন, তাঁর অনুপ্রেরণায় ছাত্রদের মনে মননশক্তির সঞ্চার হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে বিশ্বক্ষেে আপন বিদ্যাকে ফলবান করে কৃতি ছাত্রেরা তার সত্যতার প্রমাণ দেয়।

যে বিশ্ববিদ্যালয় সত্য সে এইরকম শিক্ষককে আকর্ষণ করে; শিক্ষার সাহায্যে সেখান মনোলোকে সৃষ্টিকার্য চলে, এই সৃষ্টিই সকল সভ্যতার মূলে। কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনতরো যথার্থ শিক্ষক না হলেও চলে। হয়তো-বা ভালোই চলে। কেননা এখানকার পরীক্ষাপদ্ধতিতে যে ফলের প্রতি দৃষ্টি সে আহরণ-করা ফল, ফলন-করা ফল নয়। দৈন্যের নিষ্ঠুর তাগিদে এমনতরো শিক্ষার প্রতি দেশের লোভ আছে, কিন্তু ভক্তি নেই। তাই শিক্ষক ও ছাত্রদের উদ্যমকে পরিপূর্ণমাত্রায় সতর্ক করে রাখবার প্রয়োজন হয় না। কেননা, দেশের প্রত্যাশা উচ্চ নয়; বাজার-দরের হিসাব করে যে পরীক্ষার মার্কা সে চায় সত্যের নিকষে তার মূল্য অতি সামান্য। এইজন্য দুর্মূল্য বিদ্যাকে সম্পূর্ণ সত্য করে তোলবার মতো শ্রদ্ধা রক্ষা করা এত কঠিন; তাই শৈথিল্য তার মজ্জায় প্রবেশ করেছে।

অভাব থেকে বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত অন্যত্র আছে। যেমন জাপানে। জাপান যখন স্পষ্ট বুঝলে যে, আধুনিক যুরোপ আজ যে বিদ্যার প্রভাবে বিশ্ববিজয়ী তাকে আয়ত্ত করতে না পারলে সকল দিকেই পরাভব সুনিশ্চিত তখন জাপান প্রাণপণ আকাজক্ষার বেগে আপন

সদ্যপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই যুরোপীয় বিদ্যার পীঠস্থান রচনা করলে। বিদ্যাসাধনায় আধুনিক মানব-সমাজে তার লেশমাত্র অগৌরব না ঘটে এই তার একান্ত স্পর্ধা। সুতরাং সমস্ত জাতির শিক্ষাদানকার্যে সিদ্ধির আদর্শকে খাটো করে নিজেকে বঞ্চনা করার কথা তার মনেও আসতে পারে না। আমাদের দেশে বিদ্যায় সফলতার কৃত্রিম আদর্শ অনেকটা পরিমাণে পরের হাতে। বিদেশী মনিবেরা ন্যূন পরিমাণে কতটুকু হলে তাঁদের আশু প্রয়োজনের হিসাবে সন্তুষ্ট হন তার একটা ওজন বুঝে নিয়েছিলুম। প্রথম থেকেই প্রধানত এইজন্যই বিদ্যার আন্তরিক আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা আমাদের হ্রাস হয়ে এসেছে।

জাপানে বিদ্যাকে সত্য করে তোলবার ইচ্ছার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন স্বদেশী ভাষাকে সে আপন শিক্ষার ভাষা করতে বিলম্ব করলে না। সর্বজনের ভাষার ভিতর দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্বজনের করে তুললে; শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে চিত্তপ্রসারের পথ অবাধ প্রশস্ত হয়ে উঠল। তাই আজ সেখানে সমস্ত দেশে বুদ্ধির জ্যোতি অব্যাহতভাবে দীপ্যমান।

আমাদের দেশে মাতৃভাষায় একদা যখন শিক্ষার আসন প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রস্তাব ওঠে তখন অধিকাংশ ইংরেজি-জানা বিদ্বান আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। সমস্ত দেশের সামান্য যে-কয়জন লোক ইংরেজি ভাষাটাকে কোনোমতে ব্যবহার করবার সুযোগ পাচ্ছে তাদের ভাগে উক্ত ভাষার অধিকারে পাছে লেশমাত্র কমতি ঘটে এই ছিল তাঁদের ভয়। হায় রে, দরিদ্রের আকাজক্ষাও দরিদ্র!

এ কথা মানতে হবে, জাপান স্বাধীন দেশ; সেখানকার লোক বিদ্যার যে মূল্য স্থির করেছে সে মূল্য পুরো পরিমাণে মিটিয়ে দিতে কৃপণতা করে নি। আর, হতভাগা আমরা পুলিশ ও ফৌজ-বিভাগের ভুরিভোজনের ভুক্তশেষ রাজস্বের উচ্ছিষ্টকণা খুঁটে তারই দামে বিদ্যার ঠাট কোনোমতে বজায় রাখছি ফাঁকা মাল-মসলায়। আমাদের কাঁথার ছিদ্র ঢাকতে হয় ছেঁড়া কাপড়ের তালি দিয়ে। তাতে গৌরব নেই; কেবল কিছু পরিমাণে লজ্জা-নিবারণ ঘটে, লোকদেখানো মান রক্ষা হয়, জীর্ণতা সত্ত্বেও আবরণটা থাকে।

এটা সত্য কথা। কিন্তু আক্ষেপ করে যখন কোনোই ফল নেই তখন এর দোহাই দিয়ে নিজের চেষ্টাকে খর্ব করলে চলবে না; তুফান উঠেছে বলেই হাল আরো শক্ত করেই ধরতে হবে। যে বিদ্যাকে এতদিন আমরা বিদেশের নিলামে সস্তায়-কেনা ভাঙা বেঞ্চিতে বসিয়ে রেখেছি তাকে স্বদেশের চিত্তবেদীতে সমাদরে বসাতেই হবে। বিশ্ববিদ্যালয়কে যখন যথার্থভাবে

স্বদেশের সম্পদ করে তুলতে পারব তখন সমস্ত দেশের অন্তরের এই দাবি তার কাছে সার্থক হবে : শ্রদ্ধা দেয়ম্। দান করা চাই শ্রদ্ধার সঙ্গে। সেই শ্রদ্ধার অল্প প্রাণের সঙ্গে মেলে, প্রাণশক্তিকে জাগিয়ে তোলে।

অনেক দিন থেকে ইংরেজি বিদ্যার খাঁচা স্থাবরভাবে আমাদের দেশে রাজবাড়ির দেউড়িতে রক্ষিত ছিল। এর দরজা খুলে দিয়ে দেশের চিত্তশক্তির জন্য যে নীড় নির্মাণ করতে হবে সব-প্রথমে আশুতোষ সে কথা বুঝেছিলেন। প্রবল বলে এই জড়ত্বকে বিচলিত করবার সাহস তাঁর ছিল। সনাতনপন্থীদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের চিরাচরিত প্রথার মধ্যে বাংলাকে স্থান দেবার প্রস্তাব প্রথমে তাঁর মনে উঠেছিল ভীৰু এবং লোভীদের নানা তর্কের বিরুদ্ধে। বাংলাভাষা আজও সম্পূর্ণরূপে শিক্ষার ভাষা হবার মতো পাকা হয়ে ওঠেনি সে কথা সত্য। কিন্তু আশুতোষ জানতেন যে না হবার কারণ তার নিজের শক্তিদৈন্যের মধ্যে নেই, সে আছে তার অবস্থাদৈন্যের মধ্যে। তাকে শ্রদ্ধা ক'রে সাহস ক'রে শিক্ষার আসন দিলে তবেই সে আপন আসনের উপযুক্ত হয়ে উঠবে। আর, তা যদি একান্তই অসম্ভব বলে গণ্য করি তবে বিশ্ববিদ্যালয় চিরদিনই বিলেতের-আমদানি টবের গাছ হয়ে থাকবে; সে টব মূল্যবান হতে পারে, অলংকৃত হতে পারে, কিন্তু গাছকে সে চিরদিন পৃথক করে রাখবে ভারতবর্ষের মাটি থেকে; বিশ্ববিদ্যালয় দেশের শখের জিনিস হবে, প্রাণের জিনিস হবে না।

তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অগৌরব ঘোচাবার জন্যে পরীক্ষার শেষ দেউড়ি পার ক'রে দিয়ে আশুতোষ এখানে গবেষণাবিভাগ স্থাপন করেছিলেন-বিদ্যার ফসল শুধু জমানো নয়, বিদ্যার ফসল ফলানোর বিভাগ। লোকের অভাব, অর্থের অভাব, স্বজন-পরজনের প্রতিকূলতা, কিছুই তিনি গ্রাহ্য করেন নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আত্মশ্রদ্ধার প্রবর্তন হয়েছে এইখানেই। তার প্রধান কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়কে আশুতোষ আপন করে দেখতে পেরেছিলেন, সেই অভিমানেই এই বিদ্যালয়কে তিনি সমস্ত দেশের আপন করে তোলবার ভরসা করতে পারলেন।

দেশের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে মোটা বেড়াটা উঁচু করে তোলা ছিল তার মধ্যে অবকাশ রচনা করতে তিনি প্রবৃত্ত ছিলেন। সেই প্রবেশপথ দিয়েই আমার মতো লোকের আজ এইখানে অকুণ্ঠিত মনে উপস্থিত হওয়া সম্ভবপর হয়েছে। আমার মহৎ সৌভাগ্য এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বদেশী ভাষায় দীক্ষিত করে নেবার পুণ্য অনুষ্ঠানে আমারও কিছু হাত রইল, অন্তত নামটা রয়ে গেল। আমি মনে করি যে, স্বদেশের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলনসেতুরূপেই আমাকে আহ্বান

করা হয়েছে। স্বদেশী ভাষায় চিরজীবন আমি যে সাধনা করে এসেছি সেই সাধনাকে সম্মান দেবার জন্যেই বিশ্ববিদ্যালয় আজ তাঁর সভায় আমাকে আসন দিলেন। দুই কালের সন্ধিহলে আমাকে রাখলেন একটি চিহ্নের মতো। দেখলেম যথারীতি আমাকে পদবী দেওয়া হয়েছে, অধ্যাপক। এ পদবীতে যথেষ্ট সম্মান আছে, কিন্তু আমার পক্ষে এটা অসংগত। এর দায়িত্ব আছে, সেও আমার পক্ষে গ্রহণ করা অসম্ভব। সাহিত্যের প্রত্নতত্ত্ব, তার শব্দের উৎপত্তি ও বিশ্লিষ্ট উপাদান, অর্থাৎ সাহিত্যের নাড়ীনক্ষত্র আমার অভিজ্ঞতার বহির্ভূত। আমি অনুশীলন করেছি তার অখণ্ড রূপ, তার গতি, তার ভঙ্গি, তার ইঙ্গিত।

তখন আমার বয়স সতেরো, ইংরেজিভাষার জটিল গহনে আলো-আঁধারে কোনোমতে হাৎড়ে চলতে পারি মাত্র। সেই সময়ে লণ্ডন যুনিভার্সিটিতে মাস-তিনেকের জন্যে সাহিত্যের ক্লাসে ছাত্র ছিলাম। আমাদের অধ্যাপক ছিলেন শুভ্রকেশ সৌম্যমূর্তি হেনরি মর্লি। সাহিত্য তিনি পড়াতেন তার অন্তরতর রসটুকু দেবার জন্যে। শেক্সপিয়রের কোরায়েলেনস, টমাস ব্রাউনের বেরিয়ল আরন্ এবং মিল্টনের প্যারাডাইস রিগেন্ড আমাদের পাঠ্য ছিল। নোট প্রভৃতির সাহায্যে বইগুলি নিজে পড়ে আসতুন তার অর্থ গ্রহণের জন্যে। অধ্যাপক ক্লাসে বসে মূর্তিমান নোট-বইয়ের কাজ করতেন না। যে কাব্য পড়াতেন তার ছবিটি পাওয়া যেত তাঁর মুখে মুখে, আবৃত্তি করে যেতেন তিনি অতি সরসভাবে, যেটি শব্দার্থের চেয়ে অনেক বেশি, অনেক গভীর সেটি পাওয়া যেত তাঁর কণ্ঠ থেকে। মাঝে মাঝে দুরূহ জায়গায় দ্রুত বুঝিয়ে যেতেন, পঠনধারার ব্যাঘাত করতেন না। রচনাশক্তির উৎকর্ষসাধন সাহিত্যশিক্ষার আর-একটি আনুষঙ্গিক লক্ষ্য। এই দায়িত্বও তাঁর ছিল। ভাষাশিক্ষা সাহিত্যশিক্ষার কাজ মুখ্যত ভাষাতত্ত্ব দিয়ে নয়, সাহিত্যের প্রত্নতত্ত্ব দিয়ে নয়, রসের পরিচয় দিয়ে ও রচনায় ভাষার ব্যবহার দিয়ে। যেমন আর্টশিক্ষার কাজ আর্কিয়লজি আইকনোগ্রাফি দিয়ে নয়, আর্টেরই আন্তরিক রসস্বরূপের ব্যাখ্যা দিয়ে। সপ্তাহে একদিন তিনি সমগ্রভাবে ছাত্রদের প্রদত্ত রচনার ব্যাখ্যা করতেন; তার পদচ্ছেদ, প্যারাগ্রাফবিভাগ, শব্দপ্রয়োগের সূক্ষ্ম ত্রুটি বা শোভনতা, সমস্তই তাঁর আলোচ্য ছিল। সাহিত্য ও ভাষার স্বরূপবোধ, তার আঙ্গিকের অর্থাৎ টেকনিকের পরিচয় ও চর্চাই সাহিত্যশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য, এই কথাটিই তাঁর ক্লাস থেকে জেনেছিলাম।

বয়স যদি পর্যবসিতপ্রায় না হত আর যদি আমার কর্তব্য হত ক্লাসে সাহিত্যশিক্ষকতা করা, তবে এই আদর্শ-অনুসারেই কাজ করবার চেষ্টা করতুম। সম্ভবত আমার পক্ষে তার পরিণাম

শোকাবহ হত। কর্তৃপক্ষ এবং ছাত্রেরা কেউ দীর্ঘকাল আমাকে সহ্য করতেন না। সেই সম্ভবপর সংকট কাটিয়ে এসেছি।

আজ আমার শেষ বয়সে আমার কাছ থেকে কোনো রীতিমত কর্মপদ্ধতির প্রত্যাশা করা ধর্মবিরুদ্ধ, তাতে প্রত্যবায় আছে। আমার ক্লান্ত জীবনের সায়াহ্নকালে আমাকে বাংলা-অধ্যাপকের সুলভ সংস্করণরূপে চালাতে গেলে তাতে কাজেরও ক্ষতি হবে। আমার পক্ষেও সেটা স্বাস্থ্যকর হবে না। আমি এই জানি যে, আজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বঙ্গবাণী-বীণাপাণির মন্দিরদ্বারে বরণ করে নেবার ভার আমার 'পরে'। সেই কথা মনে রেখে আমি তাকে অভিনন্দিত করি। এই কামনা করি যে, যখন ধূমমলিন নিশীথ-প্রদীপের নির্বাপনের ক্ষণ এল তখন বঙ্গদেশের চিত্তাকাশে নবসূর্যোদয়ের প্রত্যুষকে যথার্থ স্বদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয় যেন ভৈরবরাগে ঘোষণা করে, এবং বাংলার প্রতিভাকে নব নব সৃষ্টির পথ দিয়ে অক্ষয় কীর্তিলোকে উত্তীর্ণ করে দেয়।

শিক্ষার বিকিরণ

ভোজ্য জিনিসে ভাণ্ডার উঠল ভরে, রান্নাঘরে হাঁড়ি চড়েছে, তবু ভোজ বলে না তাকে। আঙিনায় পাত পড়ল কত, ডাকা হয়েছে কতজনকে, সেই হিসাবেই ভোজের মর্যাদা। আমরা যে এডুকেশন শব্দটা আবৃত্তি করে মনে মনে খুশি থাকি সেটাতে ভাঁড়ার-ঘরের চেহারা আছে, কিন্তু বাইরে তাকিয়ে দেখি ধূ ধূ করছে আঙিনা। শিক্ষার আলোর জন্য উঁচু লণ্ঠন ঝোলানো হয়েছে ইস্কুলে কলেজে, কিন্তু সেটা যদি রুদ্ধ দেয়ালে বন্দী আলোক হয় তা হলে বলব আমাদের অদৃষ্ট মন্দ। সমস্ত-পট-জোড়া ভূমিকার মধ্যেই ছবির প্রকাশ, তেমনি পরিস্ফুটতা পাবার জন্যে শিক্ষা চায় দেশজোড়া ভূমিকা। ব্যাপক-ভূমিকা-ভ্রষ্ট শিক্ষা কতই অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ, কেবল অভ্যাসবশতই তার দৈন্যের বেদনা আমাদের মন থেকে মরে গিয়েছে। এডুকেশন নিয়ে অন্য দেশের সঙ্গে স্বদেশের যখন তুলনা করি তখন দৃশ্য অংশটাই লক্ষ করি, অদৃশ্য অংশের হিসাব রাখি নে। মিলিয়ে দেখি যুনিভার্সিটি সেখানেও আছে, আমাদের দেশেও তার প্রতিরূপ দুটো-একটা দেখা দিচ্ছে। ভুলে যাই এমন কোনো ভাগ্যবান দেশ নেই যেখানে বাঁধা শিক্ষালয়ের বাইরে সমস্ত সমাজ জুড়ে আবান্ধা শিক্ষার একটা দিগন্তবিকীর্ণ বৃহত্তর পরিধি না আছে।

এক কালে আমাদের দেশেও ছিল। যুরোপের মধ্যযুগের মতো আমাদের দেশে শাস্ত্রিক শিক্ষাই ছিল প্রধান। এই শিক্ষার বিশেষ চর্চা টোলে, চতুষ্পাঠিতে, কিন্তু সমস্ত দেশেই বিস্তীর্ণ ছিল বিদ্যার ভূমিকা। বিশিষ্ট জ্ঞানের সঙ্গে সাধারণ জ্ঞানের নিত্যই ছিল চলাচল। ওয়েসিসের সঙ্গে মরুভূমির যে বৈপরীত্যের সম্বন্ধ তেমন ছিল না পণ্ডিতমণ্ডলীর সঙ্গে অপণ্ডিত লোকালয়ের। দেশে এমন অনাদৃত অংশ ছিল না। যেখানে রামায়ণ মহাভারত পুরাণকথা ধর্মব্যাখ্যা নানা প্রণালী বেয়ে প্রতিনিয়ত ছড়িয়ে না পড়ত। এমন-কি, যে-সকল তত্ত্বজ্ঞান দর্শনশাস্ত্রে কঠোর অধ্যবসায়ে আলোচিত তারও সেচন চলেছিল সর্বক্ষণ জনসাধারণের চিত্তভূমিতে। গাছের খাদ্য যথেষ্ট-পরিমাণ জল দিয়ে তরল হলে তবেই গাছ তাকে শাখায় প্রশাখায় গ্রহণ করতে পারে, তেমনি করেই সেদিন কঠিন বিদ্যাকে রসে বিগলিত করে সর্বজনের মনে সঞ্চারিত করা হয়েছে। যে সময়ে আমাদের দেশে পূর্তকর্ম ধর্মের অঙ্গ ছিল তখন গ্রামে গ্রামে জলাশয়ের আয়োজন স্বতই ছিল বিস্তৃত, সর্বজনে মিলে আপনিই আপনার তৃষ্ণার জল জুগিয়েছে; রাজপরিষদের কোনো ব্যয়কুষ্ঠ আমলা-সেরেস্তায় জলের জন্য মাথা খুঁড়তে হয় নি। তেমনি করেই সমাজ দেশের বিদ্যা আপনিই দেশময় বিতরণ করেছে। না যদি করত তবে সমস্ত দেশ আজ বর্বরতায় কালো কর্কশ হয়ে উঠত। বিদ্যা তখন বিদ্বানের সম্পত্তি ছিল না, সে ছিল সমস্ত সমাজের সম্পদ।

যেখানে খবরের কাগজেরও পত্রমর্মর শোনা যায় না এমন একটি সামান্য গ্রামে চামিরা একদিন আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল। সেখানে প্রায় সকলেই মুসলমান। আমার অভ্যর্থনা উপলক্ষে চলছিল একটা গানের পালা। চাঁদোয়ার তলায় কেরোসিন-লণ্ঠন জ্বলছে, মাটির উপর ছেলে বুড়ো সকলেই বসে আছে স্তব্ধ হয়ে। যাত্রাগানের প্রধান বিষয়টা গুরু-শিষ্যের মধ্যে তত্ত্বালোচনা-দেহতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, মুক্তি তত্ত্ব। থেকে থেকে তারই সঙ্গে নাচ গান কৌতুকের দ্রুতমুখরিত ঝংকার। এই পালার একটি বিশেষ অংশ আজও আমার মনে আছে। কথাটা এই, যাত্রী প্রবেশ করতে চলেছে বৃন্দাবনে, পাহারাওয়ালা আটক করলে তার পথ; বললে, ‘তুমি চোর, ভিতরে তোমাকে যেতে দেওয়া হবে না।’ যাত্রী বললে, ‘সে কী কথা, কোথায় দেখলে আমার চোরাই মাল।’ দ্বারী, বললে, ‘ঐ-যে তোমার কাপড়ের নীচে লুকোনো, ঐ-যে তোমার আপনি, ওটা ষোলো-আনা আমার রাজার পাওনা, ফাঁকি দিয়ে রেখেছ নিজেরই জিম্মায়।’ এই বলতে বলতে মহা ঢাক ঢোল বেজে উঠল, চলল পরচুলো ঝাঁকানি দিয়ে ঘন ঘন নাচ। যেন ঐখানটা পাঠের প্রধান অংশ, অধ্যাপকমশায় পেন্সিলের মোটা দাগ ডবল করে টেনে দিলেন। রাত এগোতে লাগল, দুপুর পেরিয়ে একটা বাজে, শ্রোতারা স্থির হয়ে বসে শুনছে। সব কথা

স্পষ্ট বুঝুক বা না বুঝুক, এমন একটা-কিছুর স্বাদ পাচ্ছে যেটা প্রতিদিনের নীরস তুচ্ছতা ভেদ করে পথ খুলে দিলে চিরন্তনের দিকে।

এমনি কতকাল চলছে দেশে; বারবার বিচিত্র রসের যোগে লোকে শুনেছে ধ্রুব-প্রহ্লাদের কথা, সীতার বনবাস, কর্ণের কবচদান, হরিশ্চন্দ্রের সর্বস্বত্যাগ। তখন দুঃখ ছিল অনেক, অবিচার ছিল, জীবনযাত্রার অনিশ্চয়তা ছিল পদে পদে, কিন্তু সেইসঙ্গে এমন একটি শিক্ষার প্রবাহ ছিল যাতে করে ভাগ্যের বিমুখতার মধ্যে মানুষকে তার আন্তরিক সম্পদের অব্যাহত পথ দেখিয়েছে, মানুষের যে শ্রেষ্ঠতাকে অবস্থার হীনতায় হেয় করতে পারে না তার পরিচয়কে উজ্জ্বল করেছে। আর যাই হোক, আমেরিকান টকির দ্বারা এ কাজটা হয় না।

অন্য সকল দেশে আবশ্যিক শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছে অল্পদিন হল। আমাদের দেশে যে জনশিক্ষা তাকে আবশ্যিক বলব না, তাকে বলব স্বৈচ্ছিক। সে অনেক কালের। তার পশ্চাতে কোনো আইন ছিল না, তাগিদ ছিল না; তার স্বতঃস্ফূর্ত ছিল ঘরে ঘরে যেমন রক্তচলাচল হয় সর্বদেহে।

তার পরে সময়ের পরিবর্তন হল। ইতিমধ্যে শিক্ষিতসমাজ যখন রাজদ্বারের দিকে মুখ ফিরিয়ে মন্ত্রিসভায় প্রবেশাধিকারের আবেদন কখনো-বা করণকণ্ঠে কখনো-বা কৃত্রিম আক্রোশে পেশ করছিলেন তখন তাঁদের পিছনের দিকে গ্রামে গ্রামে পিপাসার জল এল পাঁকের কাছে নেমে, এ দিকে শহরে শহরে দ্বারে দ্বারে ঝরতে লাগল কলের জল। আমরা বিস্মিত হয়ে বললেম, একেই বলে উন্নতি। দেশের যেটা বৃহৎরূপ সেটা লুকোল আমাদের আগোচরে, যে প্রাণ যে আলো দেশের সর্বত্র বিকীর্ণ ছিল সেটা প্রতिसংহত হল ছোটো ছোটো কেন্দ্রে।

এ কালে যাকে আমরা এডুকেশন বলি তার আরম্ভ শহরে। তার পিছনে ব্যাবসা ও চাকরি চলেছে আনুষঙ্গিক হয়ে। এই বিদেশী শিক্ষাবিধি রেলকামরার দীপের মতো। কামরাটা উজ্জ্বল, কিন্তু যে যোজন যোজন পথ গাড়ি চলেছে ছুটে সেটা অন্ধকারে লুপ্ত। কারখানার গাড়িটাই যেন সত্য, আর প্রাণবেদনায় পূর্ণ সমস্ত দেশটাই যেন অবাস্তব।

শহরবাসী একদল মানুষ এই সুযোগে শিক্ষা পেলে মান পেলে, অর্থ পেলে, তারাই হল এন্লাইটেন্ড্, আলোকিত। সেই আলোর পিছনে বাকি দেশটাতে লাগল পূর্ণ গ্রহণ। ইস্কুলের বেঞ্চিতে বসে যাঁরা ইংরেজি পড়া মুখস্থ করলেন শিক্ষাদীপ্ত দৃষ্টির অন্ধতায় তাঁরা দেশ বলতে বুঝলেন শিক্ষিতসমাজ, ময়ূর বলতে বুঝলেন তার পেখমটা, হাতি বলতে তার গজদন্ত। সেই

দিন থেকে জলকষ্ট বলো, পথকষ্ট বলো, রোগ বলো, অজ্ঞান বলো, জমে উঠল কাংস্যবাদ্যমন্দির নাট্যমঞ্চের নেপথ্যে নিরানন্দ নিরালোক গ্রামে গ্রামে। নগরী হল সুজলা, সুফলা, টানাপাখা-শীতলা; সেইখানেই মাথা তুললে আরোগ্যনিকেতন, শিক্ষার প্রাসাদ। দেশের বুকে এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে এত বড়ো বিচ্ছেদের ছুরি আর-কোনোদিন চালানো হয় নি, সে কথা মনে রাখতে হবে। একে আধুনিকের লক্ষণ বলে নিন্দা করলে চলবে না। কেননা কোনো সভ্য দেশেরই অবস্থা এরকম নয়। আধুনিকতা সেখানে সপ্তমীর চাঁদের মতো অর্ধেক আলোয় অর্ধেক অন্ধকারে খণ্ডিত হয়ে নেই। জাপানে পাশ্চাত্য বিদ্যার সংস্রব ভারতবর্ষের চেয়ে অল্প কালের, কিন্তু সেখানে সেটা তালি-দেওয়া ছেঁড়া কাঁথা নয়। সেখানে পরিব্যাপ্ত বিদ্যার প্রভাবে সমস্ত দেশের মনে চিন্তা করবার শক্তি অবিচ্ছিন্ন সঞ্চারিত। এই চিন্তা এক ছাঁচে ঢালা নয়। আধুনিক কালেরই লক্ষণ অনুসারে এই চিন্তায় বৈচিত্র্য আছে অথচ ঐক্যও আছে, সেই ঐক্য যুক্তির ঐক্য।

কেউ কেউ তথ্য গণনা করে দেখিয়েছেন, পূর্বকালে এ দেশে গ্রাম্য পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষার যে উদ্যোগ ছিল ব্রিটিশ শাসনে ক্রমেই তা কমেছে। কিন্তু, তার চেয়ে সর্বনেশে ক্ষতি হয়েছে, জনশিক্ষাবিধির সহজ পথগুলি লোপ পেয়ে আসাতে। শোনা যায়, একদিন বাংলাদেশ জুড়ে নানা শাখায় খাল কাটা হয়েছিল অতি আশ্চর্য নৈপুণ্যে; হাল আমলের অনাদরে এবং নির্বুদ্ধিতায় সে-সমস্ত বন্ধ হয়ে গেছে বলেই তাদের কূলে কূলে এত চিতা আজ জ্বলেছে। তেমনি এ দেশে শিক্ষার খালগুলোও গেল বন্ধ হয়ে, আর অন্তর-বাহিরে সমস্ত দীনতা বল পেয়ে উঠেছে। শিক্ষার একটা বড়ো সমস্যার সমাধান হয়েছিল আমাদের দেশে। শাসনের শিক্ষা আনন্দের শিক্ষা হয়ে দেশের হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল, মিলেছিল সমস্ত সমাজের প্রাণক্রিয়ার সঙ্গে। দেশব্যাপী সেই প্রাণের খাদ্যে আজ দুর্ভিক্ষ। পূর্বসংখ্যে কিছু বাকি আছে, তাই এখনো দেখতে পাচ্ছি নে এর মারমূর্তি।

মধ্য-এশিয়ার মরুভূমিতে সে-সব পর্যটক প্রাচীন যুগের চিহ্ন সন্ধান করেছেন তাঁরা দেখেছেন, সেখানে

কত সমৃদ্ধ জনপদ আজ বালি চাপা পড়ে হারিয়ে গেছে। এক কালে সে-সব জায়গায় জলের সংখ্যে ছিল, নদীর রেখাও পাওয়া যায়। কখন রস এল শুকিয়ে, এক-পা এক-পা করে এগিয়ে এল মরু, শুষ্ক রসনা মেলে লেহন করে নিল প্রাণ, লোকালয়ের শেষ স্বাক্ষর মিলিয়ে গেল

অসীম পাণ্ডুরতার মধ্যে। বিপুলসংখ্যক গ্রাম নিয়ে আমাদের যে দেশ সেই দেশের মনোভূমিতেও রসের জোগান আজ অবসিত। যে রস অনেক কাল থেকে নিম্ন স্তরে ব্যাপ্ত হয়ে আছে তাও দিনে দিনে শুষ্ক বাতাসের উষ্ণ নিশ্বাসে উবে যাবে, অবশেষে প্রাণনাশা মরু অগ্রসর হয়ে তৃষ্ণার অজগর সাপের মতো পাকে পাকে গ্রাস করতে থাকবে আমাদের এই গ্রামে-গাঁথা দেশকে। এই মরুর আক্রমণটা আমাদের চোখে পড়ছে না, কেননা, বিশেষ শিক্ষার গতিকেই দেশ-দেখা চোখ আমরা হারিয়েছি; গবাক্ষলগ্ননের আলোর মতো আমাদের সমস্ত দৃষ্টির কেন্দ্রীভূত শিক্ষিতসমাজের দিকে।

আমি একদিন দীর্ঘকাল ছিলুম বাংলাদেশের গ্রামের নিকটসংস্রবে। গরমের সময়ে একটা দুঃখের দৃশ্য পড়ত চোখে। নদীর জল গিয়েছে নেমে, তীরের মাটি গিয়েছে ফেটে, বেরিয়ে পড়েছে পাড়ার পুকুরের পঙ্কস্তর ধূ ধূ করছে তপ্ত বালু। মেয়েরা বহুদূর পথ থেকে ঘড়ায় করে নদীর জল বয়ে আনছে, সেই জল বাংলাদেশের অশ্রুজলমিশ্রিত। গ্রামে আগুন লাগলে নিবোবার উপায় পাওয়া যায় না; ওলাউঠো দেখা দিলে নিবারণ করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

এই গেল এক, আর-এক দুঃখের বেদনা আমার মনে বেজেছিল। সন্ধে হয়ে এসেছে, সমস্ত দিনের কাজ শেষ করে চাষিরা ফিরেছে ঘরে। এক দিকে বিস্তৃত মাঠের উপর নিস্তব্ধ অন্ধকার, আর-এক দিকে বাঁশঝাড়ের মধ্যে এক-একটি গ্রাম যেন রাত্রির বন্যার মধ্যে জেগে আছে ঘনতর অন্ধকারের দ্বীপের মতো। সেই দিক থেকে শোনা যায় খোলের শব্দ, আর তারই সঙ্গে একটানা সুরে কীর্তনের কোনো-একটা পদের হাজারবার তারস্বরে আবৃত্তি। শুনে মনে হত, এখানেও চিত্তজলাশয়ের জল তলায় এসে পড়েছে। তাপ বাড়ছে, কিন্তু ঠাণ্ডা করবার উপায় কতটুকুই বা! বছরের পর বছর যে অবস্থা-দৈন্যের মধ্যে দিন কাটে তাতে কী করে প্রাণ বাঁচবে যদি মাঝে মাঝে এটা অনুভব না করা যায় যে, হাড়ভাঙা মজুরির উপরেও মন বলে মানুষের একটা-কিছু আছে যেখানে তার অপমানের উপশম, দুর্ভাগ্যের দাসত্ব এড়িয়ে যেখানে হাঁফ ছাড়বার জায়গা পাওয়া যায়! তাকে সেই তপ্তি দেবার জন্যে একদিন সমস্ত সমাজ প্রভূত আয়োজন করেছিল। তার কারণ, সমাজ এই বিপুল জনসাধারণকে স্বীকার করে নিয়েছিল আপন লোক বলে। জানত এরা নেমে গেলে সমস্ত দেশ যায় নেমে। আজ মনের উপবাস ঘোচাবার জন্যে কেউ তাদের কিছুমাত্র সাহায্য করে না। তাদের আত্মীয় নেই, তারা নিজে নিজেই আগেকার দিনের তলানি নিয়ে কোনোমতে একটু সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করে। আর-কিছুদিন পরে এটুকুও যাবে শেষ হয়ে;

সমস্ত দিনের দুঃখধন্দার রিক্ত প্রান্তে নিরানন্দ ঘরে আলো জ্বলবে না, সেখানে গান উঠবে না আকাশে। ঝিল্লি ডাকবে বাঁশবনে, ঝোপঝাড়ের মধ্য থেকে শেয়ালের ডাক উঠবে প্রহরে প্রহরে; আর সেই সময় শহরে শিক্ষাভিমাত্রীর দল বৈদ্যুত আলোয় সিনেমা দেখতে ভিড় করবে।

এক দিকে আমাদের দেশে সনাতন শিক্ষার ব্যাপ্তি রুদ্ধ হয়ে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের অনাবৃষ্টি চিরকালীন হয়ে দাঁড়ালো, অন্য দিকে আধুনিক কালের নতুন বিদ্যার যে আবির্ভাব হল তার প্রবাহ বইল না সর্বজনীন দেশের অভিমুখে। পাথরে-গাঁথা কুণ্ডের মতো স্থানে স্থানে সে আবদ্ধ হয়ে রইল; তীর্থের পাণ্ডাকে দর্শনী দিয়ে দূর থেকে এসে গণ্ডুষ ভর্তি করতে হয়, নানা নিয়মে তার আটঘাট বাঁধা। মন্দাকিনী থাকেন শিবের ঘোরালো জটাজুটের মধ্যে বিশেষভাবে; তবুও দেবললাট থেকে তিনি তাঁর ধারা নামিয়ে দেন, ব'হে যান সাধারণভাবে ঘাটে ঘাটে মর্তজনের দ্বারের সম্মুখ দিয়ে, ঘটে ঘটে ভরে দেন আপন প্রসাদ। কিন্তু আমাদের দেশে প্রবাসিনী আধুনিকী বিদ্যা তেমন নয়। তার আছে বিশিষ্ট রূপ, সাধারণ রূপ নেই। সেইজন্যে ইংরেজি শিখে যাঁরা বিশিষ্টতা পেয়েছেন তাঁদের মনের মিল হয় না সর্বসাধারণের সঙ্গে। দেশে সকলের চেয়ে বড়ো জাতিভেদ এইখানেই শ্রেণীতে শ্রেণীতে অস্পৃশ্যতা।

ইংরেজি ভাষায় অবগুষ্ঠিত বিদ্যা স্বভাবতই আমাদের মনের সহবর্তিনী হয়ে চলতে পারে না। সেইজন্যেই আমরা অনেকেই যে পরিমাণে শিক্ষা পাই সে পরিমাণে বিদ্যা পাই নে। চার দিকের আবহাওয়ার থেকে এ বিদ্যা বিচ্ছিন্ন; আমাদের ঘর আর ইস্কুলের মধ্যে ট্রাম চলে, মন চলে না। ইস্কুলের বাইরে পড়ে আছে আমাদের দেশ; সেই দেশে ইস্কুলের প্রতিবাদ রয়েছে বিস্তর, সহযোগিতা নেই বললেই হয়। সেই বিচ্ছেদে আমাদের ভাষা ও চিন্তা অধিকাংশ স্থলেই ইস্কুলের ছেলের মতোই। ঘুচল না আমাদের নোটবইয়ের শাসন, আমাদের বিচারবুদ্ধিতে নেই সাহস; আছে নজির মিলিয়ে অতি সাবধানে পা ফেলে চলা। শিক্ষার সঙ্গে দেশের মনের সহজ মিলন ঘটাবার আয়োজন আজ পর্যন্ত হল না। যেন কনে রইল বাপের বাড়ির অন্তঃপুরে; শ্বশুরবাড়ি নদীর ও পারে বালির চর পেরিয়ে। খেয়া-নৌকাটা গেল কোথায়?

পারাপারের একখানা ডোঙা দেখিয়ে দেওয়া হয়, তাকে বলে সাহিত্য। এ কথা মানতেই হবে, আধুনিক বঙ্গসাহিত্য বর্তমান যুগের অন্ত্রে বস্ত্রে মানুষ। এই সাহিত্য আমাদের মনে লাগিয়েছে এ কালের ছোঁয়া, কিন্তু খাদ্য তো ও পার থেকে পুরোপুরি বহন করে আনছে না। যে বিদ্যা বর্তমান যুগের চিত্তশক্তিকে বিচিত্র আকারে প্রকাশ করছে, উদঘাটন করছে বিশ্বরহস্যের

নব নব প্রবেশদ্বার, বাংলাসাহিত্যের পাড়ায় তার যাওয়া-আসা নেই বললেই হয়। চিন্তা করে যে মন, যে মন বিচার করে, বুদ্ধির সঙ্গে ব্যবহারের যোগসাধন করে যে, সে পড়ে আছে পূর্ব-যুগান্তরে; আর যে মন রসসম্ভোগ করে সে যাতায়াত শুরু করেছে আধুনিক ভোজের নিমন্ত্রণশালার আঙিনায়। স্বভাবতই তার ঝোঁক পড়েছে সেই দিকটাতে যে দিকে চলেছে মদের পরিবেশন, যেখানে ঝাঁঝালো গন্ধে বাতাস হয়েছে মাতাল।

গল্প কবিতা নাটক নিয়ে বাংলাসাহিত্যের পনেরো-আনা আয়োজন। অর্থাৎ ভোজের আয়োজন, শক্তির আয়োজন নয়। পাশ্চাত্য দেশের চিত্তোৎকর্ষ বিচিত্র চিত্তশক্তির প্রবল সমবায় নিয়ে। মনুষ্যত্ব সেখানে দেহ মন প্রাণের সকল দিকেই ব্যাপ্ত। তাই সেখানে যদি ত্রুটি থাকে তো পূর্তিও আছে। বটগাছের কোনো ডাল বা ঝড়ে ভাঙল, কোনোখানে বা পোকায় ছিদ্র করেছে, কোনো বৎসর বা বৃষ্টির কার্পণ্য, কিন্তু সবসুদ্ধ জড়িয়ে বনস্পতি জমিয়ে রেখেছে আপন স্বাস্থ্য, আপন বলিষ্ঠতা। তেমনি পাশ্চাত্য দেশের মনকে ক্রিয়াবান্ করে রেখেছে তার বিদ্যা, তার শিক্ষা, তার সাহিত্য, সমস্ত মিলে; তার কর্মশক্তির অক্লান্ত উৎকর্ষ ঘটিয়েছে এই-সমস্তের উৎকর্ষ।

আমাদের সাহিত্যে রসেরই প্রাধান্য। সেইজন্যে যখন কোনো অসংযম কোনো চিত্তবিকার অনুকরণের নালা বেয়ে এই সাহিত্যে প্রবেশ করে তখন সেটাই একান্ত হয়ে ওঠে, কল্পনাকে রুগ্ণ বিলাসিতার দিকে গাঁজিয়ে তোলে। প্রবল প্রাণশক্তি জাগ্রত না থাকলে দেহের ক্ষুদ্র বিকার কথায় কথায় বিষফোড়া হয়ে রাঙিয়ে ওঠে। আমাদের দেশে সেই আশঙ্কা। এ নিয়ে দোষ দিলে আমরা নিজের দেখাই পাশ্চাত্য সমাজের; বলি, এটাই তো সভ্যতার আধুনিকতম পরিণতি। কিন্তু সেইসঙ্গে সকল দিকে আধুনিক সভ্যতার যে সচিস্ত সচল প্রবল বৃহৎ সমগ্রতা আছে সেটার কথা চাপা রাখি।

একদা পাড়াগাঁয়ে যখন বাস করতুম তখন সাধু সাধকের বেশ ধারী কেউ কেউ আমার কাছে আসত; তারা সাধনার নামে উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়চর্চার সংবাদ আমাকে জানিয়েছে। তাতে ধর্মের প্রশ্ন ছিল। তাদেরই কাছে শুনেছি, এই প্রশ্ন সুরঙ্গপথে শহর পর্যন্ত গোপনে শিষ্যে প্রশিষ্যে শাখায়িত। এই পৌরুষনাশী ধর্মনামধারী লালসার লোলতা ব্যাপ্ত হবার প্রধান কারণ এই যে, আমাদের সাহিত্যে সমাজে সেই-সমস্ত উপাদানের অভাব যাতে বড়ো বড়ো চিন্তাকে, বুদ্ধির সাধনাকে, আশ্রয় করে কঠিন গবেষণার দিকে মনের ঔৎসুক্য জাগিয়ে রাখতে পারে।

এজন্যে অন্তত বাঙালি সাহিত্যিকদের দোষ দেওয়া যায় না। আমাদের সাহিত্য সারগর্ভ নয় বলে একে নিন্দা করা সহজ, কিন্তু কী করলে একে সারালো করা যায় তার পন্থা নির্ণয় করা তত সহজ নয়। রুচির সম্বন্ধে লোকে বেপরোয়া, কেননা ও দিকে কোনো শাসন নেই। অশিক্ষিত রুচিও রসের সামগ্রী থেকে যা-হোক-কোনো-একটা আশ্বাদন পায়। আর, যদি সে মনে করে তারই বোধ রসবোধের চরম আদর্শ তবে তা নিয়ে তর্ক তুললে ফৌজদারি পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। কবিতা গল্প নাটকের বাজারের দিকে যারা সমজদারের রাজপথটা পায় নি অন্তত তারা আনাড়িপাড়ার মাঠ দিয়েও চলতে পারে, কোনো মাশুল দিতে হয় না কোথাও। কিন্তু যে বিদ্যা মননের সেখানে কড়া পাহারার সিংহদ্বার পেরিয়ে যেতে হয়, মাঠ পেরিয়ে নয়। যে-সব দেশের 'পরে লক্ষ্মী প্রসন্ন, এবং সরস্বতীও, তারা সেই বিদ্যার দিকে নতুন নতুন পথ পাকা করছে প্রত্যহ; পণ্যের আদানপ্রদান চলছে দূরে নিকটে, ঘরে বাইরে। আমাদের দে১৬॥১শেও তো বিলম্ব করলে চলবে না।

বাংলার আকাশে দুর্দিন এসেছে চার দিক থেকে ঘনঘোর করে। একদা রাজদরবারে বাঙালির প্রতিপত্তি ছিল যথেষ্ট। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে বাঙালি কর্মে পেয়েছে খ্যাতি, শিক্ষাপ্রসারণে হয়েছে অগ্রণী। সেদিন সেখানকার লোকের কাছে সে শ্রদ্ধা পেয়েছে, পেয়েছে অকুণ্ঠিত কৃতজ্ঞতা। আজ রাজপুরুষ তার প্রতি অপ্রসন্ন; অন্যান্য প্রদেশে তার সম্বন্ধে আতিথ্য সংকুচিত, দ্বার অবরুদ্ধ। এ দিকে বাংলার আর্থিক দুর্গতিও চরমে এল।

অবস্থার দৈন্যে অশিক্ষার আত্মগ্লানিতে যেন বাঙালি নীচে তলিয়ে না যায়, যেন তার মন মাথা তুলতে পারে দুর্ভাগ্যের উর্ধ্বে, এই দিকে আমাদের সমস্ত চেষ্টা জাগাতে হবে তো। মানুষের মন যখন ছোটো হয়ে যায় তখন ক্ষুদ্রতার নখচঞ্চুর আঘাতে সকল উদ্যোগকেই সে ক্ষুন্ন করে। বাংলাদেশে এই ভাঙন-ধরানো ঈর্ষা নিন্দা দলাদলি এবং দুয়ো দেবার উত্তেজনা তো বরাবরই আছে, তার উপর চিন্তের আলো যতই ম্লান হয়ে আসবে ততই নিজের 'পরে অশ্রদ্ধাবশতই অন্য-সকলকে খর্ব করবার অহৈতুক প্রয়াস আরো উঠবে বিষাক্ত হয়ে। আজ হিন্দু-মুসলমানে যে-একটা লজ্জাজনক আড়াআড়ি দেশকে আত্মঘাতে প্রবৃত্ত করছে তার মূলেও আছে সর্বদেশব্যাপী অবুদ্ধি। অলক্ষ্মী সেই অশিক্ষিত অবুদ্ধির সাহায্যেই আমাদের ভাগ্যের ভিত্তি ভাঙবার কাজে চর লাগিয়েছে; আত্মীয়কে তুলছে শত্রু করে, বিধাতাকে করছে আমাদের বিপক্ষ। শেষকালে নিজের সর্বনাশ করবার জেদ এতদূর পর্যন্ত আজ এগোল যে, বাঙালি হয়ে

বাংলাভাষার মধ্যেও ফাটল ধরাবার চেষ্টা আজ সম্ভবপর হয়েছে; শিক্ষার ও সাহিত্যের যে উদার ক্ষেত্রে সকল মতভেদ সত্ত্বেও একরাষ্ট্রীয় মানুষের মেলবার জায়গা সেখানেও স্বহস্তে কাঁটাগাছ রোপণ করবার উৎসাহ ব্যথা পেল না, লজ্জা পেল না। দুঃখ পাই তাতে ধিক্কার নেই, কিন্তু দেশজোড়া অশিক্ষাগ্রস্ত হেয়তা আমাদের মাথা হেঁট করে দিল, ব্যর্থ করে দিল আমাদের সকল মহৎ উদ্যম। রাষ্ট্রিক হাটে রাষ্ট্রাধিকার নিয়ে দর-দস্তুর করে হট্টগোল যতই পাকানো যাক, সেখানে গোল টেবিলের চক্রবাত্যায় প্রতিকারের চরম উপায় মিলবে না। তরীর তলায় যেখানে বাঁধন আলগা সেইখানে অবিলম্বে হাত লাগাতে হবে।

সকলের গোড়ায় চাই শিক্ষিত মন। ইন্সকুল-কলেজের বাইরে শিক্ষা বিছিয়ে দেবার উপায় সাহিত্য। কিন্তু সেই সাহিত্যকে সর্বাঙ্গীণরূপে শিক্ষার আধার করতে হবে; দেখতে হবে তাকে গ্রহণ করবার পথ সর্বত্র সুগম হয়েছে। এজন্যে কোন্ বন্ধুকে ডাকব? বন্ধু যে আজ দুর্লভ হল। তাই বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারেই আবেদন উপস্থিত করছি।

মস্তিষ্কের সঙ্গে স্নায়ুজালের অবিচ্ছিন্ন যোগ সমস্ত দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। বিশ্ববিদ্যালয়কে সেই মস্তিষ্কের স্থান নিয়ে স্নায়ুতন্ত্র প্রেরণ করতে হবে দেশের সর্বদেহে। প্রশ্ন এই, কেমন করে করা যেতে পারে। তার উত্তরে আমার প্রস্তাব এই যে, একটা পরীক্ষার বেড়াজাল দেশ জুড়ে পাতা হোক। এমন সহজ ও ব্যাপক ভাবে তার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ইন্সকুল-কলেজের বাইরে থেকেও দেশে পরীক্ষাপাঠ্য বইগুলি স্বেচ্ছায় আয়ত্ত করবার উৎসাহ জন্মে। অন্তঃপুরে মেয়েরা কিংবা পুরুষদের যারা নানা বাধায় বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না তারা অবকাশকালে নিজের চেষ্টায় অশিক্ষার লজ্জা নিবারণ করছে, এইটি দেখবার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় জেলায় জেলায় পরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপন করতে পারে। বহু বিষয় একত্রে জড়িত করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি দেওয়া হয়, এ ক্ষেত্রে উপাধি দেবার উপলক্ষে সেরকম বহুলতার প্রয়োজন নেই। প্রায়ই ব্যক্তিবিশেষের মনের প্রবণতা থাকে বিষয়বিশেষে। সেই বিষয়েই আপন বিশেষ অধিকারের পরিচয় দিতে পারলে সমাজে সে আপন বিশেষ স্থান পাবার অধিকারী হয়। সেটুকু অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করবার কোনো কারণ দেখি নে।

বিশ্ববিদ্যালয় আপন পীঠস্থানের বাহিরেও যদি ব্যাপক উপায়ে আপন সত্তা প্রসারণ করে তবেই বাংলাভাষায় যথোচিত পরিমাণে শিক্ষাপাঠ্য গ্রন্থরচনা সম্ভবপর হবে। নইলে কোনো কালেই বাংলাসাহিত্যে বিষয়ের দৈন্য ঘুচতেই পারে না। যে-সব শিক্ষণীয় বিষয় জানা থাকলে

আত্মসম্মান রক্ষা হয় তার জন্যে অগত্যা যদি ইংরেজি ভাষারই দ্বারস্থ হতে হয় তবে সেই অকিঞ্চনতায় মাতৃভাষাকে চিরদিন অপমানিত করে রাখা হবে। বাঙালি যারা বাংলাভাষাই জানে শিক্ষিতসমাজে তারা কি চিরদিন অন্ত্যজ শ্রেণীতেই গণ্য হয়ে থাকবে? এমনও এক সময় ছিল যখন ইংরেজি ইস্কুলের পয়লা শ্রেণীর ছাত্রেরা ‘বাংলা জানি নে’ বলতে অগৌরব বোধ করত না, এবং দেশের লোকেরাও সসম্মানে তাদের চৌকি এগিয়ে দিয়েছে। সেদিন আজ আর নেই বটে, কিন্তু বাঙালির ছেলেকে মাথা হেঁট করতে হয় ‘শুধু কেবল বাংলা ভাষা জানি’ বলতে। এ দিকে রাষ্ট্রক্ষেত্রে স্বরাজ পাবার জন্যে প্রাণপণ দুঃখ স্বীকার করি, কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বরাজ পাবার উৎসাহ আমাদের জাগে নি বললে কম বলা হয়। এমন মানুষ আজও দেশে আছে যারা তার বিরুদ্ধতা করতে প্রস্তুত, যারা মনে করে শিক্ষাকে বাংলাভাষার আসনে বসালে তার মূল্য যাবে ক’মে। বিলেতে যাতায়াতের প্রথম যুগে ইঙ্গবঙ্গী নেশা যখন উৎকট ছিল তখন সেই মহলে স্ত্রীকে শাড়ি পরালে প্রেস্টিজ-হানি হত। শিক্ষা-সরস্বতীকে শাড়ি পরালে আজও অনেক বাঙালি বিদ্যার মানহানি কল্পনা করে। অথচ এটা জানা কথা যে, শাড়ি-পরা বেশে দেবী আমাদের ঘরের মধ্যে চলাফেরা করতে আরাম পাবেন, খুরওয়ালা বুটজুতোয় পায়ে পায়ে বাধা পাবার কথা।

একদিন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে যখন আমার শক্তি ছিল তখন কখনো কখনো ইংরেজি সাহিত্য মুখে মুখে বাংলা করে শুনিয়েছি। আমার শ্রোতারা ইংরেজি জানতেন সবাই। তবু তাঁরা স্বীকার করেছেন, ইংরেজি সাহিত্যের বাণী বাংলাভাষায় তাঁদের মনে সহজে সাড়া পেয়েছে। বস্তুত আধুনিক শিক্ষা ইংরেজিভাষাবাহিনী বলেই আমাদের মনের প্রবেশ-পথে তার অনেকখানি মারা যায়। ইংরেজি খানার টেবিলে আহারের জটিল পদ্ধতি যার অভ্যস্ত নয় এমন বাঙালির ছেলে বিলেতে পাড়ি দেবার পথে পি. অ্যাণ্ড্‌ ও. কোম্পানির ডিনারকামরায় যখন খেতে বসে তখন ভোজ্য ও রসনার মধ্যপথে কাঁটাছুরির দৌত্য তার পক্ষে বাধাগ্রস্ত বলেই ভরপুর ভোজের মাঝখানেও ক্ষুধিত জঠরের দাবি সম্পূর্ণ মিটতে চায় না। আমাদের শিক্ষার ভোজেও সেই দশা; আছে সবই, অথচ মাঝপথে অনেকখানি অপচয় হয়ে যায়। এ যা বলছি এ কলেজি যজ্ঞের কথা, আমার আজকের আলোচ্য বিষয় এ নিয়ে নয়। আমার বিষয়টা সর্বসাধারণের শিক্ষা নিয়ে। শিক্ষায় জলের কল চালানোর কথা নয়, পাইপ যেখানে পৌঁছয় না সেখানে পানীয়ের

ব্যবস্থার কথা। মাতৃভাষায় সেই ব্যবস্থা যদি গোপ্পদের চেয়ে প্রশস্ত না হয় তবে এই বিদ্যাহারা দেশের মরুবাসী মনের উপায় হবে কী?

বাংলা যার ভাষা সেই আমার ভূষিত মাতৃভূমির হয়ে বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে চাতকের মতো উৎকণ্ঠিত বেদনায় আবেদন জানাচ্ছি; তোমার অভ্রভেদী শিখরচূড়া বেষ্টন করে পুঞ্জ পুঞ্জ শ্যামল মেঘের প্রসাদ আজ বর্ষিত হোক ফলে শস্যে, সুন্দর হোক পুষ্পে পল্লবে, মাতৃভাষার অপমান দূর হোক, যুগশিক্ষার উদ্বেল ধারা বাঙালিচিত্তের শুষ্ক নদীর রিক্ত পথে বান ডাকিয়ে বয়ে যাক, দুই কূল জাগুক পূর্ণ চেতনায়, ঘাটে ঘাটে উঠুক আনন্দধ্বনি।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি

শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে... আলোচনা করব স্থির করেছিলুম, ইতিমধ্যে কোনো-একটি আমেরিকান কাগজে এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পড়লুম; পড়ে খুশি হয়েছি। আমার মতটি এই লেখায় ঠিকমত ব্যক্ত হয়েছে। হবার প্রধান কারণ এই, আমেরিকা দীর্ঘকাল থেকে বৈষয়িক সিদ্ধির নেশায় মেতে ছিল। সেই সিদ্ধির আয়তন ছিল অতি স্থূল, তার লোভ ছিল প্রকাণ্ড মাপের। এর ব্যাপ্তি ক্রমশ বেড়েই চলেছিল। তার ফলে সামাজিক মানুষের যে পূর্ণতা সেটা চাপা পড়ে গিয়ে বৈষয়িক মানুষের কৃতিত্ব সব ছাড়িয়ে উঠেছিল। আজ হঠাৎ সেই অতিকায় বৈষয়িক মানুষটি আপন সিদ্ধিপথের মাঝখানে অনেক দামের জটিল যানবাহনের চাকা ভেঙে, কল বিগড়িয়ে, ধুলায় কাত হয়ে পড়েছে। এখন তার ভাবনার কথা এই যে, সব ভাঙাচোরা বাদ দিয়ে মানুষটার বাকি রইল কী? এত কাল ধরে যা-কিছু সে গড়ে তুলেছিল, যা-কিছুকে সে সর্বোচ্চ মূল্য দিয়েছিল, তার প্রায় সমস্তই বাইরের। বাইরে যখন ভাঙন ধরে তখন ভিতরটাতে যদি দেখে সমস্ত ফাঁক তা হলে সান্ত্বনা পাবে কী নিয়ে? আসবাবগুলো গেল, কিন্তু মানুষটা কোথায়? সে এই বলে শোক করছে যে, সে আজ ভিক্ষুক; বলতে পারছে না ‘আমার অন্তরে সম্পদ আছে’। আজ তার মূল্য নেই; কেননা সে আপনাকে হাটের মানুষ করে তুলেছিল, সেই হাট গেছে ভেঙে।

একদিন ভারতবর্ষে যখন তার নিজের সংস্কৃতি ছিল পরিপূর্ণ তখন ধনলাঘবকে সে ভয় করত না, লজ্জা করত না; কেননা তার প্রধান লক্ষ্য ছিল অন্তরের দিকে। সেই লক্ষ্য নির্ণয় করা, অভ্যাস করা, তার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করা শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ। অবশ্য, তারই এক সীমানায় বৈষয়িক শিক্ষাকে স্থান দেওয়া চাই, কেননা মানুষের সত্তা ব্যবহারিক-পারমার্থিককে মিলিয়ে। সংস্কৃতির অভাব আছে অথচ দক্ষতা পুরোমাত্রায়, এমন খোঁড়া মানুষ চলেছিল বাইসিকল চড়ে। ভাবে নি কোনো চিন্তার কারণ আছে, এমন সময় বাইসিকল পড়ল ভেঙে। তখন বুঝল, বহুমূল্য যন্ত্রটার চেয়ে বিনা মূল্যের পায়ের দাম বেশি। যে মানুষ উপকরণ নিয়ে বড়াই করে সে জানে না আসলে সে কতই গরিব। বাইসিকলের আদর কমাতে চাই নে, কিন্তু দুটো সজীব পায়ের আদর তার চেয়ে বেশি। যে শিক্ষায় এই সজীব পায়ের জীবনীশক্তিকে বাড়িয়ে তোলে তাকেই ধন্য বলি, যে শিক্ষায় প্রধানত আসবাবের প্রতিই মানুষকে নির্ভরশীল করে তোলে তাকে মূঢ়তার বাহন বলব।

যখন শান্তিনিকেতনে প্রথম বিদ্যালয় স্থাপন করি তখন এই লক্ষ্যটাই আমার মনে প্রবল ছিল। আসবাব জুটে গেলে তাকে ব্যবহার করার জন্যে সাধনার দরকার নেই, কিন্তু আসবাব-নিরপেক্ষ হয়ে কী করে বাহিরে কর্মকুশলতা ও অন্তরে আপন সম্মানবোধ রক্ষা করা যায় এইটেই শিক্ষাসাধ্য। তখন আশ্রমে গরিবের মতোই ছিল জীবনযাত্রা, সেই গরিবিয়ানাকে লজ্জা করাই লজ্জাকর এ কথাটা তখন মনে ছিল। উপকরণবানের জীবনকে ঈর্ষা করা বা বিশেষভাবে সম্মান করাই যে কুশিক্ষা, এ কথাটা আমি তখনকার শিক্ষকদের স্মরণ করিয়ে রেখেছিলুম।

বলা বাহুল্য, যে দারিদ্র্য শক্তিহীনতা থেকে উদ্ভূত সে কুৎসিত। কথা আছে : শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা। তেমনি বলা যায়, সামর্থ্যবানেরই ভূষণ অকিঞ্চনতা। অতএব সামর্থ্য শিক্ষা করাই চাই ভোগের অভ্যাস বর্জন করে। সামর্থ্যহীন দারিদ্র্যেই ভারতবর্ষের মাথা হেঁট হয়ে গেছে, অকিঞ্চনতায় নয়। অক্ষমকে দেবতা ক্ষমা করেন না।

‘আমি সব পারি, সব পারব’ এই আত্মবিশ্বাসের বাণী আমাদের শরীর মন যেন তৎপরতার সঙ্গে বলতে পারে। ‘আমি সব জানি’ এই কথা বলবার জন্যে আমাদের ইন্দ্রিয় মন উৎসুক হয় তো হোক, কিন্তু তার পরেও চরমের কথা ‘আমি সব পারি’। আজ এই বাণী সমস্ত যুরোপের। সে বলে, ‘আমি সব পারি, সব পারব।’ তার আপন ক্ষমতাকে শ্রদ্ধা করার অন্ত নেই। এই শ্রদ্ধার দ্বারা সে নির্ভীক হয়েছে, জলে স্থলে আকাশে সে জয়ী হয়েছে। আমরা দৈবের দিকে তাকিয়ে আছি, সেইজন্যে বহু শতাব্দী ধরে আমরা দৈবকর্তৃক প্রবঞ্চিত।

সুইডেনের বিখ্যাত ভূপর্যটক স্বেন হেডিনের ভ্রমণবৃত্তান্ত অনেক দিন পরে আবার আমি পড়েছিলুম। এশিয়ার দুর্গম মরুপ্রদেশে আবহতত্ত্ব পর্যবেক্ষণের উপায় করবার জন্যে তিনি দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এই অধ্যবসায়ের মূলমন্ত্র হচ্ছে, ‘আমি সব জানব, সব পারব।’ এই পারবার শক্তি বলতে কী বোঝায় সে তাঁর বই পড়লে বোঝা যায়। আমরা কথায় কথায় ওদের বলে থাকি বস্তুতান্ত্রিক। আত্মার শক্তি যার এত প্রবল, যে জ্ঞান-অর্জনের জন্যে সে প্রাণকে তুচ্ছ করে, যার কিছুতে ভয় নেই, সাংঘাতিক বাধাকে সে স্বীকার করে না, দুঃসহ কৃচ্ছ্রসাধনে যাকে পরাহত করতে পারে না-প্রাণপণ সাধনা এমন-কিছুর জন্যে যা আর্থিক নয়, জীবিকার পক্ষে যা অত্যাবশ্যক নয়, বরঞ্চ বিপরীত-তাকে বলব বস্তুতান্ত্রিক! আর, সে কথা বলবে আমাদের মতো দুর্বল আত্মা!

‘আমরা সব-কিছু পারব’ এই কথা সত্য করে বলবার শিক্ষাই আত্মাবমাননা থেকে আমাদের দেশকে পরিত্রাণ করতে পারে, এ কথা ভুললে চলবে না। আমাদের বিদ্যালয়ে সকল কর্মে

সকল ইন্দ্রিয়মনের তৎপরতা প্রথম হতেই অনুশীলিত হোক, এইটেই শিক্ষাসাধনার গুরুতর কর্তব্য বলে মনে করতে হবে। জানি এর প্রধান অন্তরায় অভিভাবক; পড়া মুখস্থ করতে করতে জীবনীশক্তি মননশক্তি কর্মশক্তি সমস্ত যতই কৃশ হতে থাকে তাতে বাধা দিতে গেলে তাঁরা উদ্ভিগ্ন হয়ে ওঠেন। কিন্তু মুখস্থ বিদ্যার চাপে এই-সব চির-পঙ্গু মানুষের অকর্মণ্যতার বোঝা দেশ বহন করবে কী করে? উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ। আমাদের শিক্ষালয়ে নবীন প্রাণের মধ্যে অক্লান্ত উদ্যোগিতার হাওয়া বয়েছে যদি দেখতে পাই তা হলেই বুঝব, দেশে লক্ষ্মীর আমন্ত্রণ সফল হতে চলল। এই আমন্ত্রণ ইকনমিক্‌সে ডিগ্রি নেওয়ায় নয় : চরিত্রকে বলিষ্ঠ কর্মিষ্ঠ করায়, সকল অবস্থার জন্যে নিজেকে নিপুণভাবে প্রস্তুত করায়, নিরলস আত্মশক্তির উপর নির্ভর করে কর্মানুষ্ঠানের দায়িত্ব সাধনা করায়। অর্থাৎ কেবল পাণ্ডিত্যচর্চায় নয়, পৌরুষচর্চায়। সাধারণ ইস্কুলে এই সাধনার সুযোগ নেই, আমাদের আশ্রমে আছে। এখানে নানা বিভাগে নানা কর্ম চলছে, তার মধ্যে শক্তি প্রয়োগ করাতে পারে এমন অবস্থা থাকা চাই।

এই কৃতিত্বশিক্ষা অত্যাবশ্যক হলেও এই-যে যথেষ্ট নয় সে কথা মানতে হবে। আমেরিকান লেখক এই কথাটারই আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, আধুনিক শিক্ষা থেকে একটা জিনিস কেমন করে স্থলিত হয়ে পড়েছে, সে হচ্ছে সংস্কৃতি। চিত্তের ঐশ্বর্যকে অবজ্ঞা করে আমরা জীবনযাত্রার সিদ্ধিলাভকেই একমাত্র প্রাধান্য দিয়েছি। কিন্তু সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে এই সিদ্ধিলাভ কি কখনো যথার্থভাবে সম্পূর্ণ হতে পারে?

সংস্কৃতি সমগ্র মানুষের চিত্তবৃত্তিকে গভীরতর স্তর থেকে সফল করতে থাকে। তার প্রভাবে মানুষ অন্তর থেকে স্বতই সর্বাঙ্গীণ সার্থকতা লাভ করে। তার প্রভাবে নিকাম জ্ঞানার্জনের অনুরাগ এবং নিঃস্বার্থ কর্মানুষ্ঠানের উৎসাহ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। যথার্থ সংস্কৃতি জড়ভাবে প্রথাপালনের চেয়ে অকৃত্রিম সৌজন্যকে বড়ো মূল্য দিয়ে থাকে। মানুষের সঙ্গে ব্যবহার কাজ উদ্ধার করবার উপযোগী বিনয়কৌশল তার অনুশাসন নয়; সংস্কৃতিবান্ মানুষ নিজের ক্ষতি করতে পারে, কিন্তু নিজেকে হেয় করতে পারে না। সে আড়ম্বরপূর্বক নিজেকে প্রচার করতে বা স্বার্থপরভাবে সবাইকে ঠেলে নিজেকে অগ্রসর করতে লজ্জা বোধ করে। যা-কিছু ইতর বা কপট তার গ্লানি তাকে বেদনা দেয়। শিল্পে সাহিত্যে মানুষের ইতিহাসে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তার সঙ্গে আন্তরিক পরিচয় থাকতে সকলপ্রকার শ্রেষ্ঠতাকে সম্মান করতে সে আনন্দ পায়। সে বিচার করতে পারে,

ক্ষমা করতে পারে, মতবিরোধের বাধা ভেদ করেও যেখানে যেটুকু ভালো আছে সে তা দেখতে পায়, অন্যের সফলতাকে ঈর্ষা করাকে সে নিজের লাঘব বলেই জানে। সমগ্র মনুষ্যত্বের স্বকীয় আদর্শ প্রত্যেক বড়ো সমাজেই আছে। সেই আদর্শ কেবল পাঠাগারে নয়, পরিবারের মধ্যেও। আমাদের দেশের বর্তমান দুর্গতির দিনে সেই আদর্শ দুর্বল হয়ে গেছে, তার শোচনীয় দৃষ্টান্ত প্রতিদিন দেখতে পাই। তাই বীভৎস কুৎসা আমাদের দেশে আয়জনক পণ্যদ্রব্য হয়ে উঠেছে। তারস্বরে নিন্দা বিস্তার করে বাতাসকে বিষাক্ত করার অপরাধকে আমরা গ্রাহ্যই করি নে; একটু উপলক্ষ ঘটবা-মাত্র এই বীভৎসতাকে উদ্ভাবিত করার ও প্রশয় দেবার লোক দলে দলে ভিড় করে আসে, ইতর হিংস্রতায় সমস্ত দেশ মারীগ্রস্ত হয়ে ওঠে। তীক্ষ্ণ মেধার গুণে আমার পড়া মুখস্থ করি। বি. এ., এম. এ. পাস করি; কিন্তু আত্মলাঘবকারী পরস্পরের সৌভাগ্যবিদ্বেষী নিন্দা-লোলুপ যে চরিত্রদৈন্য শুভকর্মে পরস্পর মিলিত হবার পথে পথে সচেষ্টভাবে কাঁটার বীজ বপন করে চলেছে, সকল প্রকার সদনুষ্ঠানকে জীর্ণ বিদীর্ণ করে দেবার জন্যে মহোল্লাসে উঠে পড়ে লেগেছে, সে কেবল সংস্কৃতির অভাবে মনুষ্যত্বের আদর্শ ক্ষুন্ন হয়েছে বলেই সম্ভব হল। সকল কর্মানুষ্ঠানে উৎসাহপূর্বক নিজেদেরকে অকৃতার্থ করে আজ বাঙালি সমস্ত পৃথিবীর কাছে অশ্রদ্ধেয় হয়ে উঠল। শিশুকাল থেকে এই ইতরতার বিষবীজ শিক্ষার ভিতর দিয়ে উন্মূলিত করা আমাদের বিদ্যালয়ের সর্বপ্রধান লক্ষ্য হোক, এই আমি একান্ত মনে কামনা করি। এর একমাত্র উপায় হচ্ছে পরীক্ষা-পাসের জন্যে পড়া মুখস্থ করা নয়, মানুষের ইতিহাসে যা-কিছু ভালো তার সঙ্গে আনন্দময় পরিচয়সাধন করিয়ে তার প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব করবার সুযোগ সর্বদা ঘটিয়ে দেওয়া। একদা আশ্রমে আমার কবিসহযোগী সতীশ রায় এই কাজ করতেন এবং আর একজন সহযোগী ছিলেন অজিত চক্রবর্তী। তেমন শিক্ষক নিঃসন্দেহ এখনো আমাদের মধ্যে আছেন, কিন্তু রক্তপিপাসু পরীক্ষাদানবের কাছে শিশুদের মন বলি দিতে তাঁদের এত অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হয় যে শিক্ষার উপরের তলায় ওঠবার সময় থাকে না।

আমেরিকান লেখক সংস্কৃতির এই ফলশ্রুতি বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেন সংস্কৃতির প্রভাবে চিন্তের সেই ঔদার্য ঘটে যাতে করে অন্তঃকরণে শান্তি আসে, আপনার প্রতি শ্রদ্ধা আসে,

আত্মসংযম আসে এবং মনে মৈত্রীভাবের সঞ্চার হয়ে জীবনের প্রত্যেক অবস্থাকেই কল্যাণময় করে।

একদিন দেখেছিলাম শান্তিনিকেতনের পথে গোরুর গাড়ির চাকা কাদায় বসে গিয়েছিল; আমাদের ছাত্ররা সকলে মিলে ঠেলে উদ্ধার করে দিলে। সেদিন কোনো অভ্যাগত আশ্রমে যখন উপস্থিত হলেন তাঁর মোট বয়ে আনবার কুলি ছিল না; আমাদের কোনো তরুণ ছাত্র অসংকোচে তাঁর বোঝা পিঠে করে নিয়ে যথাস্থানে এনে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। অপরিচিত অতিথিমাত্রের সেবা আনুকূল্য তারা কর্তব্য বলে জ্ঞান করত। সেদিন তারা আশ্রমের পথ নির্মাণ করেছে, গর্ত বুজিয়ে দিয়েছে। এ-সমস্তই তাদের সতর্ক ও বলিষ্ঠ সৌজন্যের অঙ্গ ছিল, বইয়ের পাতা অতিক্রম করে তাদের শিক্ষার মধ্যে সংস্কৃতি প্রবেশ করেছিল। সেই-সব ছেলেদের প্রত্যেককে তখন আমি জানতাম; তার পরে অনেক দিন তাদের অনেককে দেখি নি। আশা করি তারা নিন্দাবিলাসী নয়, পরশ্রীকাতর নয়, অক্ষমকে সাহায্য করতে তারা তৎপর এবং ভালোকে তারা ঠিকমত যাচাই করতে জানে।

শিক্ষার স্বাক্ষীকরণ

আমাদের দেশের আর্থিক দারিদ্র্য দুঃখের বিষয়, লজ্জার বিষয় আমাদের দেশের শিক্ষার অকিঞ্চিৎকরত্ব। এই অকিঞ্চিৎকরত্বের মূলে আছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার অস্বাভাবিকতা, দেশের মাটির সঙ্গে এই ব্যবস্থার বিচ্ছেদ। চিত্তবিকাশের যে আয়োজনটা স্বভাবতই সকলের চেয়ে আপন হওয়া উচিত ছিল সেইটেই রয়েছে সব চেয়ে পর হয়ে-তার সঙ্গে আমাদের দড়ির যোগ হয়েছে, নাড়ীর যোগ হয় নি; এর ব্যর্থতা আমাদের স্বাজাতিক ইতিহাসের শিকড়কে জীর্ণ করেছে, খর্ব করে দিচ্ছে সমস্ত জাতির মানসিক পরিবৃদ্ধিকে। দেশের বহুবিধ অতিপ্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থায় অনাত্মীয়তার দুঃসহ ভার অগত্যই চেপে রয়েছে; আইন আদালত, সকলপ্রকার সরকারি কার্যবিধি, যা বহুকেটি ভারতবাসীর ভাগ্য চালনা করে, তা সেই বহুকেটি ভারতবাসীর পক্ষে সম্পূর্ণ দুর্বোধ, দুর্গম। আমাদের ভাষা, আমাদের আর্থিক অবস্থা, আমাদের অনিবার্য অশিক্ষার সঙ্গে রাষ্ট্রশাসনবিধির বিপুল ব্যবধান-বসত পদে পদে যে দুঃখ ও অপব্যয় ঘটে তার পরিমাণ প্রভূত। তবু বলতে পারি ‘এহ বাহ্য’। কিন্তু শিক্ষাব্যাপার দেশের প্রাণগত আপন জিনিস

না হওয়া তার চেয়ে মর্মান্তিক। ল্যাবরেটরিতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবিত কৃত্রিম অগ্নি দেশের পেট ভরাবার মতো সেই চেষ্টা অতি অল্পসংখ্যক পেটেই সেটা পৌঁছয়, এবং সেটাকে সম্পূর্ণ রক্তে পরিণত করবার শক্তি অতি অল্প পাকযন্ত্রেরই থাকে। দেশের চিত্তের সঙ্গে দেশের শিক্ষার এই দূরত্ব এবং সেই শিক্ষার অপমানজনক স্বল্পতা দীর্ঘকাল আমাকে বেদনা দিয়েছে; কেননা নিশ্চিত জানি সকল পরাশ্রয়তার চেয়ে ভয়াবহ, শিক্ষায় পরধর্ম। এ সম্বন্ধে বরাবর আমি আলোচনা করেছি, আবার তার পুনরুক্তি করতে প্রবৃত্ত হলেম; যেখানে ব্যথা সেখানে বার বার হাত পড়ে। আমার এই প্রসঙ্গে পুনরুক্তি অনেকেই হয়তা ধরতে পারবেন না; কেননা অনেকেরই কানে আমার সেই পুরোনো কথা পৌঁছয় নি। যাঁদের কাছে পুনরুক্তি ধরা পড়বে তাঁরা যেন ক্ষমা করেন। কেননা আজ আমি দুঃখের কথা বলতে এসেছি, নূতন কথা বলতে আসি নি। আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া যেমন নিত্যই আপনার পুনরাবৃত্তি করতে থাকে, আমাদের দেশের সকল সাংঘাতিক দুঃখগুলির সেই দশা। ম্যালেরিয়া অপ্রতিহার্য নয় এ কথায় যাদের নিশ্চিত বিশ্বাস তাদেরই অজেয় ইচ্ছা ও প্রবল অধ্যবসায়ের কাছে ম্যালেরিয়া দৈববিহিত দুর্যোগের ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে দিয়ে বিদায় গ্রহণ করে। অন্যশ্রেণীয় দুঃখও নিজের পৌরুষের দ্বারা প্রতিহত হতে পারে এই বিশ্বাসের দোহাই পাড়বার কর্তব্যতা স্মরণ করে অপটু দেহ নিয়ে আজ এসেছি।

একদা একজন অব্যবসায়ী ভদ্রসন্তান তাঁর চেয়ে আনাড়ি এক ব্যক্তির বাড়ি তৈরি করবার ভার নিয়েছিলেন। মাল-মসলার জোগাড় হয়েছিল সেরা দরের; ইমারতের গাঁথুনি হয়েছিল মজবুত; কিন্তু কাজ হয়ে গেলে প্রকাশ পেল, সিঁড়ির কথাটা কেউ ভাবে নি। শনির চক্রান্তে এমনতরো পৌরব্যবস্থা যদি কোনে রাজ্যে থাকে যেখানে একতলার লোকের নিত্যবাস একতলাতেই আর দোতলার লোকের দোতলায়, তবে সেখানে সিঁড়ির কথাটা ভাবা নিতান্তই বাহুল্য। কিন্তু আলোচিত পূর্বোক্ত বাড়িটাতে সিঁড়িযোগে উর্ধ্বপথযাত্রায় একতলার প্রয়োজন ছিল; এই ছিল তার উন্নতিলাভের একমাত্র উপায়।

এ দেশে শিক্ষা-ইমারতে সিঁড়ির সংকল্প গোড়া থেকেই আমাদের রাজমিস্ত্রির প্ল্যানে ওঠে নি। নীচের তলাটা উপরের তলাকে নিঃস্বার্থ ধৈর্যে শিরোধার্য করে নিয়েছে : তার ভার বহন করেছে, কিন্তু সুযোগ গ্রহণ করে নি; দাম জুগিয়েছে, মাল আদায় করে নি।

আমার পূর্বকার লেখায় এ দেশের সিঁড়িহারা শিক্ষাবিধানে এই মস্ত ফাঁকটার উল্লেখ করেছিলুম। তা নিয়ে কোনো পাঠকের মনে কোনো-যে উদ্বেগ ঘটেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তার কারণ, অভ্রভেদী বাড়িটাই আমাদের অভ্যস্ত, তার গৌরবে আমরা অভিভূত, তার বুকের কাছটাতে উপর-নীচে সম্বন্ধস্থাপনের যে সিঁড়ির নিয়মটা ভদ্র নিয়ম সেটাতে আমাদের অভ্যাস হয় নি। সেইজন্যেই ইতিপূর্বে আমার আলোচ্য বিষয়টা হয়তো সেলাম পেয়ে থাকবে, কিন্তু আসন পায় নি। তবু আর-একবার চেষ্টা দেখতে দোষ নেই, কেননা ভিতরে ভিতরে কখন যে দেশের মনে হাওয়া বদল হয় পরীক্ষা না করে তা বলা যায় না।

শিক্ষা সম্বন্ধে সব চেয়ে স্বীকৃত এবং সব চেয়ে উপেক্ষিত কথাটা এই যে, শিক্ষা জিনিসটি জৈব, ওটা যান্ত্রিক নয়। এর সম্বন্ধে কার্যপ্রণালীর প্রসঙ্গ পরে আসতে পারে, কিন্তু প্রাণক্রিয়ার প্রসঙ্গ সর্বাত্মে। ইনকুবেটর যন্ত্রটা সহজ নয় বলেই কৌশল এবং অর্থব্যয়ের দিক থেকে তার বিবরণ শুনতে খুব মস্ত; কিন্তু মূর্গির জীবনধর্মানুগত ডিম-পাড়াটা সহজ বলেই বেশি কথা জোড়ে না, তবু সেটাই অগ্রগণ্য।

বেঁচে থাকার নিয়ত ইচ্ছা ও সাধনাই হচ্ছে বেঁচে থাকার প্রকৃতিগত লক্ষণ। যে সমাজে প্রাণের জোর আছে সে সমাজ টিকে থাকবার স্বাভাবিক গরজেই আত্মরক্ষাঘটিত দুটি সর্বপ্রধান প্রয়োজনের দিকে অক্লান্তভাবে সজাগ থাকে, অন্ন আর শিক্ষা, জীবিকা আর বিদ্যা। সমাজের উপরের থাকের লোক খেয়ে-পরে পরিপুষ্ট থাকবে আর নীচের থাকের লোক অর্ধাশনে বা অনশনে বাঁচে কি মরে সে সম্বন্ধে সমাজ থাকবে অচেতন, এটাকে বলা যায় অর্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত। এই অসাড়তার ব্যামোটা বর্বরতার ব্যামো।

পশ্চিম-মহাদেশে আজ সর্বব্যাপী অর্থসংকটের সঙ্গে সঙ্গে অন্নসংকট প্রবল হয়েছে। এই অভাব-নিবারণের জন্যে সেখানকার বিদ্বানের দল এবং গবর্নেন্ট যেরকম অসামান্য দাক্ষিণ্য প্রকাশ করছেন সেরকম উদ্বেগ এবং চেষ্টা আমাদের বহুসহিষ্ণু বুভুক্ষার অভিজ্ঞতায় সম্পূর্ণ অপরিচিত। এ নিয়ে বড়ো বড়ো অঙ্কের ঋণ স্বীকার করতেও তাঁদের সংকোচ দেখি নে। আমাদের দেশে দু বেলা দু মুঠো খেতে পায় অতি অল্প লোক, বাকি বারো-আনা লোক আধপেটা খেয়ে ভাগ্যকে দায়ী করে এবং জীবিকার কৃপণ পথ থেকে মৃত্যুর উদার পথে সরে পড়তে বেশি দেরি করে না। এর থেকে যে নির্জীবতার সৃষ্টি হয়েছে তার পরিমাণ কেবল মৃত্যুসংখ্যার তালিকা দিয়ে নিরূপিত হতে পারে না। নিরুৎসাহ অবসাদ অকর্মণ্যতা রোগপ্রবণতা মেপে দেখবার প্রত্যক্ষ মানদণ্ড যদি থাকত তা হলে দেখতে পেতুম এ দেশের এক প্রান্ত থেকে

আর-এক প্রান্ত জুড়ে প্রাণকে ব্যঙ্গ করছে মৃত্যু; সে অতি কুৎসিত দৃশ্য, অত্যন্ত শোচনীয়। কোনো স্বাধীন সভ্য দেশ মৃত্যুর এরকম সর্বনেশে নাট্যলীলা নিশ্চেষ্টভাবে স্বীকার করতেই পারে না, আজ তার প্রমাণ ভারতের বাইরে নানা দিক থেকেই পাচ্ছি।

শিক্ষা সম্বন্ধেও সেই একই কথা। শিক্ষার অভিসেচনক্রিয়া সমাজের উপরের স্তরকেই দুই-এক ইঞ্চি মাত্র ভিজিয়ে দেবে আর নীচের স্তরপরম্পরা নিত্যনীরস কাঠিন্যে সুদূর-প্রসারিত মরুসময়তাকে ক্ষীণ আবরণে ঢাকা দিয়ে রাখবে, এমন চিত্তঘাতী সুগভীর মূর্খতাকে কোনো সভ্য সমাজ অলসভাবে মেনে নেয় নি। ভারতবর্ষকে মানতে বাধ্য করেছে আমাদের যে নির্মম ভাগ্য তাকে শতবার ধিক্কার দিই।

এমন কোনো কোনো গ্রহ উপগ্রহ আছে যার এক অর্ধেকের সঙ্গে অন্য অর্ধেকের চিরস্থায়ী বিচ্ছেদ; সেই বিচ্ছেদ আলোক-অন্ধকারের বিচ্ছেদ। তাদের একটা পিঠ সূর্যের অভিমুখে, অন্য পিঠ সূর্যবিমুখ। তেমনি করে যে সমাজের এক অংশে শিক্ষার আলোক পড়ে, অন্য বৃহত্তর অংশ শিক্ষাবিহীন, সে সমাজ আত্মবিচ্ছেদের অভিশাপে অভিশপ্ত। সেখানে শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মাঝখানে অসূর্যম্পস্য অন্ধকারের ব্যবধান। দুই ভিন্নজাতীয় মানুষের চেয়েও এদের চিত্তের ভিন্নতা আরো বেশি প্রবল। একই নদীর এক পারের স্রোত ভিতরে ভিতরে অন্য পারের স্রোতের বিরুদ্ধ দিকে চলছে; সেই উভয় বিরুদ্ধের পার্শ্ববর্তিতাই এদের দূরত্বকে আরো প্রবলভাবে প্রমাণিত করে।

শিক্ষার ঐক্য-যোগে চিত্তের ঐক্য-রক্ষাকে সভ্য সমাজ মাত্রই একান্ত অপরিহার্য বলে জানে। ভারতের বাইরে নানা স্থানে ভ্রমণ করেছি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মহাদেশে। দেখে এসেছি, এশিয়ায় নবজাগরণের যুগ সর্বত্রই জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের দায়িত্ব একান্ত আগ্রহের সঙ্গে স্বীকৃত। বর্তমান যুগের সঙ্গে যে-সব দেশ চিত্তের ও বিত্তের আদানপ্রদান বুদ্ধিবিচারের সঙ্গে চালনা করতে না পারবে তারা কেবলই হঠে যাবে, কোণ-ঠেসা হয়ে থাকবে, এই শঙ্কার কারণ দূর করতে কোনো ভদ্র দেশ অর্থাভাবের কৈফিয়ত মানে নি। আমি যখন রাশিয়ায় গিয়েছিলুম তখন সেখানে আট বছর মাত্র নূতন স্বরাজতন্ত্রের প্রবর্তন হয়েছে; তার প্রথম ভাগে অনেক কাল বিদ্রোহে বিপ্লবে দেশ ছিল শান্তিহীন, অর্থসচ্ছলতা ছিলই না। তবু এই স্বল্পকালেই রাশিয়ার বিরাট রাজ্যে প্রজাসাধারণের মধ্যে যে অদ্ভুত দ্রুতগতিতে শিক্ষাবিস্তার হয়েছে সেটা ভাগ্যবঞ্চিত ভারতবাসীর কাছে অসাধ্য ইন্দ্রজাল বলেই মনে হল।

শিক্ষার ঐক্য-সাধন, ন্যাশনল ঐক্য-সাধনের মূলে, এই সহজ কথা সুস্পষ্ট করে বুঝতে আমাদের দেরি হয়েছে তারও কারণ আমাদের অভ্যাসের বিকার। একদা মহাত্মা গোখলে যখন সার্বজনিক অবশ্যশিক্ষা প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছিলেন তখন সব চেয়ে বাধা পেয়েছিলেন বাংলাপ্রদেশের কোনো কোনো গণ্যমান্য লোকের কাছ থেকেই। অথচ, রাষ্ট্রীয় ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা এই বাংলাদেশেই সব চেয়ে মুখর ছিল। শিক্ষার অনৈক্যে বিজড়িত থেকেও রাষ্ট্রিক উন্নতির পথে এগিয়ে চলা সম্ভবপর এই কল্পনা এ প্রদেশের মনে বাধা পায় নি, এই অনৈক্যের অভ্যাস এমনিই ছিল মজ্জাগত। অভ্যাসে চিন্তার যে জড়ত্ব আনে আমাদের দেশে তার আর-একটা দৃষ্টান্ত ঘরে ঘরেই আছে। আহারে কুপথ্য বাঙালির প্রাত্যহিক, বাঙালির মুখরোচক; সেটা আমাদের কাছে এতই সহজ হয়ে গেছে যে, যখন দেহটার আধমরা দশা বিচার করি তখন ডাক্তারের কথা ভাবি, ওষুধের কথা ভাবি, হাওয়া-বদলের কথা ভাবি, তুকতাক-মন্ত্রতন্ত্রের কথা ভাবি, এমন-কি, বিদেশী শাসনকেও সন্দেহ করি, কিন্তু পথ্যসংস্কারের কথা মনেও আসে না। নৌকোটর নোঙর থাকে মাটি আঁকড়িয়ে, সেটা চোখে পড়ে না; মনে করি পালটা ছেঁড়া বলেই পারঘাটে পৌঁছনো হচ্ছে না।

আমার কথার জবাবে এমন তর্ক হয়তো উঠবে, আমাদের দেশে সমাজ পূর্বেও তো সজীব ছিল, আজও একেবারে মরে নি-তখনো কি আমাদের দেশ শিক্ষায় অশিক্ষায় যেন জলে স্থলে বিভক্ত ছিল না? তখনকার টোলে চতুষ্পাঠীতে তর্কশাস্ত্র ব্যাকরণশাস্ত্রের যে প্যাঁচ-কষাকষি চলত সে তো ছিল পণ্ডিত পালোয়ানদের ওস্তাদি-আখড়াতেই বদ্ধ : তার বাইরে যে বৃহৎ দেশটা ছিল সেও কি সর্বত্র ঐরকম পালোয়ানি কায়দায় তাল ঠুকে পাঁয়তারা করে বেড়াত? যা ছিল বিদ্যানামধারী পরিণত গজের বপ্রক্রীড়া সেই দিগ্গজ পণ্ডিতি তো তার গুঁড় আশ্ফালন করে নি দেশের ঘরে ঘরে। কথাটা মেনে নিলুম। বিদ্যার যে আড়ম্বর, নিরবচ্ছিন্ন পাণ্ডিত্য, সকল দেশেই সেটা প্রাণের ক্ষেত্র থেকে দূরবর্তী। পাশ্চাত্য দেশেও স্থূলপদবিক্ষেপে তার চলন আছে, তাকে বলে পেডেনট্রি। আমার বক্তব্য এই যে, এ দেশে একদা বিদ্যার যে ধারা সাধনার দুর্গম তুঙ্গ শৃঙ্গ থেকে নির্ঝরিত হত সেই একই ধারা সংস্কৃতিরূপে দেশকে সকল স্তরেই অভিষিক্ত করেছে। এজন্যে যান্ত্রিক নিয়মে এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের কারখানা-ঘর বানাতে হয় নি; দেহে যেমন প্রাণশক্তির প্রেরণায় মোটা ধমনীর রক্তধারা নানা আয়তনের বহুসংখ্যক শিরা-উপশিরা-যোগে সমস্ত দেহে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রবাহিত হতে থাকে তেমনি করেই আমাদের দেশের সমস্ত সমাজদেহে

একই শিক্ষা স্বাভাবিক প্রাণপ্রক্রিয়ায় নিরন্তর সঞ্চারিত হয়েছে-নাড়ীর বাহনগুলি কোনোটা-বা স্থূল কোনোটা-বা অতি সূক্ষ্ম, কিন্তু তবু তারা এক কলেবর-ভুক্ত নাড়ী, এবং রক্তও একই প্রাণ-ভরা রক্ত।

অরণ্য যে মাটি থেকে প্রাণরস শোষণ করে বেঁচে আছে সেই মাটিকে আপনিই প্রতিনিয়ত প্রাণের উপাদান অজস্র জুগিয়ে থাকে। তাকে কেবলই প্রাণময় করে তোলে। উপরের ডালে যে ফল সে ফলায় নীচের মাটিতে তার আয়োজন তার নিজকৃত। অরণ্যের মাটি তাই হয়ে ওঠে আরণ্যিক, নইলে সে হত বিজাতীয় মরু। যেখানে মাটিতে সেই উদ্ভিদসার পরিব্যাপ্ত নয় সেখানে গাছপালা বিরল হয়ে জন্মায়, উপবাসে বৈঁকেচুরে শীর্ণ হয়ে থাকে। আমাদের সমাজের বনভূমিতে একদিন উচ্চশীর্ষ বনস্পতির দান নীচের ভূমিতে নিত্যই বর্ষিত হত। আজ দেশে যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে মাটিকে সে দান করেছে অতি সামান্য; ভূমিকে সে আপন উপাদানে উর্বরা করে তুলছে না। জাপান প্রভৃতি দেশের সঙ্গে আমাদের এই প্রভেদটাই লজ্জাজনক এবং শোকাবহ। আমাদের দেশ আপন শিক্ষার ভূমিকা সৃষ্টি সম্বন্ধে উদাসীন। এখানে দেশের শিক্ষা এবং দেশের বৃহৎ মন পরস্পরবিচ্ছিন্ন। সেকালে আমাদের দেশের মস্ত মস্ত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের সঙ্গে নিরক্ষর গ্রামবাসীরা মনঃপ্রকৃতির বৈপরীত্য ছিল না। সেই শাস্ত্রজ্ঞানের প্রতি তাদের মনের অভিমুখিতা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সেই ভোজে অর্ধভোজন তাদের ছিল নিত্য, কেবল ঘ্রাণে নয়, উদ্ভূত উপভোগে।

কিন্তু সায়াসে-গড়া পাশ্চাত্যবিদ্যার সঙ্গে আমাদের দেশের মনের যোগ হয় নি; জাপানে সেটা হয়েছে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে, তাই পাশ্চাত্যশিক্ষার ক্ষেত্রে জাপান স্বরাজের অধিকারী। এটা তার পাস-করা বিদ্যা নয়, আপন-করা বিদ্যা। সাধারণের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক, সায়াসে ডিগ্রি-ধারী পণ্ডিত এ দেশে বিস্তর আছে যাদের মনের মধ্যে সায়াসের জমিনটা তলতলে, তাড়াতাড়ি যা-তা বিশ্বাস করতে তাদের অসাধারণ আগ্রহ, মেকি সায়াসের মন্ত্র পড়িয়ে অন্ধ সংস্কারকে তারা সায়াসের জাতে তুলতে কুণ্ঠিত হয় না। অর্থাৎ, শিক্ষার নৌকোতে বিলিতি দাঁড় বসিয়েছি, হাল লাগিয়েছি, দেখতে হয়েছে ভালো, কিন্তু সমস্ত নদীটার স্রোত উলটো দিকে-নৌকো পিছিয়ে পড়ে আপনিই। আধুনিক কালে বর্বর দেশের সীমানার বাইরে ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ যেখানে শতকরা আট-দশ জনের মাত্র অক্ষর-পরিচয় আছে। এমন দেশে ঘটা ক'রে বিদ্যাশিক্ষার আলোচনা করতে লজ্জা বোধ করি। দশ জন মাত্র যার প্রজা তার রাজত্বের

কথাটা চাপা দেওয়াই ভালো। বিশ্ববিদ্যালয় অক্সফোর্ডে আছে, কেমব্রিজে আছে, লণ্ডনে আছে। আমাদের দেশেও স্থানে স্থানে আছে, পূর্বোক্তের সঙ্গে এদের ভাবভঙ্গি ও বিশেষণের মিল দেখে আমরা মনে ক'রে বসি এরা পরস্পরের সর্বর্ণ : যেন ওটিন ক্রিম ও পাউডার মাখলেই মেমসাহেবের সঙ্গে সত্যসত্যই বর্ণভেদ ঘুচে যায়। বিশ্ববিদ্যালয় যেন তার ইমারতের দেওয়াল এবং নিয়মাবলীর পাকা প্রাচীরের মধ্যেই পর্যাপ্ত। অক্সফোর্ড কেমব্রিজ বলতে শুধু এটুকুই বোঝায় না, তার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শিক্ষিত ইংলণ্ডকেই বোঝায়। সেইখানেই তারা সত্য, তারা মরীচিকা নয়। আর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় হঠাৎ থেমে গেছে তার আপন পাকা প্রাচীরের তলাটাতেই। থেমে যে গেছে সে কেবল বর্তমানের অসমাপ্তিবশত নয়। এখনো বয়স হয় নি ব'লে যে মানুষটি মাথায় খাটো তার জন্যে আক্ষেপ করবার দরকার নেই, কিন্তু যার ধাতের মধ্যেই সম্পূর্ণ বাড়বার জৈবধর্ম নেই তাকে যেন গ্রেনেডিয়ারের স্বজাতীয় বলে কল্পনা না করি। গোড়ায় যাঁরা এ দেশে তাঁদের রাজতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থার পত্তন করেছিলেন, দেখতে পাই, তাঁদেরও উত্তরাধিকারীরা বাইরের আসবাব এবং হুঁট-কাঠ-চুন-সুরকির প্যাটার্ন দেখিয়ে আমাদের এবং নিজেদেরকে ভোলাতে আনন্দ বোধ করেন। কিছুকাল পূর্বে একদিন কাগজে পড়েছিলুম, অন্য-এক প্রদেশের রাজ্যসচিব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত-পত্তনের সময়ে বলেছিলেন যে, যারা বলে ইমারতের বাহুল্যে আমরা শিক্ষার সম্বল খর্ব করি তারা অবুঝ, কেননা শিক্ষা তো কেবল জ্ঞানলাভ নয়, ভালো দালানে বসে পড়াশুনো করা সেও একটা শিক্ষা। অর্থাৎ ক্লাসে বড়ো অধ্যাপকের চেয়ে বড়ো দেওয়ালটা বেশি বৈ কম নয়। আমাদের নালিশ এই যে, তলোয়ারটা যেখানে তালপাতার চেয়ে বেশি দামি করা অর্থাভাববশত অসম্ভব ব'লে সংবাদ পাই সেখানে তার খাপটাকে ইস্পাত দিয়ে বাঁধিয়ে দিলে আসল কাজ এগোয় না। তার চেয়ে ঐ ইস্পাতকে গলিয়ে একটা চলনসই গোছের ছুরি বানিয়ে দিলেও কতকটা সান্ত্বনার আশা থাকে।

আসল কথা, প্রাচ্য দেশে মূল্যবিচারের যে আদর্শ তাতে আমরা উপকরণকে অমৃতের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার দরকার বোধ করি নে। বিদ্যা জিনিসটি অমৃত, হুঁটকাঠের দ্বারা তার পরিমাপের কথা আমাদের মনেই হয় না। আন্তরিক সত্যের দিকে যা বড়ো বাহ্য রূপের দিকে তার আয়োজন আমাদের বিচারে না হলেও চলে। অন্তত, এতকাল সেইরকমই আমাদের মনের ভাব ছিল। বস্তুত, আমাদের দেশের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় আজও আছে বারাণসীতে। অত্যন্ত সত্য,

নিতান্ত স্বভাবিক, অথচ মস্ত করে চোখে পড়ে না। এ দেশের সনাতন সংস্কৃতির মূল উৎস সেইখানেই, কিন্তু তার সঙ্গে না আছে ইমারত, না আছে অতিজটিল ব্যয়সাধ্য ব্যবস্থাপ্রণালী। সেখানে বিদ্যাদানের চিরন্তন ব্রত দেশের অন্তরের মধ্যে অলিখিত অনুশাসনে লেখা। বিদ্যাদানের পদ্ধতি, তার নিঃস্বার্থ নিষ্ঠা, তার সৌজন্য, তার সরলতা, গুরুশিষ্যের মধ্যে অকৃত্রিম হৃদ্যতার সম্বন্ধ, সর্বপ্রকার আড়ম্বরকে উপেক্ষা করে এসেছে-কেননা, সত্যেই তার পরিচয়। প্রাচ্য দেশের কারিগররা যেরকম অতি সামান্য হাতিয়ার দিয়ে অতি অসামান্য শিল্পদ্রব্য তৈরি করে থাকে পাশ্চাত্য বুদ্ধি তা কল্পনা করতে পারে না। যে নৈপুণ্যটি ভিতরের জিনিস তার বাহন প্রাণে এবং মনে। বাইরের স্থূল উপাদানটি অত্যন্ত হয়ে উঠলে আসল জিনিসটি চাপা পড়ে।

দুর্ভাগ্যক্রমে এই সহজ কথাটা আমরাই আজকাল পাশ্চাত্যের চেয়েও কম বুঝি। গরিব যখন ধনীকে মনে মনে ঈর্ষা করে তখন এইরকমই বুদ্ধিবিকার ঘটে। কোনো অনুষ্ঠানে যখন আমরা পাশ্চাত্যের অনুকরণ করি তখন ইঁট-কাঠের বাহুল্যে এবং যন্ত্রের চক্রে উপচক্রে নিজেকে ও অন্যকে ভুলিয়ে গৌরব করা সহজ। আসল জিনিসের কার্পণ্যে এইটেরই দরকার হয় বেশি। আসলের চেয়ে নকলের সাজসজ্জা স্বভাবতই যায় বাহুল্যের দিকে। প্রত্যহই দেখতে পাই, পূর্বদেশে জীবনসমস্যার আমরা যে সহজ সমাধান করেছিলুম তার থেকে কেবলই আমরা স্থলিত হচ্ছি। তার ফলে হল এই যে, আমাদের অবস্থাটা রয়ে গেল পূর্ববৎ, এমন-কি, তার চেয়ে কয়েক ডিগ্রি নীচের দিকে, অথচ আমাদের মেজাজটা ধার করে এনেছি অন্য দেশ থেকে যেখানে সমারোহের সঙ্গে তহবিলের বিশেষ আড়াআড়ি নেই।

মনে করে দেখো-না-এ দেশে বহুরোগজর্জর জনসাধারণের আরোগ্যবিধানের জন্যে রিক্ত রাজকোষের দোহাই দিয়ে ব্যয়সংকোচ করতে হয়, দেশজোড়া অতিবিরিট মূর্খতার কালিমা যথোচিত পরিমার্জন করতে অর্থে কুলোয় না, অর্থাৎ যে-সব অভাবে দেশ অন্তরে-বাহিরে মৃত্যুর তলায় তলাচ্ছে তার প্রতিকারের অতি ক্ষীণ উপায় দেউলে দেশের মতোই; অথচ এ দেশে শাসনব্যবস্থায় ব্যয়ের অজস্র প্রাচুর্য একেবারেই দরিদ্র দেশের মতো নয়। তার ব্যয়ের পরিমাণ স্বয়ং পাশ্চাত্য ধনী দেশকেও অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এমন-কি, বিদ্যাবিভাগের সমস্ত বাহ্য ঠাট বজায় রাখবার ব্যয় বিদ্যা-পরিবেশনের চেয়ে বেশি। অর্থাৎ গাছের পাতাকে দর্শনধারী আকারে ঝাঁকড়া করে তোলবার খাতিরে ফল ফলাবার রস-জোগানে টানাটানি চলছে। তা হোক,

এর এই বাইরে দিকের আভাবের চেয়ে এর মর্মগত গুরুতর অভাবটাই সব চেয়ে দুশ্চিন্তার বিষয়। সেই কথাটাই বলতে চাই। সেই অভাবটা শিক্ষার যথাযোগ্য আধারের অভাব। আজকালকার অস্ট্রাচিকিৎসায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বাইরে থেকে জোড়া লাগাবার কৌশল ক্রমশই উৎকর্ষ লাভ করছে। কিন্তু বাইরে-থেকে-জোড়া-লাগা জিনিসটা সমস্ত কলেবরের সঙ্গে প্রাণের মিলে মিলিত না হলে সেটাকে সুচিকিৎসা বলে না। তার ব্যাণ্ডেজ-বন্ধনের উত্তরোত্তর প্রভূত পরিস্থিতি দেখে স্বয়ং রোগীর মনেও গর্ব এবং তৃপ্তি হতে পারে, কিন্তু মুমূর্ষু প্রাণপুরুষের এতে সান্ত্বনা নেই। শিক্ষা সম্বন্ধে এই কথাটা পূর্বেই বলেছি। বলেছি, বাইরের থেকে আহরিত শিক্ষাকে সমস্ত দেশ যতক্ষণ আপন করতে না পারবে ততক্ষণ তার বাহ্য উপকরণের দৈর্ঘ্যপ্রস্থের পরিমাপটাকে হিসাবের খাতায় লাভের কোঠায় ফেললে হুন্ডি-কাটা ধারের টাকাটাকে মূলধনহারা ব্যবসায়ে মুনাফা বলে আনন্দ করার মতো হয়। সেই আপন করবার সর্বপ্রধান সহায় আপন ভাষা। শিক্ষার সকল খাদ্য ঐ ভাষার রসায়নে আমাদের আপন খাদ্য হয়। পক্ষীশাবক গোড়া থেকেই পোকা খেয়ে মানুষ; কোনো মানবসমাজে হঠাৎ যদি কোনো পক্ষীমহারাজের একাধিপত্য ঘটে তা হলেই কি এমন কথা বলা চলবে যে, সেই রাজখাদ্যটা খেলেই মানুষ-প্রজাদেরও পাখা গজিয়ে উঠবে।

শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ, জগতে এই সর্বজনস্বীকৃত নিরতিশয় সহজ কথাটা বহুকাল পূর্বে একদিন বলেছিলাম; আজও তার পুনরাবৃত্তি করব। সেদিন যা ইংরেজি-শিক্ষার মন্ত্র-মুগ্ধ কর্ণকুহরে অশ্রাব্য হয়েছিল আজও যদি তা লক্ষ্যব্রষ্ট হয় তবে আশা করি, পুনরাবৃত্তি করবার মানুষ বারে বারে পাওয়া যাবে।

আপন ভাষায় ব্যাপকভাবে শিক্ষার গোড়াপত্তন করবার আগ্রহ স্বভাবতই সমাজের মনে কাজ করে, এটা তার সুস্থ চিত্তের লক্ষণ। রামমোহন রায়ের বন্ধু পাদ্রি এডাম সাহেব বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন তাতে দেখা যায় বাংলা-বিহারে এক লক্ষের উপর পাঠশালা ছিল, দেখা যায় প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই ছিল জনসাধারণকে অন্তত ন্যূনতম শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। এ ছাড়া প্রায় তখনকার ধনী মাত্রেই আপন চণ্ডীমণ্ডপে সামাজিক কর্তব্যের অঙ্গরূপে পাঠশালা রাখতেন, গুরুমশায় বৃত্তি ও বাসা পেতেন তাঁরই কাছ থেকে। আমার প্রথম অক্ষরপরিচয় আমাদেরই বাড়ির দালানে, প্রতিবেশী পোড়োদের সঙ্গে। মনে আছে এই

দালানের নিভৃত খ্যাতিহীনতা ছেড়ে আমার সতীর্থ আত্মীয় দুজন যখন অশ্বরথযোগে সরকারি বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পেলেন তখন মানহানির দুঃসহ দুঃখে অশ্রুপাত করেছি এবং গুরুমশায় আশ্চর্য ভবিষ্যৎদৃষ্টির প্রভাবে বলেছিলেন, ঐখান থেকে ফিরে আসবার ব্যর্থ প্রয়াসে আরো অনেক বেশি অশ্রু আমাকে ফেলতে হবে। তখনকার প্রথম শিক্ষার জন্য শিশুশিক্ষা প্রভৃতি যে-সকল পাঠ্যপুস্তক ছিল, মনে আছে, অবকাশকালেও বার বার তার পাতা উলটিয়েছি। এখনকার ছেলেদের কাছে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হব, কিন্তু সমস্ত দেশের শিক্ষা-পরিবেশনের স্বাভাবিক ইচ্ছা ঐ অত্যন্ত গরিব-ভাবে-ছাপানো বইগুলির পত্রপুটে রক্ষিত ছিল-এই মহৎ গৌরব এখনকার কোনো শিশুপাঠ্য বইয়ে পাওয়া যাবে না। দেশের খাল-বিল-নদী-নালায় আজ জল শুকিয়ে এল, তেমনি রাজার অনাদরে আধমরা হয়ে এল সর্বসাধারণের নিরক্ষরতা দূর করবার স্বাদেশিক ব্যবস্থা।

দেশে বিদ্যাশিক্ষার যে সরকারি কারখানা আছে তার চাকায় সামান্য কিছু বদল করতে হলে অনেক হাতুড়ি-পেটাপিটির দরকার হয়। সে খুব শক্ত হাতের কর্ম। সেই শক্ত হাতই ছিল আশু মুখুজে মশায়ের। বাঙালির ছেলে ইংরেজিবিদ্যায় যতই পাকা হোক, তবু শিক্ষা পুরো করবার জন্যে তাকে বাংলা শিখতেই হবে, ঠেলা দিয়ে মুখুজেমশায় বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়কে এতটা দূর পর্যন্ত বিচলিত করেছিলেন। হয়তো ঐ পথটায় তার চলৎশক্তির সূত্রপাত করে দিয়েছেন, হয়তো তিনি বেঁচে থাকলে চাকা আরো এগোত। হয়তো সেই চালনার সংকেত মন্ত্রণাসভার দফতরে এখনো পরিণতির দিকে উন্মুখ আছে।

তবু আমি যে আজ উদ্বেগ প্রকাশ করছি তার কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের যানবাহনটা অত্যন্ত ভারী এবং বাংলাভাষার পথ এখনো কাঁচা পথ। এই সমস্যা-সমাধান দুরূহ বলে পাছে হতে-করতে এমন একটা অতি অস্পষ্ট ভাবী কালে তাকে ঠেলে দেওয়া হয় যা অসম্ভাবিতের নামান্তর, এই আমাদের ভয়। আমাদের গতি মন্দাক্রান্ত, কিন্তু আমাদের অবস্থাটা সবুর করবার মতো নয়। তাই আমি বলি পরিপূর্ণ সুযোগের জন্যে সুদীর্ঘ কাল অপেক্ষা না করে অল্প বহরে কাজটা আরম্ভ করে দেওয়া ভালো, যেমন করে চারাগাছ রোপণ করে সেই সহজ ভাবে। অর্থাৎ তার মধ্যে সমগ্র গাছেরই আদর্শ আছে; বাড়তে বাড়তে দিনে দিনে সেই আদর্শ সম্পূর্ণ হয়। বয়স্ক ব্যক্তির পাশে শিশু যখন দাঁড়ায় সে আপন সমগ্রতার সম্পূর্ণ ইঙ্গিত নিয়েই দাঁড়ায়। এমন নয়, একটা ঘরে বছর-দুয়েক ধরে ছেলেটার কেবল পা'খানা তয়ের হচ্ছে, আর-একটা ঘরে

এগিয়েছে হাতের কনুইটা পর্যন্ত। এতদূর অত্যন্ত সতর্কতা সৃষ্টিকর্তার নেই। সৃষ্টির ভূমিকাতেও অপরিণতি সত্ত্বেও সমগ্রতা থাকে।

তেমনি বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সজীব সমগ্র শিশুমূর্তি দেখতে চাই, সে মূর্তি কারখানাঘরে-তৈরি খণ্ড খণ্ড বিভাগের ক্রমশ যোজনা নয়। বয়স্ক বিদ্যালয়ের পাশে এসেই সে দাঁড়াক বালকবিদ্যালয় হয়ে। তার বালকমূর্তির মধ্যেই দেখি তার বিজয়ী মূর্তি, দেখি ললাটে তার রাজাসন-অধিকারের প্রথম টিকা।

বিদ্যালয়ের কাজে যাঁরা অভিজ্ঞ তাঁরা জানেন, এক দল ছাত্র স্বভাবতই ভাষাশিক্ষায় অপটু। ইংরেজি ভাষায় অনধিকার সত্ত্বেও যদি তারা কোনোমতে ম্যাট্রিকের দেউড়িটা পেরিয়ে যায় উপরের সিঁড়ি ভাঙবার বেলায় বসে পড়ে, আর ঠেলে তোলা যায় না।

এই দুর্গতির অনেকগুলো কারণ আছে। একে তো যে ছেলের মাতৃভাষা বাংলা, ইংরেজি ভাষার মতো বালাই তার আর নেই। ও যেন বিলিতি তলোয়ারের খাপে দিশি খাঁড়া ভরবার কসরত। তার পরে, গোড়ার দিকে ভালো শিক্ষকের কাছে ভালো নিয়মে ইংরেজি শেখার সুযোগ অল্প ছেলেরই হয়, গরিবের ছেলের তো হয়ই না। তাই অনেক স্থলেই বিশল্যকরণীর পরিচয় ঘটে না বলেই গোটা ইংরেজি বই মুখস্থ করা ছাড়া উপায় থাকে না। সেরকম ত্রেতাযুগীয় বীরত্ব ক'জন ছেলের কাছে আশা করা যায়?

শুধু এই কারণেই কি তারা বিদ্যামন্দির থেকে আগুমানের চালান যাবার উপযুক্ত? ইংলণ্ডে একদিন চুরির দণ্ড ছিল ফাঁসি, এ যে তার চেয়েও কড়া আইন, এ যে চুরি করতে পারে না ব'লেই ফাঁসি। না বুঝে বই মুখস্থ ক'রে পাস করা কি চুরি ক'রে পাস করা নয়? পরীক্ষাগারে বইখানা চাদরের মধ্যে নিয়ে গেলেই চুরি, আর মগজের মধ্যে করে নিয়ে গেলে তাকে কী বলব? আস্ত-বই-ভাঙা উত্তর বসিয়ে যারা পাস করে তারাই তো চোরাই কড়ি দিয়ে পারানি জোগায়।

তা হোক, যে উপায়েই তারা পার হোক, নালিশ করতে চাই নে। তবু এ প্রশ্নটা থেকে যায় যে, বহুসংখ্যক যে-সব হতভাগা পার হতে পারল না তাদের পক্ষে হাওড়ার পুলটাই নাহয় দু-ফাঁক হয়েছে, কিন্তু কোনো রকমেরই সরকারি খেয়াও কি তাদের কপালে জুটবে না-একটা লাইসেন্স দেওয়া পান্সি, মোটর-চালিত নাই-বা হল, নাহয় হল দিশি হাতে-দাঁড়-টানা?

অন্য স্বাধীন দেশের সঙ্গে আমাদের একটা মস্ত প্রভেদ আছে। সেখানে শিক্ষার পূর্ণতার জন্যে যারা দরকার বোঝে তারা বিদেশী ভাষা শেখে। কিন্তু, বিদ্যার জন্যে যেটুকু আবশ্যিক তার বেশি তাদের না শিখলেও চলে। কেননা, তাদের দেশের সমস্ত কাজই নিজের ভাষায়। আমাদের দেশের অধিকাংশ কাজই ইংরেজি ভাষায়। যাঁরা শাসন করেন তাঁরা আমাদের ভাষা শিখতে, অন্তত যথেষ্ট পরিমাণে শিখতে, বাধ্য নন। পর্বত নড়েন না, কাজেই সচল মানুষকেই প্রয়োজনের গরজে পর্বতের দিকে নড়তে হয়। ইংরেজি ভাষা কেবল যে আমাদের জানতে হবে তা নয়, তাকে ব্যবহার করতে হবে। সেই ব্যবহার বিদেশী আদর্শে যতই নিখুঁত হবে সেই পরিমাণেই স্বদেশীদের এবং কর্তাদের কাছে আমাদের সমাদর। আমি একজন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটকে জানতুম; তিনি বাংলা সহজেই পড়তে পারতেন। বাংলাসাহিত্যে তাঁর রুচির আমি প্রশংসা করবই; কারণ, রবীন্দ্রনাথের রচনা তিনি পড়তেন এবং পড়ে আনন্দ পেতেন। একবার গ্রামবাসীদের এক সভায় তিনি উপস্থিত ছিলেন। গ্রামহিতৈষী বাঙালী বক্তাদের মধ্যে যা যা বক্তব্য ছিল বলা হলে পর ম্যাজিস্ট্রেটের মনে হল, গ্রামের লোককে বাংলায় কিছু বলা তাঁরও কর্তব্য। কোনো প্রকারে দশ মিনিট কর্তব্য পালন করেছিলেন। গ্রামের লোকেরা বাড়ি ফিরে গিয়ে আত্মীয়দের জানালো যে, সাহেবের ইংরেজি বক্তৃতা এইমাত্র তারা শুনে এসেছে। পরভাষা ব্যবহার সম্বন্ধে বিদেশীর কাছে খুব বেশি আশা না করলেও তাকে অসম্মান করা হয় না। ম্যাজিস্ট্রেট নিজেই জানতেন, তাঁর বাংলা- কথনের ভাষা এমন নয় যে, গৌড়জন আনন্দে যার অর্থবোধ করতে পারে সম্যক্। তাই নিয়ে তিনি হেসেও ছিলেন। আমরা হলে কিছুতেই হাসতে পারতুম না, ধরণীকে অনুনয় করতুম দ্বিধা হতে। ইংরেজি সম্বন্ধে আমাদের বিদেশিত্বের কৈফিয়ত আত্মীয় বা অনাত্মীয়-সমাজে গ্রাহ্য হয় না। একদা বিশ্ববিখ্যাত জার্মান তত্ত্বজ্ঞানী অয়্‌কেনকে ইংরেজি বক্তৃতা শুনেছিলেম। আশা করি এ কথাটা অত্যাুক্তি বলে মনে করবেন না যে, ইংরেজি শুনলে আমি বুঝতে পারি সেটা ইংরেজি। কিন্তু অয়্‌কেনের ইংরেজি শুনে আমার ধাঁধা লেগেছিল। এ নিয়ে অয়্‌কেনকে অবজ্ঞা করতে কেউ পারে নি। কিন্তু এ দশা আমার হলে কী হত সে কথা কল্পনা করলেও কর্ণমূল রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে। বাবু-ইংলিশ নামে নিরতিশয় অবজ্ঞা-সূচক একটা শব্দ ইংরেজিতে আছে; কিন্তু ইংরেজি-বাংলা তার চেয়ে বহুগুণে বিকৃত হলেও ওটাকে অনিবার্য ব'লে মেনে নিই, অবজ্ঞা করতে পারি নে। আমাদের কারো ইংরেজিতে

ত্রুটি হলে দেশের লোকের কাছে সেটা যেমন হসনীয় হয় এমন কোনো প্রহসন হয় না। সেই হাসির মধ্য থেকে পরাধীনতারই কলঙ্ক দেখা দেয় কালো হয়ে। যতদিন আমাদের এই দশা বহাল থাকবে ততদিন আমাদের শিক্ষাভিমানীকে কেবল যথেষ্ট ইংরেজি নয়, অতিরিক্ত ইংরেজি শিখতে হবে। তাতে যে অতিরিক্ত সময় লাগে সেই সময়টা যথোচিত শিক্ষার হিসাব থেকে কাটা যায়। তা হোক, অত্যাব্যস্যকের চেয়ে অতিরিক্তকে যতদিন আমাদের মেনে চলতেই হবে ততদিন ইংরেজি -ভাষায়-পেটাই-করা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজাতীয় ভার আমাদের আগাগোড়াই বহন করা অনিবার্য। কেননা, ভালো ক'রে বাংলা শেখার দ্বারাতেই ভালো করে ইংরেজি শেখার সহায়তা হতে পারে, এ কথা মনে করতে সাহস হবে না। গরজটা অতিশয় জরুরি, তাই মন বলতে থাকে, কী জানি! আমার সেই শিক্ষানেতা গুরুজনের মতো অভিভাবক বাংলাদেশে বেশি পাওয়া যাবে না, তাই বেশি দাবি ক'রে লাভ নেই। বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের একেশ্বরত্বের অধিকার আজ সহ্য হবে না। নূতন স্বাধীনতার দাবিকে পুরাতন অধীনতার সেফগার্ডস্‌এর দ্বারা বেড়া তুলে দেবার আশ্বাস না দিতে পারলে সবটাই ফেঁসে যেতে পারে, এই আমার ভয়। তাই বলছি, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরের দালানে বিদ্যার ভোজের যে আয়োজন চলছে তার রান্নাটা বিলিতি মসলায় বিলিতি ডেক্‌চিতে, তার আহরটা বিলিতি আসনে বিলিতি পাত্রেই চলুক; তার জন্যে প্রাণপণে আমরা যে মূল্য দিতে পারি তাতে ভূরিভোজের আশা করা চলবে না। যারা কার্ড পেয়েছে তারা ভিতর-মহলেই বসুক, আর যারা রবাহুত বাইরের আঙিনায় তাদের জন্যে পাত পেড়ে দেওয়া যাক-না। টেবিল পাতা নাই হল, কলাপাত পড়ুক।

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষাকে চিরকাল অথবা অতি দীর্ঘকাল পরান্নভোজী পরাবসথশায়ী হয়ে থাকতেই হবে, কেননা এ ভাষায় পাঠ্যপুস্তক নেই, এই কঠিন তর্ক তুললে একদা সেটা কথা-কাটাকাটির ঘূর্ণি হাওয়াতেই আবর্তিত হতে পারত; দূর দেশ ছাড়া কাছের পাড়া থেকে দৃষ্টান্ত আহরণ করে ঐ উৎপাতটাকে শান্ত করা যেতে পারত না। আজ হাতের কাছেই সুযোগ মিলেছে।

ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় দক্ষিণ হায়দ্রাবাদ বয়সে অল্প; সেইজন্যই বোধ করি তার সাহস বেশি, তা ছাড়া এ কথা বোধ করি সেখানে স্বীকৃত হওয়া সহজ হয়েছে যে, শিক্ষাবিধানে কৃপণতা করার মতো নিজেকে ফাঁকি দেওয়া আর-কিছুই হতে পারে না। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে অবিচলিত নিষ্ঠার সহায়তায় আদ্যন্তমধ্যে উর্দু ভাষার প্রবর্তন হয়েছে। তারই

প্রবল তাড়নায় ঐ ভাষায় পাঠ্যপুস্তক-রচনা প্রায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। ইমারতও হল, সিঁড়িও হল, নীচে থেকে উপরে লোক-যাতায়াত চলছে। হতে পারে, সেখান যথেষ্ট সুযোগ ও স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু তবুও চারি দিকের প্রচলিত মত ও অভ্যাসের দুস্তর বাধা অতিক্রম ক'রে যিনি এমন মহৎ সংকল্পকে মনে এবং কাজের ক্ষেত্রে স্থান দিতে পেরেছেন সেই স্যর আকবর হযরির সাহসকে ধন্য বলি। বিনা দ্বিধায় জ্ঞানসাধনার দুর্গমতাকে তাঁদের মাতৃভাষার ক্ষেত্রে সমভূম করে দিয়ে উর্দুভাষীদের তিনি যে মহৎ উপকার করেছেন তার দৃষ্টান্ত যদি আমাদের মন থেকে সংশয় দূর এবং শিক্ষাসংস্কৃতির বিলম্বিত গতিকে ত্বরান্বিত করতে পারে তবে একদা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় অন্য সকল সভ্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমপর্যায়ে দাঁড়িয়ে গৌরব করতে পারবে। নইলে প্রতিধ্বনি ধ্বনির সঙ্গে একই মূল্য দাবি করবে কোন্ স্পর্ধায়? বনস্পতির শাখায় যে পরগাছা ঝুলছে সে বনস্পতির সমতুল্য নয়।

বিদেশ থেকে যেখানে আমরা যন্ত্র কিনে এনে ব্যবহার করি সেখানে তার ব্যবহারে ভয়ে ভয়ে অক্ষরে অক্ষরে পুঁথি মিলিয়ে চলতে হয়, কিন্তু সজীব গাছের চারার মধ্যে তার আত্মচালনা-আত্মপরিবর্ধনার তত্ত্ব অনেক পরিমাণে ভিতরে ভিতরে কাজ করতে থাকে। যন্ত্র আমাদের স্বায়ত্ত্ব হতে পারে, কিন্তু তাতে আমাদের স্বানুবর্তিতা থাকে না। স্বাধীন পরিচালনার ক্ষেত্রে সেখানে ন্যাশনাল কলেজ গড়া হয়েছে, হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপনায় যেখানে দেখা গেল অর্থব্যয় অজস্র হয়েছে, সেখানেও ছাঁচ-উপাসক আমরা ছাঁচের মুঠো থেকে আমাদের স্বাতন্ত্র্যকে কিছুতে ছাড়িয়ে নিতে পারছি নে। সেখানেও শুধু যে ইংরেজি যুনিভার্সিটির গায়ের মাপে ছেঁটেছুটে কুর্তি বানাচ্ছি তা নয়, ইংরেজের জমি থেকে তার ভাষাসুদ্ধ উপড়ে এনে দেশের চিত্তক্ষেত্রকে কোদালে কুড়ুলে ক্ষত বিক্ষত ক'রে বিরুদ্ধ ভূমিতে তাকে রোপণের গলদঘর্ম চেষ্টা করছি; তাতে শিকড় না ছড়াচ্ছে চারি দিকে, না পৌঁচছে গভীরে।

বাংলাভাষার দোহাই দিয়ে যে শিক্ষার আলোচনা বারংবার দেশের সামনে এনেছি তার মূলে আছে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। যখন বালক ছিলাম, আশ্চর্য এই যে, তখন অবিমিশ্র বাংলাভাষায় শিক্ষা দেবার একটা সরকারি ব্যবস্থা ছিল। তখনো যে-সবস্কুলের রাস্তা ছিল কলকাতা যুনিভার্সিটির প্রবেশদ্বারের দিকে জুস্তিত, যারা ছাত্রদের আবৃত্তি করাচ্ছিল ‘he is up তিনি হন উপরে’, যারা ইংরেজি I সর্বনাম শব্দের ব্যাখ্যা মুখস্থ করাচ্ছিল ‘I, by myself I’, তাদের আহ্বানে সাড়া দিচ্ছিল সেই-সব পরিবারের ছাত্র যারা ভদ্রসমাজে উচ্চ পদবীর অভিমান

করতে পারত। এদেরই দূর পার্শ্বে সংকুচিতভাবে ছিল প্রথমোক্ত শিক্ষাবিভাগ, ছাত্রবৃত্তির পোড়োদের জন্য। তারা কনিষ্ঠ অধিকারী, তাদের শেষ সদগতি ছিল ‘নর্মাল স্কুল’ নামধারী মাথা-হেঁট করা বিদ্যালয়ে। তাদের জীবিকার শেষ লক্ষ্য ছিল বাংলা-বিদ্যালয়ে স্বল্পসমুদ্র বাংলা-পণ্ডিত ব্যবসায়ে। আমার অভিভাবক সেই নর্মাল স্কুলের দেউড়ি-বিভাগে আমাকে ভর্তি করেছিলেন। আমি সম্পূর্ণ বাংলাভাষার পথ দিয়েই শিখেছিলাম ভূগোল, ইতিহাস, গণিত, কিছু-পরিমাণ প্রাকৃত বিজ্ঞান, আর সেই ব্যাকরণ যার অনুশাসনে বাংলাভাষা সংস্কৃতভাষার অভিজাত্যের অনুকরণে আপন সাধু ভাষার কৌলীন্য ঘোষণা করত। এই শিক্ষার আদর্শ ও পরিমাণ বিদ্যা হিসাবে তখনকার ম্যাট্রিকের চেয়ে কম দরের ছিল না। আমার বারো বৎসর বয়স পর্যন্ত ইংরেজি-বর্জিত এই শিক্ষাই চলেছিল। তার পরে ইংরেজি বিদ্যালয় প্রবেশের অনতিকাল পরেই আমি ইস্কুল-মাস্টারের শাসন হতে উর্ধ্বশ্বাসে পলাতক।

এর ফলে শিশুকালেই বাংলাভাষার ভাঙারে আমার প্রবেশ ছিল অব্যাহত। সে ভাঙারে উপকরণ যতই সামান্য থাক্, শিশুমনের পোষণ ও তোষণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। উপবাসী মনকে দীর্ঘকাল বিদেশী ভাষার চড়াই পথে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দম হারিয়ে চলতে হয় নি, শেখার সঙ্গে বোঝার প্রত্যহ সাংঘাতিক মাথা-ঠোকাঠুকি না হওয়াতে আমাকে বিদ্যালয়ের হাসপাতালে মানুষ হতে হয় নি। এমন-কি, সেই কাঁচা বয়সে যখন আমাকে মেঘনাদবধ পড়তে হয়েছে তখন একদিন মাত্র আমার বাঁ গালে একটা বড়ো চড় খেয়েছিলুম, এইটেই একমাত্র অবিস্মরণীয় অপঘাত; যতদূর মনে পড়ে মহাকাব্যের শেষ সর্গ পর্যন্তই আমার কানের উপরেও শিক্ষকের হস্তক্ষেপ ঘটে নি, অথবা, সেটা অত্যন্তই বিরল ছিল।

কৃতজ্ঞতার কারণ আরো আছে। মনে চিন্তা এবং ভাব কথায় প্রকাশ করবার সাধনা শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ। অন্তরে বাহিরে দেওয়া-নেওয়া এই প্রক্রিয়ার সামঞ্জস্যসাধনাই সুস্থ প্রাণের লক্ষণ। বিদেশী ভাষাই প্রকাশচর্চার প্রধান অবলম্বন হলে সেটাতে যেন মুখোশের ভিতর দিয়ে ভাবপ্রকাশের অভ্যাস দাঁড়ায়। মুখোশ-পরা অভিনয় দেখেছি; তাতে ছাঁচে-গড়া ভাবকে অবিচল করে দেখানো যায় একটা বাঁধা সীমানার মধ্যে, তার বাইরে স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। বিদেশী ভাষার আবরণের আড়ালে প্রকাশের চর্চা সেই জাতের। একদা মধুসূদনের মতো ইংরেজি-বিদ্যায় অসামান্য পণ্ডিত এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মতো বিজাতীয় বিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র এই মুখোশের ভিতর দিয়ে ভাব বাংলাতে চেষ্টা করেছিলেন; শেষকালে হতাশ হয়ে সেটা টেনে ফেলে দিতে হল।

রচনার সাধনা অমনিতেই সহজ নয়। সেই সাধনাকে পরভাষার দ্বারা ভারাক্রান্ত করলে চিরকালের মতো তাকে পঙ্গু করার আশঙ্কা থাকে। বিদেশী ভাষার চাপে বামন হওয়া মন আমাদের দেশে নিশ্চয়ই বিস্তর আছে। প্রথম থেকেই মাতৃভাষার স্বাভাবিক সুযোগে মানুষ হলে সেই মন কী হতে পারত আন্দাজ করতে পারি নে বলে, তুলনা করতে পারি নে।

যাই হোক, ভাগ্যবলে অখ্যাত নর্মাল স্কুলে ভর্তি হয়েছিলুম, তাই কচি বয়সে রচনা করা ও কুস্তি করাকে এক করে তুলতে হয় নি; চলা এবং রাস্তা খোঁড়া ছিল না একসঙ্গে। নিজের ভাষায় চিন্তাকে ফুটিয়ে তোলা, সাজিয়ে তোলার আনন্দ গোড়া থেকেই পেয়েছি। তাই বুঝেছি মাতৃভাষায় রচনার অভ্যাস সহজ হয়ে গেলে তার পরে যথাসময়ে অন্য ভাষা আয়ত্ত্ব ক'রে সেটাকে সাহসপূর্বক ব্যবহার করতে কলমে বাধে না; ইংরেজির অতিপ্রচলিত জীর্ণ বাক্যাবলী সাবধানে সেলাই ক'রে ক'রে কাঁথা বুনতে হয় না। ইস্কুল-পালানে অবকাশে যেটুকু ইংরেজি আমি পথে-পথে সংগ্রহ করেছি সেটুকু নিজের খুশিতে ব্যবহার করে থাকি; তার প্রধান কারণ, শিশুকাল থেকে বাংলাভাষায় রচনা করতে আমি অভ্যস্ত। অন্তত, আমার এগারো বছর বয়স পর্যন্ত আমার কাছে বাংলাভাষার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। রাজসম্মানগর্বিত কোনো সুয়োরানী তাকে গোয়ালঘরের কোণে মুখ চাপা দিয়ে রাখে নি। আমার ইংরেজি-শিক্ষায় সেই আদিম দৈন্য সত্ত্বেও পরিমিত উপকরণ নিয়ে আমার চিত্তবৃত্তি কেবল গৃহিণীপনার জোরে ইংরেজিজানা ভদ্র সমাজে আমার মান বাঁচিয়ে আসছে; যা-কিছু ছেঁড়া-ফাটা, যা-কিছু মাপে খাটো, তাকে কোনোরকমে ঢেকে বেড়াতে পেরেছে। নিশ্চিত জানি তার কারণ, শিশুকাল থেকে আমার মনের পরিণতি ঘটেছে কোনো-ভেজাল-না-দেওয়া মাতৃভাষায়; সেই খাদ্যে খাদ্যবস্তুর সঙ্গে যথেষ্ট খাদ্যপ্রাণ ছিল, যে খাদ্যপ্রাণে সৃষ্টিকর্তা তাঁর জাদুমন্ত্র দিয়েছেন।

অবশেষে আমার নিবেদন এই যে, আজ কোনো ভগীরথ বাংলাভাষায় শিক্ষাস্রোতকে বিশ্ববিদ্যার সমুদ্র পর্যন্ত নিয়ে চলুন, দেশের সহস্র সহস্র মন মূর্খতার অভিশাপে প্রাণহীন হয়ে পড়ে আছে, এই সঞ্জীবনী ধারার স্পর্শে বেঁচে উঠুক, পৃথিবীর কাছে আমাদের উপেক্ষিত মাতৃভাষার লজ্জা দূর হোক, বিদ্যাবিতরণের অন্তস্র স্বদেশের নিত্যসম্পদ হয়ে আমাদের আতিথ্যের গৌরব রক্ষা করুক।

জানি নে হয়তো অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলবেন, এ কথাটা কাজের কথা নয়, এ কবিকল্পনা। তা হোক, আমি বলব, আজ পর্যন্ত কেজো কথায় কেবল জোড়াতাড়ার কাজ চলেছে, সৃষ্টি হয়েছে কল্পনার বলে।

আশ্রমের শিক্ষা

প্রাচীন ভারতের তপোবন জিনিসটার ঠিক বাস্তব রূপ কী তার ঐতিহাসিক ধারণা আজ সহজ নয়। তপোবনের যে প্রতিকল্প স্থায়ীভাবে আঁকা পড়েছে ভারতের চিত্রে ও সাহিত্যে সে হচ্ছে একটি কল্যাণময় কল্পমূর্তি, বিলাস-মোহমুক্ত প্রাণবান আনন্দের মূর্তি।

আধুনিক কালে জন্মেছি। কিন্তু, এই ছবি রয়ে গেছে আমারও মনে। বর্তমান যুগের বিদ্যায়তনে ভাবলোকের সেই তপোবনকে রূপলোকে প্রকাশ করবার জন্যে একদা কিছুকাল ধরে আমার মনে আগ্রহ জেগেছিল।

দেখেছি মনে মনে তপোবনের কেন্দ্রস্থলে গুরুকে। তিনি যন্ত্র নন, তিনি মানুষ-নিষ্ক্রিয়ভাবে মানুষ নন, সক্রিয়ভাবে; কেননা মনুষ্যত্বের লক্ষ্য-সাধনেই তিনি প্রবৃত্ত। এই তপস্যার গতিমান ধারায় শিষ্যের চিত্তকে গতিশীল করে তোলা তাঁর আপন সাধনারই অঙ্গ। শিষ্যের জীবন প্রেরণা পায় তাঁর অব্যবহিত সঙ্গ থেকে। নিত্যজাগরুক মানব-চিত্তের এই সঙ্গ জিনিসটি আশ্রমের শিক্ষার সব চেয়ে মূল্যবান উপাদান। তার সেই মূল্য অধ্যাপনার বিষয়ে নয়, উপকরণে নয়, পদ্ধতিতে নয়। গুরুর মন প্রতি মুহূর্তে আপনাকে পাচ্ছে বলেই আপনাকে দিচ্ছে। পাওয়ার আনন্দ সপ্রমাণ করছে নিজের সত্যতা দেওয়ার আনন্দেই।

একদা একজন জাপানি ভদ্রলোকের বাড়িতে ছিলাম, বাগানের কাজে ছিল তাঁর বিশেষ শখ। তিনি বৌদ্ধ, মৈত্রীর সাধক। তিনি বলতেন, ‘আমি ভালোবাসি গাছপালা। তরুলতায় সেই ভালোবাসার শক্তি প্রবেশ করে, ওদের ফুলে ফলে জাগে সেই ভালোবাসারই প্রতিক্রিয়া।’ বলা বাহুল্য, মানবচিত্তের মালীর সম্বন্ধে এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। মনের সঙ্গে মন যথার্থভাবে মিলতে থাকলে আপনি জাগে খুশি। সেই খুশি সৃজনশক্তিশীল। আশ্রমের শিক্ষাদান এই খুশির দান। যাদের মনে কর্তব্যবোধ আছে কিন্তু সেই খুশি নেই, তাদের দোসরা পথ। গুরুশিষ্যের মধ্যে পরস্পরসাপেক্ষ সহজ সম্বন্ধকেই আমি বিদ্যাদানের প্রধান মাধ্যম্য বলে জেনেছি।

আরো একটি কথা মনে ছিল। যে গুরুর অন্তরে ছেলেমানুষটি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়েছে তিনি ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য। উভয়ের মধ্যে শুধু সামীপ্য নয়, আন্তরিক সাযুজ্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই, নইলে দেনা-পাওনায় নাড়ীর যোগ থাকে না। নদীর সঙ্গে যদি প্রকৃত শিক্ষকের তুলনা করি তবে বলব, কেবল ডাইনে বাঁয়ে কতকগুলো বুড়ো বুড়ো উপনদীর যোগেই নদী পূর্ণ নয়। তার আদি ঝর্নার ধারাটি মোটা মোটা পাথরগুলোর মধ্যে হারিয়ে যায় নি। যিনি জাত-শিক্ষক ছেলেদের ডাক শুনলেই তাঁর ভিতরকার আদিম ছেলেটা আপনি বেরিয়ে আসে। মোটা গলার ভিতর থেকে উচ্ছ্বসিত হয় প্রাণে-ভরা কাঁচা হাসি। ছেলেরা যদি কোনো দিক থেকেই তাঁকে স্বশ্রেণীয় জীব বলে চিনতে না পারে, যদি মনে করে ‘লোকটা যেন একটা প্রাগৈতিহাসিক মহাকায় প্রাণী’, তবে নির্ভয়ে তাঁর কাছে হাত বাড়াতেই পারবে না। সাধারণত আমাদের গুরুরা সর্বদা নিজের প্রবীণতা অর্থাৎ নবীনের কাছ থেকে দূরবর্তিতা সপ্রমাণ করতে ব্যগ্র; প্রায়ই ওটা সস্তায় কর্তৃত্ব করবার প্রলোভনে। ছেলেদের পাড়ায় চোপদার না নিয়ে এগোলে পাছে সম্ভ্রম নষ্ট হয় এই ভয়ে তাঁরা সতর্ক। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনি উঠছে ‘চুপ চুপ’; তাই পাকা শাখায় কচি শাখায় ফুল ফোটাবার ফল ফলাবার মর্মগত সহযোগ রুদ্ধ হয়ে থাকে; চুপ করে যায় ছেলেদের চিত্তে প্রাণের ক্রিয়া।

আর-একটা কথা আছে। ছেলেরা বিশ্বপ্রকৃতির অত্যন্ত কাছের। আরামকেদারায় তারা আরাম চায় না, সুযোগ পেলেই গাছের ডালে তারা চায় ছুটি। বিরাট প্রকৃতির নাড়ীতে নাড়ীতে প্রথম প্রাণের বেগ নিগূঢ়ভাবে চঞ্চল। শিশুর প্রাণে সেই বেগ গতিসঞ্চারণ করে। বয়স্কদের শাসনে অভ্যাসের দ্বারা যে-পর্যন্ত তারা অভিভূত না হয়েছে সে পর্যন্ত কৃত্রিমতার জাল থেকে মুক্তি পাবার জন্যে তারা ছটফট করে। আরণ্য ঋষিদের মনের মধ্যে ছিল চিরকালের অমর ছেলে। তাই কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অপেক্ষা না রেখে তাঁরা বলেছিলেন, এই যা-কিছু সমস্তই প্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই কম্পিত হচ্ছে। এ কি বের্গস্‌এর বচন! এ মহান্ শিশুর বাণী। বিশ্বপ্রাণের স্পন্দন লাগতে দাও ছেলেদের দেহে মনে, শহরের বোবা কালা মরা দেয়ালগুলোর বাইরে।

তার পরে আশ্রমের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার কথা। মনে পড়ছে কাদম্বরীতে একটি বর্ণনা : তপোবনে আসছে সন্ধ্যা, গোষ্ঠ-ফিরে-আসা পাটল হোমধেনুটির মতো। শুনে মনে জাগে,

সেখানে গোরু-চরানো, গোদোহন, সমিধ-কুশ-আহরণ, অতিথিপরিচর্যা, যজ্ঞবেদীরচনা আশ্রমবালক-বালিকাদের দিনকৃত্য। এই-সব কর্মপর্যায়ের দ্বারা তপোবনের সঙ্গে নিরন্তর মিলে যায় তাদের নিত্যপ্রবাহিত জীবনের ধারা। সহকারিতার সখ্যবিস্তারে আশ্রম হতে থাকে প্রতি ক্ষণে আশ্রমবাসীদের নিজ হাতের রচনা। আমাদের আশ্রমে সতত-উদ্যমশীল এই কর্মসহযোগিতা কামনা করছি।

মানুষের প্রকৃতিতে যেখানে জড়তা আছে যেখানে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা কুশী ও মলিন। স্বভাবের বর্বরতা সেখানে প্রকাশে বাধা পায় না। ধনীসমাজে আন্তরিক শক্তির অভাব থাকলেও বাহ্যিক উপকরণপ্রাচুর্যে কৃত্রিম উপায়ে এই দীনতাকে চাপা দিয়ে রাখা যায়। আমাদের দেশে প্রায় সর্বত্রই ধনীগৃহে সদর-অন্দরের প্রভেদ দেখলে এই প্রকৃতিগত তামসিকতা ধরা পড়ে।

নিজের চার দিককে নিজের চেষ্টায় সুন্দর সুশৃঙ্খল ও স্বাস্থ্যকর করে তোলার দ্বারা একত্র বাসের সতর্ক দায়িত্বের অভ্যাস বাল্যকাল থেকেই সহজ করা চাই। একজনের শৈথিল্য অন্যের অসুবিধা অস্বাস্থ্য ও ক্ষতির কারণ হতে পারে, এই বোধটি সভ্য জীবনযাত্রার ভিত্তিগত। সাধারণত আমাদের দেশের গার্হস্থ্যে এই বোধের ত্রুটি সর্বদাই দেখা যায়।

সহযোগিতার সভ্য নীতিকে প্রত্যহ সচেতন করে তোলা আশ্রমের শিক্ষার প্রধান সুযোগ। সুযোগটিকে সফল করবার জন্যে শিক্ষার প্রথম পর্বে উপকরণ লাঘব অত্যাৱশ্যক। একান্ত বস্তুপরায়ণ স্বভাবে প্রকাশ পায় চিত্তবৃত্তির স্থূলতা। সৌন্দর্য এবং সুব্যবস্থা মনের জিনিস। সেই মনকে মুক্ত করা চাই। কেবল আলস্য এবং অনৈপুণ্য থেকে নয়, বস্তুলুদ্ধতা থেকেও। রচনাশক্তির আনন্দ ততই সত্য হয় যতই তা জড়বাহুল্যের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। বাল্যকাল থেকেই ব্যবহারসামগ্রী সুনিয়ন্ত্রিত করবার আত্মশক্তিমূলক শিক্ষা আমাদের দেশে অত্যন্ত উপেক্ষিত হয়। সেই বয়সেই প্রতিদিন অল্প-কিছু উপকরণ, যা সহজে হাতের কাছে পাওয়া যায়, তাই দিয়েই সৃষ্টির আনন্দকে উদ্ভাবিত করবার চেষ্টা যেন নিরলস হতে পারে এবং সেইসঙ্গেই সাধারণের সুখ স্বাস্থ্য সুবিধা-বিধানের কর্তব্যে ছাত্রেরা যেন আনন্দ পেতে শেখে, এই আমার কামনা।

আপন পরিবেশের প্রতি ছেলেদের আত্মকর্তৃত্বচর্চাকে আমাদের দেশে অসুবিধাজনক আপদজনক ও ঔদ্ধত্য মনে করে সর্বদা আমরা দমন করি। এতে করে পরনির্ভরতার লজ্জা তাদের চলে যায়, পরের প্রতি আদার বেড়ে ওঠে, এমন-কি, ভিক্ষুকতার ক্ষেত্রেও তাদের

অভিমান প্রবল হতে থাকে; তারা আত্মপ্রসাদ পায় পরের ত্রুটি নিয়ে কলহ করে। এই লজ্জাকর দীনতা চার দিকে সর্বদাই দেখা যাচ্ছে। এর থেকে মুক্তি পাওয়াই চাই।

মনে আছে ছাত্রদের প্রাত্যহিক কাজে যখন আমার যোগ ছিল তখন এক দল বয়স্ক ছাত্রদের পক্ষ থেকে আমার কাছে নালিশ এল যে, অন্তর্ভরা বড়ো বড়ো ধাতুপাত্র পরিবেশনের সময় মেজের উপর দিয়ে টানতে টানতে তার তলা ক্ষয়ে গিয়ে ঘরময় নোংরামি ছড়িয়ে পড়ে। আমি বললেম, ‘তোমরা পাচ্ছ দুঃখ, অথচ তাকিয়ে আছ আমি এর প্রতিবিধান করব। এই সামান্য কথাটা তোমাদের বুদ্ধিতে আসছে না যে, ঐ পাত্রটার নীচে একটা বিড়ে বেঁধে দিলেই ঐ ঘর্ষণ থামে। চিন্তা করতে পার না তার একমাত্র কারণ, তোমরা এইটাই স্থির করে রেখেছে যে, নিষ্ক্রিয়ভাবে ভোগ্যত্বের অধিকারই তোমাদের, আর কর্তৃত্বের অধিকার অন্যের। এতে আত্মসম্মান থাকে না।’

শিক্ষার অবস্থায় উপকরণের কিছু বিরলতা, আয়োজনের কিছু অভাব থাকাই ভালো; অভ্যস্ত হওয়া চাই স্বল্পতায়। অনায়াসে-প্রয়োজন-জোগানের দ্বারা ছেলেদের মনটাকে আদুরে করে তোলা তাদের নষ্ট করা। সহজেই তারা যে এত-কিছু চায় তা নয়। আমরাই বয়স্ক লোকের চাওয়াটা কেবলই তাদের উপর চাপিয়ে তাদেরকে বস্তুর নেশায় দীক্ষিত করে তুলি। শরীরমনের শক্তির সম্যক চর্চা সেখানেই ভালো করে সম্ভব যেখানে বাইরের সহায়তা অনতিশয়। সেখানে মানুষের আপনার সৃষ্টি-উদ্যম আপনি জাগে। যাদের না জাগে প্রকৃতি তাদেরকে আবর্জনার মতো ঝেঁটিয়ে ফেলে দেয়। আত্মকর্তৃত্বের প্রধান লক্ষণ সৃষ্টিকর্তৃত্ব। সেই মানুষই যথার্থ স্বরাট আপনার রাজ্য যে আপনি সৃষ্টি করে। আমাদের দেশে অতিলালিত ছেলেরা সেই স্বচেষ্টতার চর্চা থেকে প্রথম হতেই বঞ্চিত। তাই আমরা অন্যদের শক্ত হাতের চাপে নির্দিষ্ট নমুনামতো রূপ নেবার জন্যে কদমাক্ত ভাবে প্রস্তুত।

এই উপলক্ষে আর-একটা কথা বলবার আছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শরীরতন্তুর শৈথিল্য বা অন্য যে কারণেই হোক, আমাদের মানস প্রকৃতিতে ঔৎসুক্যের অত্যন্ত অভাব। একবার আমেরিকা থেকে জল-তোলা বায়ুচক্র আনিয়েছিলুম। আশা ছিল, প্রকাণ্ড এই যন্ত্রটার ঘূর্ণিপাখার চালনা দেখতে ছেলেদের আগ্রহ হবে। কিন্তু দেখলুম অতি অল্প ছেলেই ভালো করে ওটার দিকে তাকালে। ওরা নিতান্তই আলগা ভাবে ধরে নিলে, ওটা যা-হোক একটা জিনিস, জিজ্ঞাসার অযোগ্য।

নিরৌৎসুক্যই আন্তরিক নির্জীবতা। আজকের দিনে যে-সব জাতি পৃথিবীর উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, সমস্ত পৃথিবীর সব-কিছুরই 'পরে তাদের অপ্রতিহত ঔৎসুক্য। এমন দেশ নেই, এমন কাল নেই, এমন বিষয় নেই, যার প্রতি তাদের মন ধাবিত না হচ্ছে। তাদের এই সজীব চিন্তাশক্তি জয়ী হল সর্বজগত।

পূর্বেই আভাস দিয়েছি, আশ্রমের শিক্ষা পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকবার শিক্ষা। মরা মন নিয়েও পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর উর্ধ্বশিখরে ওঠা যায়, আমাদের দেশে প্রত্যহ তার পরিচয় পাই। দেখা যায় অতি ভালো কলেজি ছেলেরা পদবী অধিকার করে, বিশ্ব অধিকার করে না। প্রথম থেকেই আমার সংকল্প ছিল আশ্রমের ছেলেরা চার দিকের অব্যবহিত-সম্পর্ক-লাভে উৎসুক হয়ে থাকবে; সন্ধান করবে, পরীক্ষা করবে, সংগ্রহ করবে। এখানে এমন-সকল শিক্ষক সমবেত হবেন যাঁদের দৃষ্টি বইয়ের সীমানা পেরিয়ে; যাঁরা চক্ষুস্থান, যাঁরা সন্ধানী, যাঁরা বিশ্বকুতূহলী, যাঁদের আনন্দ প্রত্যক্ষ জ্ঞানে।

সব-শেষে বলব যেটাকে সব চেয়ে বড়ো বলে মনে করি এবং যেটা সব চেয়ে দুর্লভ। তাঁরাই শিক্ষক হবার উপযুক্ত যাঁরা ধৈর্যবান। ছেলেদের প্রতি স্বভাবতই যাঁদের স্নেহ আছে এই ধৈর্য তাঁদেরই স্বাভাবিক। শিক্ষকদের নিজের চরিত্র সম্বন্ধে গুরুতর বিপদের কথা এই যে, যাদের সঙ্গে তাঁদের ব্যবহার তারা ক্ষমতায় তাঁদের সমকক্ষ নয়। তাদের প্রতি সামান্য কারণে বা কাল্পনিক কারণে অসহিষ্ণু হওয়া, তাদের বিদ্রূপ করা, অপমান করা, শাস্তি দেওয়া আনায়াসেই সম্ভব। দুর্বল পরজাতিকে শাসন করাই যাদের কাজ তারা যেমন নিজের অগোচরেও সহজেই অন্যায়প্রবণ হয়ে ওঠে, এও তেমনি। ক্ষমতা-ব্যবহারের স্বাভাবিক যোগ্যতা যাদের নেই অক্ষমের প্রতি অবিচার করতে কেবল যে তাদের বাধা থাকে না তা নয়, তাতে তাদের আনন্দ। ছেলেরা অবোধ হয়ে দুর্বল হয়েই তাদের মায়ের কোলে আসে, এইজন্যে তাদের রক্ষার প্রধান উপায়-মায়ের মনে অপরিাপ্ত স্নেহ। তৎসত্ত্বেও অসহিষ্ণুতা ও শক্তির অভিমান স্নেহকে অতিক্রম করেও ছেলেদের 'পরে অন্যায় অত্যাচারে প্রবৃত্ত করে, ঘরে ঘরে তার প্রমাণ পাই। ছেলেদের কঠিন দণ্ড ও চরম দণ্ড দেবার দৃষ্টান্ত যেখানে দেখা যায় প্রায়ই সেখানে মূলত শিক্ষকেরাই দায়ী। তাঁরা দুর্বলমনা বলেই কঠোরতা দ্বারা নিজের কর্তব্যকে সহজ করতে চান।

রাষ্ট্রতন্ত্রেই হোক আর শিক্ষাতন্ত্রেই হোক, কঠোর শাসননীতি শাসয়িতারই অযোগ্যতার প্রমাণ। শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা। ক্ষমা যেখানে ক্ষীণ সেখানে শক্তিরই ক্ষীণতা।

ছাত্রসম্ভাষণ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদবী-সম্মান-বিতরণের বার্ষিক অনুষ্ঠানে আজ আমি আহূত। আমার জীর্ণ শরীরের অপুটতা এই দায়িত্বভার গ্রহণের প্রতিকূল ছিল কিন্তু অদ্যকার একটি বিশেষ গৌরবের উপলক্ষ আমাকে সমস্ত বাধার উপর দিয়ে আকর্ষণ করে এনেছে। আজ বাংলাদেশের প্রথমতম বিশ্ববিদ্যালয় আপন ছাত্রদের মাজল্যবিধানের শুভকর্মে বাংলার বাণীকে বিদ্যামন্দিরের উচ্চ বেদীতে বরণ করেছেন। বহুদিনের শূন্য আসনের অকল্যাণ আজ দূর হল।

দুর্ভাগ্যদিনের সকলের চেয়ে দুঃসহ লক্ষণ এই যে, সেই দিনে স্বতঃস্বীকার্য সত্যকেও বিরোধের কণ্ঠে জানাতে হয়। এ দেশে অনেক কাল জানিয়ে আসতে হয়েছে যে, পরভাষার মধ্য দিয়ে পরিস্রুত শিক্ষায় বিদ্যার প্রাণীন পদার্থ নষ্ট হয়ে যায়।

ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনো দেশেই শিক্ষার ভাষা এবং শিক্ষার্থীর ভাষার মধ্যে আত্মীয়তা-বিচ্ছেদের অস্বাভাবিকতা দেখা যায় না। যুরোপীয় বিদ্যায় জাপানের দীক্ষা এক শতাব্দীও পার হয় নি। তার বিদ্যারস্তুর প্রথম সূচনায় শিক্ষণীয় বিষয়গুলি অগত্যা বিদেশী ভাষাকে আশ্রয় করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু প্রথম থেকেই শিক্ষাবিধির একান্ত লক্ষ্য ছিল, স্বদেশী ভাষার অধিকারে স্বাধীন সঞ্চরণ লাভ করা। কেননা, যে বিদ্যাকে আধুনিক জাপান অভ্যর্থনা করেছিল সে কেবলমাত্র বিশেষ-সুযোগ-প্রাপ্ত সংকীর্ণ শ্রেণীবিশেষের অলংকারপ্রসাধনের সামগ্রী ব'লেই আদরণীয় হয় নি; নির্বিশেষে সমগ্র মহাজাতিকেই শক্তি দেবে, শ্রী দেবে ব'লেই ছিল তার আমন্ত্রণ। এইজন্যই এই শিক্ষার সর্বজনগম্যতা ছিল অত্যাবশ্যক। যে শিক্ষা ঈর্ষাপরায়ণ শক্তিশালী জাতিদের দস্যুবৃত্তি থেকে জাপানকে আত্মরক্ষায় সামর্থ্য দেবে, যে শিক্ষা নগণ্যতা থেকে উদ্ধার করে মানবের মহাসভায় তাকে সম্মানের অধিকারী করবে, সেই শিক্ষার প্রসারসাধনচেষ্টায় অর্থে বা অধ্যবসায়ে সে লেশমাত্র কৃপণতা করে নি। সকলের চেয়ে অনর্থকর কৃপণতা, বিদ্যাকে বিদেশী ভাষার অন্তরালে দূরত্ব দান করা, ফসলের বড়োমাঠকে বাইরে শুকিয়ে রেখে টবের গাছকে আঙিনায় এনে জলসেচন করা।

দীর্ঘকাল ধরে আমাদের প্রতি ভাগ্যের এই অবজ্ঞা আমরা সহজেই স্বীকার করে এসেছি। নিজের সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা শিরোধার্য করতে অভ্যস্ত হয়েছি; জেনেছি যে, সম্মুখবর্তী কয়েকটি মাত্র জনবিরল পণ্ডিতের ছোটো হাতের মাপে ব্যয়কুণ্ঠ পরিবেশনকেই বলে দেশের এজুকেশন। বিদ্যাদানের এই অকিঞ্চিৎকরতাকে পেরিয়ে যেতে পারে শিক্ষার এমন ঔদার্যের কথা ভাবতেই আমাদের সাহস হয় নি, যেমন সাহারামরুবাসী বেদুয়িনরা ভাবতেই সাহস পায় না যে, দূরবিক্ষিপ্ত কয়েকটি ক্ষুদ্র ওয়েসিসের বাইরে ব্যাপক সফলতায় তাদের ভাগ্যের সম্মতি থাকতে পারে। আমাদের দেশে শিক্ষা ও অশিক্ষার মধ্যে যে প্রভেদ সে ঐ সাহারা ও ওয়েসিসেরই মতো, অর্থাৎ পরিমাণগত ভেদ এবং জাতিগত ভেদ। আমাদের দেশের রাষ্ট্রশাসন এক, কিন্তু শিক্ষার সংকোচ-বশত চিত্তশাসন এক হতে পারে নি। বর্তমান কালে চীন জাপান পারস্য আরব তুরস্কে প্রাচ্যজাতীয়দের মধ্যে সর্বত্র এই ব্যর্থতাজনক আত্মবিচ্ছিন্নতার প্রতিকার হয়েছে, হয় নি কেবলমাত্র আমাদেরই দেশে।

প্রাণীবিবরণে দেখা যায়, একজাতীয় জীব আছে যারা পরাসক্ত হয়ে জন্মায়, পরাসক্ত হয়েই মরে। পরের অঙ্গীভূত হয়ে কেবল প্রাণধারণমাত্রে তাদের বাধা ঘটে না, কিন্তু নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিণতি ও ব্যবহারে তারা চিরদিনই থাকে পঙ্গু হয়ে। আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষা সেই জাতীয়। আরম্ভ থেকেই এই শিক্ষা বিদেশী ভাষার আশ্রয়ে পরজীবী। একেবারেই যে তার পোষণ হয় না তা নয়, কিন্তু তার পূর্ণতা হওয়া অসাধ্য। আত্মশক্তিব্যবহারে সে যে পঙ্গু হয়ে আছে সে কথা সে আপনি আনুভব করতেও অক্ষম হয়ে পড়েছে, কেননা ঋণ করে তার দিন চলে যায়। গৌরব বোধ করে এই ঋণলাভের পরিমাণ হিসাব করে। মহাজন-মহলে সে দাসখত লিখিয়ে দিয়েছে। যারা এই শিক্ষায় পার হলে তারা যা ভোগ করে তা উৎপন্ন করে না। পরের ভাষায় পরের বুদ্ধি দ্বারা চিন্তিত বিষয়ের প্রশ্ন পেতে স্বাভাবিক প্রণালীতে নিজে চিন্তা করবার, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করবার আন্তরিক প্রেরণা ও সাহস তাদের দুর্বল হয়ে আসে। পরের কথিত বাণীর আবৃত্তি যতই যন্ত্রের মতো অবিকল হয় ততই তারা পরীক্ষায় কৃতার্থ হবার অধিকারী বলে গণ্য হতে থাকে। বলা বাহুল্য যে, পরাসক্ত মনকে এই চিরদৈন্য থেকে মুক্ত করবার একটা প্রধান উপায়, শিক্ষণীয় বিষয়কে শিশুকাল থেকে নিজের ভাষার ভিতর দিয়ে গ্রহণ করা ও প্রয়োগ করার চর্চা। কে না জানে, আহাৰ্যকে আপন প্রাণের সামগ্রী করে নেবার উপায় হচ্ছে ভোজ্যকে নিজের দাঁত দিয়ে চিবিয়ে নিজের রসনার রসে জারিয়ে নেওয়া?

এ প্রসঙ্গে এ কথা স্বীকার করা চাই যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষার সম্মানের আসন বিচলিত হতে পারবে না। তার কারণ এ নয় যে, বর্তমান অবস্থায় আমাদের জীবনযাত্রায় তার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। আজকের দিনে যুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞান সমস্ত মানবলোকের শ্রদ্ধা অধিকার করেছে, স্বাজাত্যের অভিমানে এ কথা অস্বীকার করলে অকল্যাণ। আর্থিক ও রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার পক্ষে এই শিক্ষার যেমন প্রয়োজন তেমনি মনকে ও ব্যবহারকে মূঢ়তামুক্ত করবার জন্য তার প্রভাব মূল্যবান। যে চিত্ত এই প্রভাবকে প্রতিরোধ করে, এ'কে অঙ্গীকার করে নিতে অক্ষম হয়, সে আপন সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ নিরালোক জীবনযাত্রায় ক্ষীণজীবী হয়ে থাকে। যে জ্ঞানের জ্যোতি চিরন্তন তা যে-কোনা দিগন্ত থেকেই বিকীর্ণ হোক, অপরিচিত বলে তাকে বাধা দেয় বর্বরতার অস্বচ্ছ মন। সত্যের প্রকাশমাত্রই জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকল মানুষের অধিকারগম্য; এই অধিকার মনুষ্যত্বের সহজাত অধিকারেরই অঙ্গ। রাষ্ট্রগত বা ব্যক্তিগত বিষয়সম্পদে মানুষের পার্থক্য অনিবার্য, কিন্তু চিত্তসম্পদের দানসত্রে সর্বশেষে সর্বকালে মানুষ এক। সেখানে দান করবার দাক্ষিণ্যেই দাতা ধন্য ও গ্রহণ করবার শক্তি দ্বারাই গ্রহীতার আত্মসম্মান। সকল দেশেই অর্থভাণ্ডারের দ্বারে কড়া পাহারা, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানভাণ্ডার সবমানবের ঐক্যের দ্বার অর্গলবিহীন। লক্ষ্মী কৃপণ; কারণ লক্ষ্মীর সঞ্চয় সংখ্যা-গণিতের সীমায় আবদ্ধ, ব্যয়ের দ্বারা তার ক্ষয় হতে থাকে। সরস্বতী অকৃপণ; কেননা, সংখ্যার পরিমাপে তাঁর ঐশ্বর্যের পরিমাপ নয়, দানের দ্বারা তার বৃদ্ধিই ঘটে। বোধ করি, বিশেষভাবে বাংলাদেশের এই গৌরব করবার কারণ আছে যে, যুরোপীয় সংস্কৃতির কাছ থেকে যে আপন প্রাপ্য গ্রহণ করতে বিলম্ব করে নি। এই সংস্কৃতির বাধাহীন সংস্পর্শে অতি অল্পকালের মধ্যে তার সাহিত্য প্রচুর শক্তি সম্পদ লাভ করেছে এ কথা সকলের স্বীকৃত। এই প্রভাবের প্রধান সার্থকতা এই দেখেছি যে, অনুকরণে দুর্বল প্রবৃত্তিকে কাটিয়ে ওঠবার উৎসাহ সে প্রথম থেকে দিয়েছে। আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রথম যুগে যাঁরা বিদ্বান বলে গণ্য ছিলেন তাঁরা যদিচ পড়াশুনোয় চিঠিপত্রে কথাবার্তায় একান্তভাবেই ইংরেজি ভাষা ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়েছিলেন, যদিচ তখনকার ইংরেজি-শিক্ষিত চিত্তে চিন্তার ঐশ্বর্য ভাবরসের আয়োজন মুখ্যত ইংরেজি প্রেরণা থেকেই উদ্ভাবিত, তবু সেদিনকার বাঙালি লেখকেরা এই কথাটি অচিরে অনুভব করেছিলেন যে দূরদেশী ভাষার থেকে আমরা বাতির আলো সংগ্রহ করতে পারি মাত্র, কিন্তু আত্মপ্রকাশের জন্য

প্রভাত-আলো বিকীর্ণ হয় আপন ভাষায়। পর-ভাষায় মদগর্বে আত্মবিস্মৃতির দিনে এই সহজ কথার নূতন আবিষ্কার দুটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখেছি আমাদের নবসাহিত্যসৃষ্টির উপক্রমেই। ইংরেজি ভাষায় ও সাহিত্যে মাইকেলের অধিকার ছিল প্রশস্ত, অনুরাগ ছিল সুগভীর। সেইসঙ্গে গ্রীক লাতিন আয়ত্ত ক'রে যুরোপীয় সাহিত্যের অমরাবতীতে তিনি আমন্ত্রিত হয়েছেন ও তৃপ্ত হয়েছেন সেখানকার অমৃতরসভোগে। স্বভাবতই প্রথমে তাঁর মন গিয়েছিল ইংরেজি ভাষায় কাব্য রচনা করতে। কিন্তু, এ কথা বুঝতে তাঁর বিলম্ব হয় নি যে ধার-করা ভাষায় সুদ দিতে হয় অত্যধিক, তার উদ্ভূত থাকে অতি সামান্য। তিনি প্রথমেই মাতৃভাষায় এমন একটি কাব্যের আবাহন করলেন যে কাব্যে স্থলিতগতি প্রথমপদচারণার ভীৰু সতর্কতা নেই। এই কাব্যে বাহিরের গঠনে আছে বিদেশী আদর্শ, অন্তরে আছে কৃতিবাসি বাঙালি কল্পনার সাহায্যে মিল্টন-হোমার-প্রতিভার অতিথিসংস্কার। এই আতিথেয় অগৌরব নেই, এতে নিজের ঐশ্বর্যের প্রমাণ হয় এবং তার বৃদ্ধি হতে থাকে।

এই যেমন কাব্য-সাহিত্যে মধুসূদন তেমনি আধুনিক বাংলা গদ্যসাহিত্যের পথমুক্তির আদিতে আছেন বঙ্কিমচন্দ্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বপ্রথম ছাত্রদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন বরণীয় ব্যক্তি। বলা বহুল্য, তাঁর চিত্ত আনুপ্রাণিত হয়েছিল প্রধানভাবে ইংরেজি শিক্ষায়। ইংরেজি কথাসাহিত্য থেকে তিনি যে প্ররোচনা পেয়েছিলেন তাকে প্রথমেই ইংরেজি ভাষায় রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। সেই চেষ্টার অকৃতার্থতা বুঝতে তাঁর বিলম্ব হয় নি। কিন্তু, যেহেতু বিদেশী শিক্ষা থেকে তিনি যথার্থ সংস্কৃতি লাভ করেছিলেন তাই সেই সংস্কৃতিই তাঁকে আপন সার্থকতার সন্ধানে স্বদেশী ভাষায় টেনে এনেছিল। যেমন দূর গিরিশিখরের জলপ্রপাত যখন শৈলবক্ষ ছেড়ে প্রবাহিত হয় জনস্থানের মধ্য দিয়ে তখন দুইতীরবর্তী ক্ষেত্রগুলিকে ফলবান্ ক'রে তোলে তাদের নিজেরই ভূমি-উদ্ভিন্ন ফলশাস্যে, তেমনি নূতন শিক্ষাকে বঙ্কিমচন্দ্র ফলবান্ করে তুলেছেন নিজেরই ভাষাপ্রকৃতির স্বকীয় দানের দ্বারা। তার আগে বাংলাভাষায় গদ্যপ্রবন্ধ ছিল ইস্কুলে পোড়োদের উপদেশের বাহন। বঙ্কিমের আগে বাঙালি শিক্ষিতসমাজ নিশ্চিত স্থির করেছিলেন যে, তাঁদের ভাবরস-ভোগের ও সত্যসন্ধানের উপকরণ একান্তভাবে যুরোপীয় সাহিত্য হতেই সংগ্রহ করা সম্ভব, কেবল অল্পশিক্ষিতদের ধাত্রীবৃত্তি করবার জন্যেই দরিদ্র বাংলাভাষার যোগ্যতা। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজি শিক্ষার পরিণত শক্তিতেই রূপ দিতে প্রবৃত্ত হলেন বাংলাভাষায় বঙ্গদর্শন মাসিক পত্রে। বস্তুত নবযুগপ্রবর্তক প্রতিভাবানের সাধনায় ভারতবর্ষে

সর্বপ্রথম বাংলাদেশেই যুরোপীয় সংস্কৃতির ফসল ভাবী কালের প্রত্যাশা নিয়ে দেখা দিয়েছিল, বিদেশ থেকে আনীত পণ্য আকারে নয়, স্বদেশের ভূমিতে উৎপন্ন শস্যসম্পদের মতো। সেই শস্যের বীজ যদি-বা বিদেশ থেকে উড়ে এসে আমাদের ক্ষেত্রে পড়ে থাকে তবু তার অঙ্কুরিত প্রাণ এখানকার মাটিরই। মাটি যাকে গ্রহণ করতে পারে সে ফসল বিদেশী হলেও আর বিদেশী থাকে না। আমাদের দেশের বহু ফলে ফুলে তার পরিচয় আছে।

ইংরেজি শিক্ষার সার্থকতা আমাদের সাহিত্যে বঙ্গীয় দেহ নিয় বিচরণ করছে বাংলার ঘরে ঘরে, এই প্রদেশের শিক্ষানিকেতনেও সে তেমনি আমাদের অন্তরঙ্গ হয়ে দেখা দেবে, এজন্য অনেক দিন আমাদের মাতৃভূমি অপেক্ষা করেছে।

বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় আপন স্বাভাবিক ভাষায় স্বদেশে সর্বজনের আত্মীয়তালাভে গৌরবান্বিত হবে, সেই আশার সংকেত আজকের দিনের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করার সুযোগ আমি পেয়েছি। তাই সমস্ত বাংলাদেশের গর্ব ও আনন্দ বহন করে এই সভায় আজ আমার উপস্থিতি। নতুবা এখানে স্থান পাবার মতো প্রবেশিকার মূল্য দেওয়া আমার দ্বারা সাধ্য হয় নি। আমার জীবনে প্রথম বয়সে স্বল্পক্ষণস্থায়ী ছাত্রদশা কেটেছে অভ্রভেদী শিক্ষাসৌধের অধস্তন তলায়। তার পর কিশোরবয়সে অভিভাবকদের নির্দেশমত একদিন সসংকোচে আমি প্রবেশ করেছিলুম বহিরঙ্গছাত্ররূপে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথমবার্ষিক শ্রেণীতে। সেই এক দিন আর দ্বিতীয় দিনে পৌঁছল না। আকারে প্রকারে সমস্ত ক্লাসের সঙ্গে আমার এমন-কিছু ছন্দের ব্যত্যয় ছিল যাতে আমাকে দেখবামাত্র পরিহাস উঠল উচ্ছ্বসিত হয়ে। বুঝলুম মণ্ডলীর বাহির থেকে আসামঞ্জস্য নিয়ে এসেছি। পরের দিন থেকেই অনধিকার প্রবেশের দুঃসাহসিকতা থেকে বিরত হয়েছিলুম এবং আর যে কোনো দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ পার হয়ে অধিকারীবর্গের এক পাশে স্থান পাব এমন দুরাশা আমার মনে ছিল না। অবশেষে একদিন মাতৃভাষার সাধনা-পুণ্যেই আজ সেই দুর্লভ অধিকার আমার মিলবে, সেদিন তা স্বপ্নের অতীত ছিল।

বর্তমান যুগ যুরোপীয় সভ্যতা-কর্তৃক সম্পূর্ণ অধিকৃত এ কথা মানতেই হবে। এই যুগ একটি বিশেষ উদ্যমশীল চিত্তপ্রকৃতির ভূমিকা সমস্ত জগতে প্রবর্তিত করছে। মানুষের বুদ্ধিগত জ্ঞানগত বিচিত্র চিন্তা ও কর্ম নব নব আকার নিচ্ছে এই ভূমিকার 'পরেই। বুদ্ধিপরিণীলনার বিশেষ গতি ও বিস্তৃতি সভ্য পৃথিবী জুড়ে সমস্ত মানুষের মধ্যেই একাট ঐক্যলাভে প্রবৃত্ত

হয়েছে। বিজ্ঞান সাহিত্য ইতিহাস অর্থনীতি রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি সকল বিষয়ই এবং চিন্তা করবার পদ্ধতি, সন্ধান করবার প্রণালী, সত্য যাচাই করবার আদর্শ, যুরোপীয় চিন্তের ভূমিকার উপরে উদ্ভাবিত ও আলোচিত হচ্ছে। এটা সম্ভবপর হতই না, যদি এর উপযোগিতা সর্বত্র নিয়ত পরীক্ষার দ্বারা স্বীকৃত না হত, যদি-না এই চিন্তা জয়যুক্ত হত তার সর্বপ্রকার অধ্যবসায়ে। সংসারযাত্রার কৃতার্থতালাভের জন্য আজ পৃথিবীতে সকল নবজাগ্রত দেশই যুরোপের এই চিন্তাস্রোতকে জনসাধারণের মধ্যে প্রবাহিত করে দেবার চেষ্টায় অবিরাম প্রবৃত্ত। সর্বত্রই বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রজাদের মনঃক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে নববিদ্যাসেচনের প্রণালী। এমন দেশও প্রত্যক্ষ দেখেছি নবযুগের প্রভাবে যে আজ বহু দীর্ঘ শতাব্দীর উপেক্ষা-সঞ্চিত স্তূপাকার নিরক্ষরতার বাধা অল্প কালের মধ্যে আশ্চর্য শক্তিতে উত্তীর্ণ হয়েছে; সেখানে যে জনমন একদা ছিল অখ্যাত আকারে আত্মপ্রকাশহীন অকৃতিত্বে লুপ্তপ্রায় সে আজ অব্যাহত শক্তি নিয়ে মানবসমাজের পুরোভাগে সসম্মানে অগ্রসর। এ দিকে যথোচিত অর্থ-অভাবে শ্রদ্ধা-অভাবে উৎসাহ-অভাবে দীনসম্বল আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতনগুলি স্বল্পপরিমিত ছাত্রদেরকে সবল্পমাত্র বিদ্যায় পরীক্ষা পার করবার সবল্পায়তন খেয়ানোকোর কাজ করে চলেছে। দেশের আত্মচেতনাহারা বিরাট মনকে স্পর্শ করছে তার প্রান্ততম সীমায়; সে স্পর্শও ক্ষীণ, যেহেতু তা প্রাণবান নয়, যেহেতু সে স্পর্শ আসছে বহিঃস্থিত আবরণের বাধার ভিতর দিয়ে। এই কারণে প্রাচ্যমহাদেশের যে-যে অংশ নবদিনের উদ্‌বোধন দেখা দিয়েছে, জ্ঞানজ্যোতিরবিকীর্ণ আত্মপরিচয়ের সম্মান-লাভে তাদের সকলের থেকে বহুদূর পশ্চাতে আছে ভারতবর্ষ।

আমার এবং বাংলাদেশের লেখকবর্গের হয়ে আমি এ কথা বলব যে, আমরা নবযুগের সংস্কৃতিতে দেশের মর্মস্থানে প্রতিষ্ঠিত করবার কাজ করে আসছি। বর্তমান যুগের নূতন বিদ্যাকে দেশের প্রাণনিকেতনে চিরন্তন করবার এই স্বতঃসক্রিয় উদ্যোগকে অনেকদিন পর্যন্ত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় আপন আমন্ত্রণক্ষেত্র থেকে পৃথক করে রেখেছেন, তাকে ভিন্নজাতীয় বলে গণ্য করেছেন। আশুতোষ সর্বপ্রথমে এই বিচ্ছেদের মধ্যে সেতু বেঁধেছিলেন যখন তিনি আমার মতো বাংলাভাষাচর লেখককে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার উপাধি দিতে সাহস করলেন। সেদিন যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন ছিল। কারণ, ইংরেজি ভাষা সম্পর্কে কৃত্রিম কৌলীন্যগর্ব আদিকাল থেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তরে অন্তরে সংস্কারগত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরভাষাশ্রিত আভিজাত্য-বোধকে অকস্মাৎ আঘাত করতে কুণ্ঠিত হলেন না, বিশ্ববিদ্যালয়ের তুঙ্গ মঞ্চচূড়া থেকে তিনিই প্রথম নমস্কার প্রেরণ করলেন তাঁর মাতৃভাষার দিকে। তার পরে

তিনিই বাংলাবিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাভাষার ধারাকে অবতারণ করলেন, সাবধানে তার স্রোতঃপথ খনন করে দিলেন। পিতৃনির্দিষ্ট সেই পথকে আজ প্রশস্ত করে দিচ্ছেন তাঁরই সুযোগ্য পুত্র বাংলাদেশের আশীর্ভাজন শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের দীক্ষামন্ত্র থেকে বঞ্চিত আমার মতো ব্রাত্য বাংলালেখককে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দিয়ে আশুতোষ প্রথম রীতি লঙ্ঘন করেছেন; আজ তাঁরই পুত্র সেই ব্রাত্যকেই আজকের দিনের অনুষ্ঠানে বাংলাভাষায় অভিভাষণ পাঠ করতে নিমন্ত্রণ করে পুনশ্চ সেই রীতিরই দুটো গ্রন্থি একসঙ্গে মুক্ত করেছেন। এতে বোঝা গেল বাংলাদেশে শিক্ষাজগতে পরিবর্তন হয়েছে, পাশ্চাত্য-আবহাওয়ার-শীতে-আড়ষ্ট শাখায় আজ এল নবপল্লবের উৎসব।

অন্যত্র ভারতবর্ষে সম্প্রতি এমন বিশ্ববিদ্যালয় দেখা দিয়েছে যেখানে স্থানীয় প্রজাসাধারণের ভাষা না হোক, শ্রেণীবিশেষের ব্যবহৃত ভাষা শিক্ষার বাহনরূপে আদ্যোপান্ত গণ্য হয়েছে এবং সেখানকার প্রধানবর্গ এই দুঃসাধ্য চেষ্টাকে আশ্চর্য সফলতা দিয়ে প্রশংসাভাজন হয়েছেন। এই অচিন্তিতপূর্ব সংকল্প এবং আশাতীত সিদ্ধিও কম গৌরবের বিষয় নয়। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন সমস্ত প্রদেশের প্রজাসাধারণ তার লক্ষ্য। বাংলাভাষার অধিকার এই প্রদেশের কোনো কোনো অঙ্গ যদিও শাসনকর্তাদের কাটারি দ্বারা কৃত্রিম বিভাগে বিক্ষত হয়ে বহিস্কৃত হয়েছে তবু অন্তত পাঁচ কোটি লোকের মাতৃভাষাকে এই শিক্ষার কেন্দ্র আপন ভাষারূপে স্বীকার করবার ইচ্ছা ঘোষণা করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্বদেশের প্রতি এই-যে সম্মান নিবেদন করলেন এর দ্বারা তিনি আজ সম্মাননীয়। যে শৌর্যবান পুরুষ স্বদেশের এই সৌভাগ্যের সূচনা করে গেছেন আজকের দিনে সেই আশুতোষের প্রতিও আমাদের সম্মান নিবেদন করি।

আমি জানি, যুরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতার মহত্ত্ব সম্বন্ধে সুতীব্র প্রতিবাদ জাগবার দিন আজ এসেছে। এই সভ্যতা বস্তুগত ধন-সঞ্চয়ে ও শক্তি-আবিস্কারে অদ্ভুত দ্রুত গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু সমগ্র মনুষ্যত্বের মহিমা তো তার বাহ্য রূপ এবং বাহ্য উপকরণ নিয়ে নয়। হিংস্রতা, লুন্ডতা, রাষ্ট্রিক কূটনীতির কুটিলতা পাশ্চাত্য মহাদেশ থেকে যে-রকম প্রচণ্ড মূর্তি ধরে মানুষের স্বাধিকারকে নির্মমভাবে দলন করতে উদ্যত হয়েছে ইতিহাসে এমন আর কোনো দিন হয় নি। মানুষের দুরাকাঙ্ক্ষাকে এমন বৃহৎ আয়তনে, এমন প্রভূত পরিমাণে, এমন সর্ববাধাজয়ী নৈপুণ্যের সঙ্গে জয়যুক্ত করতে কোনো দিন মানুষ সক্ষম হয় নি। আজ তা হতে পেরেছে বিশ্বপরাভবকারী বিজ্ঞানের জোরে। উনিশ শতকের আরম্ভে ও মাঝামাঝি কালে যখন যুরোপীয়

সভ্যতার সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় হয়েছিল তখন ভক্তির সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে আমাদের মনে প্রবল ধারণা জন্মেছিল যে, এই সভ্যতা সর্বমানবের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিয়ে জগতে আবির্ভূত; নিশ্চিত স্থির করেছিলুম যে, সত্যনিষ্ঠা ন্যায়পরতা ও মানুষের সম্বন্ধে সুগভীর শ্রেয়োবুদ্ধি এর চরিত্রগত লক্ষণ; ভেবেছিলুম মানুষকে অন্তরে বাহিরে সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্তি দেবার ব্রত এই সভ্যতা গ্রহণ করেছে। দেখতে দেখতে আমাদের জীবিতকালের মধ্যেই তার ন্যায়বুদ্ধি, তার মানবমৈত্রী এমনি ক্ষুণ্ণ হল, ক্ষীণ হল যে, বলদর্পিতের পেষণযন্ত্রে পীড়িত মানুষ এই সভ্যতার বিচারসভায় ধর্মের দোহাই দেবে এমন ভরসা আজ কোথাও রইল না। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের যে-সকল বিশ্ববিশ্রুত দেশ এই সভ্যতার প্রধান বাহন তারা পরস্পরকে হিন্সবিচ্ছিন্ন করবার উদ্দেশ্যে পাশব নখদন্তের অদ্ভুত উৎকর্ষ সাধনে সমস্ত বুদ্ধি ও ঐশ্বর্যকে নিযুক্ত করেছে। মানুষের প্রতি মানুষের এমন অপরিসীম ভীতি, এমন দৃঢ়বদ্ধমূল অবিশ্বাস অন্য কোনো যুগেই দেখা যায় নি। মানবজগতের যে উর্ধ্বলোক থেকে আলোক আসে, মুক্তির মন্ত্র যেখানকার বাতাসে সঞ্চারিত হয়, মানবচিত্তের সেই দ্যুলোক রিপু-পদদলিত পৃথিবীর উৎক্ষিপ্ত ধূলিতে আবিল, সাংঘাতিক মারীবীজে নিবিড়ভাবে পরিপূর্ণ। ইতিপূর্বে পৃথিবীতে আমরা যে-সকল মহা মহা সভ্যতার পরিচয় পেয়েছি তাদের প্রধান সাধনা ছিল, মানবজগতের উর্ধ্বলোককে নির্মল রাখা, সেখানে পুণ্যজ্যোতির বিকিরণকে অবরোধমুক্ত করা। ধর্মের শাস্ত নীতির প্রতি বিশ্বাস-হীন আজকের দিনে এই সাধনা অশ্রদ্ধাভাজন; সমস্ত পৃথিবীকে নিষ্ঠুর শক্তিতে অভিভূত করবার স্বাভাবিক দায়িত্ব নিয়ে এসেছে ব'লে যারা গর্ব করে এই সাধনা তাদের মতো শাসক ও শোষক জাতির পক্ষে অনুপযুক্ত ব'লে গণ্য। উগ্র লোভের তীব্র মাদকরস-পানে উন্মত্ত সভ্যতার পদভারে কম্পান্বিত সমস্ত পাশ্চাত্য মহাদেশ। যে শিক্ষায় কর্মবুদ্ধির সঙ্গে শুভবুদ্ধির এমন বিচ্ছেদ, যে সভ্যতা অসংযম মোহাবেশে আত্মহননোদ্যত, তার গৌরব ঘোষণা করব কোন্ মুখে!

কিন্তু একদিন মনুষ্যত্বের প্রতি সম্মান দেখেছি এই পাশ্চাত্যের সাহিত্যে ও ইতিহাসে। নিজেকে নিজেই সে আজ ব্যঙ্গ করলেও তার চিত্তের সেই উদার অভ্যুদয়কে মরীচিকা ব'লে অস্বীকার করতে পারি নে। তার উজ্জ্বল সত্তাই মিথ্যা এবং তার ম্লান বিকৃতিই সত্য, এ কথা বলব না।

সভ্যতার পদস্থলন ও আত্মখণ্ডন ঘটেছে বার বার, নিজের শ্রেষ্ঠ দানকে সে বার বার নিজে প্রত্যাখ্যান করেছে। এই দুর্ঘটনা দেখেছি আমাদের স্বদেশেও এবং অন্য দেশেও। দেখা গেছে,

মানবমহিমার শোচনীয় পতন ইতিহাসের পর্বে পর্বে। কিন্তু এই-সকল সভ্যতা যেখানে মহামূল্য সত্যকে কোনো দিন কোনো আকারে প্রকাশ করেছে সেইখান থেকেই সে চিরদিনের মতো জয় করেছে মানুষের মনকে; জয় করেছে আপন বাহ্য প্রতাপের ধূলিশায়ী ভগ্নস্তুপের উপরে দাঁড়িয়েও। যুরোপ মহৎ শিক্ষার উপাদান উপহার দিয়েছে মানুষকে। দেবার শক্তি যদি না থাকত তা হলে কোনো কালেই তার বিশ্বজয়ের যুগ আসত না এ কথা বলা বাহুল্য। সে দিয়েছে আপন অদম্য শৌর্যের, অসংকুচিত আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত; দেখিয়েছে প্রাণান্তকর প্রয়াস জ্ঞান-বিতরণের কাজে, আরোগ্যসাধনের উদ্যোগে। আজও এই সাংঘাতিক অধঃপতনের দিনে যুরোপের শ্রেষ্ঠ যাঁরা নিঃসন্দেহই ন্যায্যের পক্ষে, দুর্বলের পক্ষে, দুঃশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জাগিয়ে তাঁরা বলদৃপ্তের শাস্তিকে স্বীকার করছেন, দুঃখীর দুঃখকে আপন করে নিচ্ছেন। বারে বারে অকৃতার্থ হলেও তাঁরাই আশুপরাভবের মধ্য দিয়েও এই সভ্যতার প্রতিভূ। যে প্রেরণায় চারি দিকের কঠোর অত্যাচার ও চরিত্রবিকৃতির মধ্যে তাঁদের লক্ষ্যকে অবিচলিত রেখেছে সে প্রেরণাই এই সভ্যতার মর্মগত সত্য, তার থেকেই পৃথিবীর শিক্ষা গ্রহণ করবে, পাশ্চাত্য জাতির লজ্জাজনক অমানুষিক আত্মবমাননা থেকে নয়।

তোমরা যে-সকল তরুণ ছাত্র আজ এই সভায় উপস্থিত, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বার দিয়ে জীবনের জয়যাত্রার পথে অগ্রসর হতে প্রস্তুত, তোমাদের প্রতি আমার অভিনন্দন জানাই। তোমরাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন গৌরবদিনের প্রভূত সফলতার প্রত্যাশা আগামীকালের পথে বহন করতে যাত্রা করছ।

আজ প্রচণ্ড আলোড়ন উঠেছে পৃথিবীব্যাপী জনসমুদ্রে। যেন সমস্ত সভ্য জগৎকে এক কল্প থেকে আর-এক কল্পের তটে উৎক্ষিপ্ত করবার জন্যে দেব-দৈত্যে মিলে মল্লন শুরু হয়েছে। এবারকারো মনখনরজ্জু বিষধর সর্প, বহুফণাধারী লোভের সর্প। সে বিষ উদগার করছে। আশ্মার মধ্যে সমস্ত বিষটাকে জীর্ণ করে নেবেন এমন মৃত্যুঞ্জয় শিব পাশ্চাত্য সভ্যতার মর্মস্থানে আসীন আছেন কি না এখনো তার প্রমাণ পাই নি। ভারতবর্ষে আমরা আদি কালের রুদ্রলীলাসমুদ্রের তটসীমায়। বর্তমান মানবসমাজের এই দুঃখের আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দেবার উপলক্ষ আমাদের ঘটেনি। কিন্তু, ঘূর্ণির টান বাহির থেকে আসছে আমাদের উপরে এবং ভিতরের থেকেও দুর্গতির ঢেউ আছাড় খেয়ে পড়ছে আমাদের দক্ষিণে বামে। সমস্যার পর দুঃসাধ্য সমস্যা এসে অভিভূত করছে দেশকে। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে পরস্পর-বিচ্ছেদ ও বিরোধ

নানা কদর্য মূর্তিতে প্রকাশিত হয়ে উঠল; বিকৃতি আনলে আমাদের আত্মকল্যাণবোধে। এই সমস্যার সমাধান সহজে হবার নয়, সমাধান না হলেও নিরবচ্ছিন্ন দুর্গতি।

সমস্ত দেশের সংস্কৃতি সৌভ্রাতৃ সচ্ছলতা একদা বিকীর্ণ ছিল আমাদের গ্রামে। আজ যেখানে প্রবেশ করলে দেখতে পাবে, মরণদশা তার বুকে খরনখর বিদ্ধ করেছে একটা রক্তশোষী স্থাপদের মতো। অনশন ও দুঃখদারিদ্র্যের সহচর মজ্জাগত মারী সমস্ত জাতির জীবনীশক্তিকে জীর্ণজর্জর ক'রে দিয়েছে। এর প্রতিকার কোথায় সে কথা ভাবতে হবে আমাদের নিজেকে- অশিক্ষিত কল্পনার দ্বারা নয়, ভাষাবিহীন দৃষ্টির বাষ্পকুলতা দিয়ে নয়। এই পণ ক'রে চলতে হবে যে, পরাস্ত যদি হতেও হয় তবে সে যেন প্রতিকূল অবস্থার কাছে ভীর্ণ মতো হাল ছেড়ে দিয়ে নয়; যেন নির্বোধের মতো নির্বিচারে আত্মহত্যার মাঝদরিয়ায় ঝাঁপ দিয়ে পড়াকেই গর্বের বিষয় না মনে করি।

ভাবপ্রবণতা আছে আমাদের দেশে অতিপরিমাণে। কর্মোদ্যোগে নিজেকে অপ্রমত্তভাবে প্রবৃত্ত করতে আমাদের মন যায় না। অবাস্তবের মোহাবেশ কাটিয়ে পুরুষের মতো উজ্জ্বল বুদ্ধির আলোকে দেশের সমস্ত অসম্পূর্ণতা মূঢ়তা কদর্যতা সব-কিছুকে অতুষ্ণিবর্জিত করে জেনে দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করো। যেখানে বাস্তবের ক্ষেত্রে ভাগ্য আমাদের প্রতিদিন বঞ্চিত করে অবমানিত করে, সেখানে ঘর-গড়া অহংকারে নিজেকে ভোলাবার চেষ্টা দুর্বল চিত্তের দুর্লক্ষণ। সত্যকার কাজ আরম্ভ করার মুখে এ কথা মানাই চাই যে, আমাদের সমাজে, আমাদের স্বভাবে, আমাদের অভ্যাসে, আমাদের বুদ্ধিবিকারে গভীরভাবে নিহিত হয়ে আছে আমাদের সর্বনাশ। যখনই আমাদের দুর্গতির সকল দায়িত্ব একমাত্র বাহিরের অবস্থার অথবা অপর কোনো পক্ষের প্রতিকূলতার উপর আরোপ ক'রে বধির শূন্যের অভিমুখে তারস্বরে অভিযোগ ঘোষণা করি তখনই হতাশ্বাস ধৃতরাষ্ট্রের মতো মন ব'লে ওঠে : তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়।

আজ আমাদের অভিযান নিজের অন্তর্নিহিত আত্মশত্রুতার বিরুদ্ধে; প্রাণপণ আঘাত হানতে হবে বহুশতাব্দীনির্মিত মূঢ়তার দুর্গভিত্তি-মূলে। আগে নিজের শক্তিকে তামসিকতার জড়িমা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে তার পরে পরের শক্তির সঙ্গে আমাদের সম্মানিত সন্ধি হতে পারবে। নইলে আমাদের সন্ধি হবে ঋণের জালে, ভিক্ষুকতার জালে আষ্টেপৃষ্ঠে আড়ষ্টকর পাকে জড়িত। নিজের শ্রেষ্ঠতার দ্বারাই অন্যের শ্রেষ্ঠতাকে আমরা জাগাতে পারি, তাতেই মঙ্গল আমাদের ও

অন্যের। দুর্বলের প্রার্থনা যে কুণ্ঠাগ্রস্ত দান সঞ্চয় করে সে দান শতছিদ্র ঘটের জল, যে আশ্রয় পায় চোরাবালিতে সে আশ্রয়ের ভিত্তি।-

হে বিধাতা,

দাও দাও মোদের গৌরব দাও

দুঃসাধ্যের নিমন্ত্রণে

দুঃসহ দুঃখের গর্বে।

টেনে তোলো রসাক্ত ভাবের মোহ হতে।

সবলে ধিক্কৃত করো দীনতার ধুলায় লুণ্ঠন।

দূর করো চিত্তের দাসত্ববন্ধ,

ভাগ্যের নিয়ত অক্ষমতা,

দূর করো মূঢ়তায় অযোগ্যের পদে

মানবমর্যাদা বিসর্জন,

চূর্ণ করো যুগে যুগে স্তূপীকৃত লজ্জারশি

নিষ্ঠুর আঘাতে।

নিঃসংকোচে

মস্তক তুলিতে দাও

অনন্ত আকাশে

উদাত্ত আলোকে,

মুক্তির বাতাসে।

পরিশিষ্ট

শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধের অনুবৃত্তি

‘শিক্ষার হেরফের’ নামক প্রবন্ধ যখন লিখিত হয় তখন মনে করি নাই যে, বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রুটি প্রদর্শনে কাহারও হৃদয়ে আঘাত লাগিবে। বিশেষত উক্ত প্রবন্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সম্মুখেই পঠিত হয়। সেখানে রাজসাহী কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা কেহ কোনোরূপ ক্ষোভ প্রকাশ করেন নাই ; বরং যতদূর জানা গিয়াছিল অনেকেই অনুকূলভাবে লেখকের মতের অনুমোদন করিয়াছিলেন।

অবশেষে উক্ত প্রবন্ধ সাধনায় প্রকাশিত হইলে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী পাঠক উহা ইংরেজিতে অনুবাদ করিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন এবং কলেজের অনেক পুরাতন ছাত্রের নিকট উহার ঐকমত শুনা যায়। বঙ্কিমবাবু, গুরুদাসবাবু এবং আনন্দমোহন বসু মহাশয় তৎসম্বন্ধে যে-পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাও পাঠকগণ অবগত আছেন।^১

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি যাঁহাদের হৃদয়নিকুঞ্জে প্রিয়স্থান অধিকার করিয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বহির্ভূক্ত লোকের মুখে তাহার কোনোরূপ অমর্যাদার কথা শুনিলে তাঁহাদের মধ্যে কাহারও মনক্ষোভ উপস্থিত হইতে পারে সন্দেহ নাই, অতএব বর্তমান আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া আমি আমার পক্ষে দুর্ভাগ্য বিবেচনা করি। কেবল, বিশ্ববিদ্যালয়ের যাঁহারা গৌরবস্থল এমন অনেক মহোদয়ের উৎসাহবাক্যে আমি নিজের লজ্জা নিবারণে সক্ষম হইতেছি।

তর্কের আরম্ভেই যখন মূল কথা ছাড়িয়া আনুষঙ্গিক কথা লইয়া আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং প্রতিপক্ষকে সমগ্রভাবে বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া তাহার কথাগুলিকে খণ্ড খণ্ড ভাবে আক্রমণ করিবার আয়োজন হয়, তখন সেই নিষ্ফল বাক্যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করাই সুবুদ্ধিসংগত। সিঁদুরে মেঘ খুব রক্তবর্ণ হইয়া উঠে কিন্তু বারিবর্ষণ করে না, এরূপ তর্কও সেইমত রুদ্রমূর্তি ধারণ করে কিন্তু শীতল শান্তিবারি বর্ষণ না করিয়াই বায়ুবেগে উড়িয়া যায়।

ভাষা একে অসম্পূর্ণ, তাহাতে তাহাকে স্বস্থানচ্যুত করিয়া স্বতন্ত্রভাবে দেখিলে তাহার প্রকৃত অর্থ উদ্ধার করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। পাঠক সাধারণেরও পূর্বাপর মিলাইয়া দেখিবার অবসর নাই, সেই কারণে প্রতিবাদমাত্রেই তাঁহাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং

শিক্ষাসঙ্কট^২ প্রবন্ধে আমাদের যে-সকল কথাই যথার্থ অর্থনির্ণয় হয় নাই তাহার পুনরবতারণ করিতে বাধ্য হইলাম।

উক্ত প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছেঃ

আমাদের শিক্ষাপ্রণালী মনকে অত্যাৱশ্যক বিষয়ে নিবদ্ধ রাখে এ কথা ভিত্তিহীন। সাধনায় প্রকাশিত প্রবন্ধে পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে কেন বর্তমান শিক্ষার ঘাড়ে এই দোষ চাপাইয়াছেন বলিতে পারি না। দোষ যে কে কাহার ঘাড়ে কেন চাপায় বোঝা শক্ত ; অবশেষে অদৃষ্টকেই দোষী করিতে হয়। আমি যে ঠিক পূর্বোক্তভাবে কথা বলিয়াছি এ দোষ আমার ঘাড়েই বা কেন চাপানো হইল তাহা কে বলিতে পারে।

আমি কেবল বলিয়াছিলাম আমাদের দেশে শিশুদের স্বেচ্ছাপাঠ্য গ্রন্থ নাই। ইংরেজের ছেলে কেবল যে ভূগোল এবং জ্যামিতির

১ দ্রষ্টব্য গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী, বর্তমান খণ্ড (প্রচলিত দ্বাদশ খণ্ড)

২ শিক্ষাসঙ্কট। মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়। ভারতী, জ্যৈষ্ঠ, ১৭শ ভাগ

সূত্র কণ্ঠস্থ করিয়া মরে তাহা নহে, বিবিধ আমোদজনক কৌতুকজনক গল্পের বই, ভ্রমণবৃত্তান্ত, বীরকাহিনী, সুখপাঠ্য বিজ্ঞান ইতিহাস পড়িতে পায়। বিশেষত তাহারা স্বভাষায় শিক্ষালাভ করে বলিয়া পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে যতটুকু সাহিত্যরস থাকে তাহা অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু আমাদের ছেলেরা কায়ক্লেশে কেবলই শিক্ষণীয় বিষয়ের শুষ্ক অংশটুকু মুখস্থ করিয়া যায়।

এ স্থলে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে কোনো কথাই বলি নাই।

মনে আছে আমরা বাল্যকালে কেবলমাত্র বাংলাভাষায় শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলাম, বিদেশী ভাষার পীড়নমাত্র ছিল না। আমরা পণ্ডিতমহাশয়ের নিকট পাঠ সমাপন করিয়া কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামদাসের মহাভারত পড়িতে বসিতাম। রামচন্দ্র ও পাণ্ডবদিগের বিপদে কত অশ্রুপাত ও সৌভাগ্যে কী নিরতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছি তাহা আজিও ভুলি নাই। কিন্তু আজকাল আমার জ্ঞানে আমি একটি ছেলেকেও ঐ দুই গ্রন্থ পড়িতে দেখি নাই। অতি বাল্যকালেই ইংরেজির সহিত মিশাইয়া বাংলা তাহাদের তেমন সুচারুরূপে অভ্যস্ত হয় না এবং অনভ্যস্ত ভাষায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গ্রন্থ পাঠ করিতে স্বভাবতই তাহারা বিমুখ হয়, এবং ইংরেজিতেও শিশুবোধ্য বহি পড়া তাহাদের পক্ষে অসাধ্য, অতএব দায়ে পড়িয়া আমাদের

ছেলেদের পড়াশুনা কেবলমাত্র কঠিন শুষ্ক অত্যাবশ্যক পাঠ্যপুস্তকেই নিবদ্ধ থাকে ; এবং তাহাদের চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তি বহুকাল পর্যন্ত খাদ্যাভাবে অপুষ্ট অপরিণত থাকিয়া যায়।

আমি বলিয়াছিলাম ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সৌধবুদ্ধবুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে ; লোকপ্রবাহের গভীর তলদেশে তাহার মূল নাই। বলা বাহুল্য, এরূপ কথা তুলনাসাপেক্ষ। যে-সকল কথা কাব্যে পুরাণে প্রচলিত, যে-সকল কথা দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে মুখে সর্বদা প্রবাহিত, যে-সকল কথা সহজে স্বাভাবিক নিয়মে অনুক্ষণ কার্যে পরিণত হইয়া উঠিতেছে, তাহাই জাতীয় জীবনের মূলে গিয়া সঞ্চিত হইতেছে, তাহাই চিরস্থায়ী। অতএব কোনো শিক্ষাকে স্থায়ী করিতে হইলে, গভীর করিতে হইলে, ব্যাপক করিতে হইলে তাহাকে চিরপরিচিত মাতৃভাষায় বিগলিত করিয়া দিতে হয়। যে-ভাষা দেশের সর্বত্র সমীরিত, অন্তঃপুরের অসূর্যস্পর্শ কক্ষও যাহার নিষেধ নাই, যাহাতে সমস্ত জাতির মানসিক নিশ্বাসপ্রশ্বাস নিষ্পন্ন হইতেছে, শিক্ষাকে সেই ভাষার মধ্যে মিশ্রিত করিলে তবে সে সমস্ত জাতির রক্তকে বিশুদ্ধ করিতে পারে, সমস্ত জাতির জীবনক্রিয়ার সহিত তাহার যোগসাধন হয়। বুদ্ধ সেইজন্য পালিভাষায় ধর্মপ্রচার করিয়াছেন, চৈতন্য বঙ্গভাষায় তাঁহার প্রেমাবেগ সর্বসাধারণের অন্তরে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন। অতএব আমি যখন বলিয়াছিলাম, ভাবিয়া দেখিলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সৌধবুদ্ধবুদ্ধ বলিয়া প্রতীত হইবে তাহার এমন অর্থ নহে যে, বিশ্ববিদ্যালয় কোনো কাজ বা অকাজ করিতেছে না এবং ইংরেজিশিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের কোনো উপকার বা অপকার হয় নাই। আমার কথার অর্থ এই ছিল, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের জাতীয় জীবনের অন্তরে মূল প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। কাল যদি ইংরেজ দেশ হইতে চলিয়া যায় তবে ঐ বড়ো বড়ো সৌধগুলি কোথাও দাঁড়াইবার স্থান পায় না।

ইংরেজিশিক্ষার সুফলের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস আছে বলিয়াই যাহাতে সেই শিক্ষা মাতৃভাষা অবলম্বন করিয়া গভীর ও স্থায়ী -রূপে দেশের অন্তরের মধ্যে ব্যাপ্ত হইতে পারে, এই ইচ্ছা যাঁহারা প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে উদাহরণের দ্বারা বলা বাহুল্য যে, পূর্বে ‘বাসুকির গাত্রকণ্ঠে অপনোদনেচ্ছা ভূমিকম্পের হেতু’ এইরূপ বিশ্বাস ছিল, এক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূমিকম্পের অন্য কারণ প্রচার করিতেছে। আমাদের অভিপ্রায় এই যে, ভূমিকম্পের কাল্পনিক হেতুনির্ণয়ের মূলোচ্ছেদন করিতে হইলে ইংরেজিশিক্ষাকে সহজ স্বাভাবিক ও সাধারণের আয়ত্তগম্য করিতে হইবে, যাহাতে শিশুকাল হইতে তাহার সার গ্রহণ করিতে পারি, যাহাতে বহুব্যায়ে ও সাংঘাতিক চেষ্টায় তাহাকে ক্রয় করিতে না হয়, যাহাতে অন্তঃপুরেও তাহার প্রবেশ সুলভ হয়। নতুবা

শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও বাসুকির গাত্রকণ্ঠ ভূমিকম্পের কারণরূপে ফিরিয়া দেখা দেয় এমন উদাহরণের অভাব নাই।

‘ইংরাজিশিক্ষায় কৃতবিদ্য শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত’ ইংরেজিশিক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে যে কথা^১ বলিয়াছেন ‘শিক্ষাসঙ্কট’ প্রবন্ধে তাহার উচিত অর্থ গ্রহণ হয় নাই, আমার এই বিশ্বাস। শিক্ষাটা কতদূর হয় বা না-হয়, ইহার তাঁহার আলোচ্য বিষয় ছিল। তাঁহার সমস্ত প্রবন্ধে কোথাও তিনি বলেন নাই যে, পূর্বাপেক্ষা এক্ষণে লোক ঘুষ অধিক লইতেছে অথবা জাল করিতে অধিকতর পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে। তিনি কেবল এই বলিয়াছেন যে, বর্তমান প্রণালীতে ছাত্রেরা কেবল যে ভালো শেখে না তাহা নহে পরন্তু ভুল শেখে। কিন্তু প্রতিবাদক সমস্ত প্রবন্ধের সহিত ভাব না মিলাইয়া একটিমাত্র বিচ্ছিন্ন পদ অবলম্বন করিয়া সবিস্তারে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, পুরাকালে লোকে ঘুষ লইত, জালিয়াতকে আশ্রয় দিত, এবং বাসুকির গাত্রকণ্ঠ অপনোদনেচ্ছা ভূমিকম্পের হেতু বলিয়া বিশ্বাস করিত।

লেখক আমার সম্বন্ধে বলিয়াছেনঃ

যাঁহার মত এক্ষণে আলোচিত হইল তিনি তো ইংরেজিশিক্ষা নিষ্ফল এইমাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত।

–যদি সত্যই আমি এইমাত্র বলিতাম তবে কোথায় গিয়া ক্ষান্ত হইতাম বলা শক্ত ; তবে এখনকার ছেলেরা আমাকে ঢিল ছুঁড়িয়া মারিত, এবং বন্ধিমবাবু, গুরুদাসবাবু ও আনন্দমোহন বসু মহাশয় কখনোই আমার লেখার তিলমাত্র অনুমোদন করিতেন না।

লেখক সর্বশেষে বলিয়াছেনঃ

আলোচ্য প্রবন্ধগুলি পড়িয়া আর-একটি ভাব মনে উদয় হয়– সন্দেহ উঠে যে, লেখকগণ হয়তো অনেক সময় ভুলিয়া যান যে, এ দেশে ধান জন্মে আর বিলাতে জন্মায় ওক – এটা ভারতবর্ষ, ইংলন্ড নয়।

আমরা ঠিক সেই কথাটাই ভুলি না ; আমরাই বারংবার বলিতেছি, এ দেশে ধান জন্মে আর বিলাতে জন্মায় ওক। এখনকার দেশী ভাষা বাংলা, ইংরেজি নহে। যদি কষণ করিয়া সম্যক্ ফললাভ করিবার ইচ্ছা হয় তবে বাংলায় করিতে হইবে, নতুবা ঠিক ‘কালচার’ হইবে না।

আমরা এ কথা স্বপ্নেও ভুলি না যে, এ দেশে ধান জন্মে আর বিলাতে জন্মায় ওক। এইজন্যই আমরা বাংলায় যাহা পাই তাহাকেই বহুমান্য করি ; ইংরেজির সহিত তুলনা করিয়া

তাহাকে হতাদর করিবার চেষ্টা করি না। এইজন্যই আমরা বাঙালির শিক্ষাসাধনের ভার কতক পরিমাণে বাংলার প্রতিও অর্পণ করিতে ইচ্ছা করি। এইজন্যই আমরা মনে করি, ইংরেজি শিক্ষা বাংলাভাষার মধ্যে যে-পরিমাণে অঙ্কুরিত হইয়া উঠে সেই পরিমাণেই তাহার ফলবান হইবার সম্ভাবনা।

বাংলার শস্য, বাংলার ভাষা, বাংলার সাহিত্যের প্রতি আমাদের কৃপাদৃষ্টি নাই, তাহার প্রতি আমাদের অন্তরের প্রীতি এবং একান্ত বিশ্বাস আছে, এ কথায় যাঁহাদের ‘সন্দেহ’ হয় তাঁহারা পুনর্বার ধীরভাবে আলোচ্য প্রবন্ধগুলির যথার্থ মর্ম গ্রহণ করিয়া পড়িয়া দেখিবেন। এবং যদি কোথাও দৈবক্রমে কোনো একটি বা দুটি কথায় কোনো ত্রুটি বা কোনো অলংকারদোষ ঘটিয়া থাকে তবে তাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক মার্জনা করিবেন ; কারণ, আমরা তর্কের ইন্ধন সংগ্রহ করিবার জন্য প্রবন্ধগুলি লিখি নাই, যথার্থই আবশ্যক এবং বেদনা অনুভব করিয়া লিখিয়াছি।

১ শিক্ষাপ্রণালী। সাধনা মাঘ ১২৯৯

প্রসঙ্গকথা

১

অল্পকাল হইল বাংলাদেশের তৎসাময়িক শাসনকর্তা ম্যাকেঞ্জিসাহেবকে সভাপতির আসনে বসাইয়া মান্যবর শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় তাঁহার স্বপ্রতিষ্ঠিত সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশনের দূরবস্থা উপলক্ষে নিজের সম্বন্ধে করুণা, স্বদেশ সম্বন্ধে আক্ষেপ, এবং স্বদেশীয়ে প্রত্যাশা প্রকাশ করিয়াছেন। ব্যাপারটি সম্পূর্ণ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

তাঁহার সমস্ত বক্তৃতার মধ্যে একটা নালিশের সুর ছিল। বাদী ছিলেন তিনি, প্রতিবাদী ছিল তাঁহার অবশিষ্ট স্বজাতিবর্গ এবং জজ ও জুরি ছিল ম্যাকেঞ্জিপ্রমুখ রাজপুরুষগণ। এ বিচারে আমাদের নিরপরাধে খালাস পাইবার আশামাত্র ছিল না।

কবুল করিতেই হইবে, আমাদের অপরাধ অনেক আছে এবং সেজন্য আমরা লজ্জিত— অথবা সুগভীর অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্য -বশত লজ্জাবোধও আমাদের নাই। কিন্তু সেই অপরাধখণ্ডনের ভার আমাদের দেশের বড়োলোকদের উপর। মানবসমাজের বিচারালয়ে বাঙালির নাম আসামীশ্রেণী হইতে খারিজ করিয়া লইবার জন্যই তাঁহারা জন্মিয়াছেন, সেই তাঁহাদের জীবনের সার্থকতা। নালিশ করিবার লোক ঢের আছে এবং বাঙালির নামে নালিশ শুনিবার লোকও রাজপুরুষদের মধ্যে যথেষ্ট মিলিবে।

প্রাণীদের মধ্যে মনুষ্যজাতিটা খুব শ্রেষ্ঠজাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ ; তথাপি ইতিহাসের আরম্ভভাগ হইতেই দেখা যায় মনুষ্যের উপকার করা সহজ কাজ নহে। যাঁহারা ইহাকে বিপুল চেষ্টা ও সুদীর্ঘ সময়-সাধ্য বলিয়া না জানেন তাঁহারা যেন সাধারণের উপকার করার কাজটায় হঠাৎ হস্তক্ষেপ না করেন। যদি করেন তবে অবশেষে পাঁচজনকে ডাকিয়া বিলাপ পরিতাপ ও সাধারণের প্রতি দোষারোপ করিয়া সান্ত্বনা পাইবার প্রয়াস পাইতে হইবে। তাহা দেখিতেও শোভন হয় না, তাহার ফলও নিরুৎসাহজনক, এবং তাহাতে গৌরবহানি ঘটে।

অবশ্য সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রতি মহেন্দ্রবাবুর অকৃত্রিম অনুরাগ আছে এবং সেই অনুরাগের টানে তিনি অনেক করিয়াছেন। কিন্তু অনেক করিয়াছেন বলিয়া বিলাপ না করিয়া তাঁহাকে যে আরো অনেক করিতে হয় নাই সেজন্য কৃতজ্ঞতা অনুভব করা উচিত ছিল। বিজ্ঞানপ্রচারের উৎসাহে কোনো মহাপুরুষ জেলে গিয়াছেন, কোনো মহাপুরুষকে অগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইয়াছে। বড়োলোক হইয়া বড়ো কাজ করিতে গেলে এরূপ অসুবিধা ঘটয়া থাকে।

মহেন্দ্রবাবুর অপেক্ষা অধিকতর চেষ্টা করিয়া তাঁহা অপেক্ষা অধিকতর নিষ্ফল অনেকে হইয়াছেন। ডাক্তার সরকারকে জিজ্ঞাসা করি, আজ পর্যন্ত সমস্ত বঙ্গদেশে এমন কয়টা অনুষ্ঠান আছে যে নিজের ঘর-দুয়ার ফাঁদিতে পারিয়াছে, বহুব্যয়সাধ্য আসবাব সংগ্রহ করিয়াছে, যাহার স্থায়ী অর্থের সংস্থান হইয়াছে, এবং যাহার সভাপতি দেশের ছোটোলাট বড়োলাট সাহেবকে সম্মুখে বসাইয়া নিজের মহৎ ত্যাগস্বীকার ঘোষণাপূর্বক অশ্রুপাত করিবার দুর্লভ অবসর পাইয়াছে। যতটা হইয়াছে বাঙালি তাহার জন্য ডাক্তার সরকারের নিকট কৃতজ্ঞ, কিন্তু সেজন্য তিনিও বাঙালির নিকট কতকটা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে পারিতেন।

বড়োলোকেরা বড়ো কাজ করিয়া থাকেন কিন্তু তাঁহারা আলাদিনের প্রদীপ লইয়া জন্মগ্রহণ করেন না। কাজেই তাঁহারা রাতারাতি অসাধ্য সাধন করিতে পারেন না। আমাদের দুর্ভাগ্য দেশে উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদের নাম ছোটোখাটো আলাদিনের প্রদীপবিশেষ। সেই প্রদীপের সাহায্যে এবং ডাক্তার সরকারের নিজের নাম ও চেষ্টার জোরে এই বিজ্ঞানচর্চাবিহীন বঙ্গদেশে অকস্মাৎ পাকা ভিত এবং যন্ত্রতন্ত্রসহ এক সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশন উঠিয়া পড়িল। ইহাকে একপ্রকার ভেলকি বলা যাইতে পারে।

কিন্তু বাস্তবজগতে আরব্য উপন্যাস অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে না। ভেলকির জোরে জনসাধারণের মনে বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ সঞ্চার করা সম্ভব নহে। আজ প্রায় সিকি শতাব্দীকালবাংলাদেশে বিজ্ঞানের জন্য একখানা পাকাবাড়ি, কতকগুলি আসবাব এবং কিঞ্চিৎ

অর্থ আছে বলিয়াই যে বিজ্ঞান আপনা-আপনি গোকুলে বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে এমন কোনো কথা নাই। আরো আসবাব এবং আরো টাকা থাকিলেই যে বিজ্ঞান আরো ফুলিয়া উঠিবে এমনও কোনো বৈজ্ঞানিক নিয়ম দেখা যায় না।

অবশ্য, দেশ কাল পাত্র সমস্তই ষোলো-আনা অনুকূল যদি হয় তবে তাহার মতো সুখের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু সর্বত্রই প্রায় কোনো-না কোনোটা সম্বন্ধে টানাটানি থাকেই ; আমাদের এ দরিদ্র দেশে তো আগাগোড়াই টানাটানি। অন্তত বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের যেমন দেশ, তেমনই কাল, তেমনই পাত্র। এখানে সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশন নামক একটা কল জুড়িয়া দিলেই যে বিজ্ঞান একদমে বাঁশি বাজাইয়া রেলগাড়ির মতো ছুটিতে থাকিবে, অত্যন্ত অন্ধ অনুরাগও এরূপ দুরাশা পোষণ করিতে পারে না। গাড়ি চলে না বলিয়া দেশাধিপতির নিকট দেশের নামে নালিশ রুজু না করিয়া আপাতত রাস্তা বানাইতে শুরু করা কর্তব্য।

রাস্তা বানাইতে গেলে নামিয়া আসিয়া একেবারে মাটিতে হাত লাগাইতে হয়। আমাদের দেশের বড়োলোকদের নিকটে সে-প্রস্তাব করিতে সংকোচ বোধ করি, কিন্তু অগত্যা না করিয়া থাকা যায় না। বিজ্ঞান যাহাতে দেশের সর্বসাধারণের নিকট সুগম হয় সে-উপায় অবলম্বন করিতে হইলে একেবারে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার গোড়াপত্তন করিয়া দিতে হয়। সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশন যদি গত পঁচিশ বৎসর এই কার্যে যত্নশীল হইতেন তবে যে-ফললাভ করিতেন তাহা রাজপুরুষবর্গের সমুচ্চ প্রাসাদবাতায়ন হইতে দৃষ্টিগোচর না হইলেও আমাদের এই বিজ্ঞানদীন দেশের পক্ষে অত্যন্ত মহার্ঘ হইত।

নালিশ এই যে বিজ্ঞানসভা দেশের জনসাধারণের নিকট হইতে উপযুক্তমত খোরাকি এবং আদর পায় না। কেমন করিয়া পাইবে। যাহারা বিজ্ঞানের মর্যাদা বোঝে না তাহারা বিজ্ঞানের জন্য টাকা দিবে, এমন অলৌকিক সম্ভাবনার পথ চাহিয়া বসিয়া থাকা নিষ্ফল। আপাতত মাতৃভাষার সাহায্যে সমস্ত বাংলাদেশকে বিজ্ঞানচর্চায় দীক্ষিত করা আবশ্যিক, তাহা হইলেই বিজ্ঞানসভা সার্থক হইবে এবং সফলতা মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় দিগন্তে বিলীন হইবে না।

পূর্বকালে ভারতবর্ষে কেবল ব্রাহ্মণদের জ্ঞানানুশীলনের অধিকার ছিল। ব্রহ্মণ্যের উচ্চ আদর্শ সেই কারণেই ক্রমে ম্লান এবং বিকৃত হইয়া যায়। ক্রমে কর্ম নিরর্থক, ধর্ম পুঁথিগত, এবং পুঁথিও মুখস্থবিদ্যায় পরিণত হইয়া আসিতেছিল। ইহার কারণ, নিম্নের মাধ্যাকর্ষণশক্তি অত্যন্ত প্রবল। যেখানে চতুর্দিক অনুন্নত সেখানে সংকীর্ণ উন্নতিকে দীর্ঘকাল রক্ষা করা দুঃসাধ্য। অদ্য

ব্রাহ্মণ নামমাত্র ব্রাহ্মণ, তাহার তিন দিনের উপনয়ন ব্রহ্মচর্যের বিদ্রূপমাত্র, তাহার মন্ত্রার্থজ্ঞানহীন সংস্কার বর্বরতা। তাহার কারণ, অশিক্ষিত বিপুলবিস্তৃত শূদ্রসম্প্রদায় আপন দূরব্যাপী প্রকাণ্ড মূঢ়তার গুরুভারে ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মণ্যের উচ্চশিরকে ধূলিসাৎ করিয়া জয়ী হইয়াছে।

অদ্য ইংরেজিশিক্ষিতগণ কিয়ৎপরিমাণে সেই ব্রাহ্মণদের স্থান অধিকার করিয়াছেন। সাধারণের কাছে ইংরেজিভাষা বেদের মন্ত্র অপেক্ষা সরল নহে। এবং অধিকাংশ জ্ঞানবিজ্ঞান ইংরেজিভাষার কড়া পাহারার মধ্যে আবদ্ধ।

তাহার ফল এই, বিদ্যালয়ে আমরা যাহা লাভ করি সমাজে তাহার কোনো চর্চা নাই। সুতরাং আমাদের বিদ্যা আমাদের প্রাণের সহিত রক্তের সহিত মিশ্রিত হয় না। বিদ্যার প্রধান গৌরব দাঁড়াইয়াছে অর্থোপার্জনের উপায়রূপে।

সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশন সেই স্বল্পসংখ্যক আধুনিক ব্রাহ্মণস্থানীয়দের জন্য আপন শক্তি নিয়োগ করিয়াছে। যে-কয়জনা ইংরেজিতে বিজ্ঞান শেখে সভা তাহাদের নিকট ইংরেজিভাষায় বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করে ; বাকি সমস্ত বাঙালির সহিত তাহার কিছুমাত্র সংস্রব নাই। অথচ সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশনের জন্য বাঙালি বিশেষ উদ্যোগী হইতেছে না, এ আক্ষেপ তাহার উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছে।

বিজ্ঞানচর্চার দ্বারা জিজ্ঞাসাবৃত্তির উদ্রেক, পরীক্ষণশক্তির সূক্ষ্মতা এবং চিন্তনক্রিয়ার যাথাতথ্য জন্ম এবং সেইসঙ্গে সর্বপ্রকার ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত ও অন্ধ সংস্কার সূর্যোদয়ে কুয়াশার মতো দেখিতে দেখিতে দূর হইয়া যায়। কিন্তু আমরা বারংবার দেখিয়াছি আমাদের দেশের ইংরেজিশিক্ষিত বিজ্ঞানঘেষা ছাত্রেরাও কালক্রমে তাহাদের সমস্ত বৈজ্ঞানিক কায়দা টিলা দিয়া অযৌক্তিক সংস্কারের হস্তে আত্মসমর্পণপূর্বক বিশ্রামলাভ করেন। যেমন পাথুরে জমির উপর আধহাতখানেক পুষ্করিণীর পাঁক তুলিয়া দিয়া তাহাতে বৃক্ষ রোপণ করিলে গাছটা প্রথম প্রথম খুব ঝাড়িয়া মাথা তুলিয়া ডালেপালায় গজাইয়া উঠে, অবশেষে শিকড় যেমনি নীচের কঠিন স্তরে গিয়া ঠেকে অমনি অকস্মাৎ মুষড়িয়া মরিয়া যায়— আমাদের দেশের বিজ্ঞানশিক্ষারও সেই অবস্থা।

ঘরে-বাইরে চারি দিকে বিজ্ঞানের আলোককে সাধারণভাবে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিলে তবেই বিশেষভাবে বিজ্ঞানের চর্চা এ দেশে স্থায়ীরূপে বর্ধিত হইতে পারিবে। নতুবা আপাতত দুইদিনের উন্নতি দেখিয়া অত্যন্ত উৎফুল্ল হইবার কারণ নাই— কেননা, চারি দিকের দিগন্তপ্রসারিত মূঢ়তা

দিনে নিশীথে অলক্ষ্যভাবে আকর্ষণ করিয়া সংকীর্ণমূল উচ্চতাকে আপনার সহিত সমভূম করিয়া আনিবে। ভারতবর্ষীয় প্রাচীন জ্ঞানবিজ্ঞানের অধোগতির প্রধান কারণ এই ভিত্তির সংকীর্ণতা, ব্যাপ্তির অভাব, একাংশের সহিত অপরাংশের গুরুতর অসাম্য।

অথচ বাংলাভাষায় ইংরেজি-অনভিজ্ঞদের কাছে বিজ্ঞানপ্রচারের কোনো উপায় এ দেশে নাই। ইহা ব্যয়সাধ্য, চেষ্টাসাধ্য, ইহাতে আশু ফললাভের আশাও নাই—কোনো ব্যক্তিবিশেষের একান্ত উৎসাহ রক্ষার উপযোগী কোনো উত্তেজনা ইহাতে দেখা যায় না। ইহাতে অর্থনাশ ছাড়া অর্থাগমেরও ও সম্ভাবনা অল্প। বাংলাভাষায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনা করাও অনেক চিন্তা ও চেষ্টার কাজ—বিজ্ঞানের যাথাতথ্য রক্ষাপূর্বক তাকে জনসাধারণের বুদ্ধিগম্য করিয়া সরলভাষায় প্রকাশ করাও শক্ত।

অতএব যেমন করিয়াই দেখি সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশনের ন্যায় সামর্থ্যশালী বিশেষ সভার দ্বারাই এই কার্যসম্ভবপর বোধ হয়। ইংরেজিতে বিজ্ঞান শিখাইবার জন্য অনেক ইন্সকুল কলেজ আছে, তাহার গ্রন্থ ও আচার্যের অভাব নাই। এমন-কি, যাঁহারা ইংরেজিতে বিজ্ঞানশিক্ষা সমাধা করিতে চান তাঁহারা বিলাতে গিয়াও কৃতিত্ব লাভ করিতে পারেন। ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু এবং প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু নানা কারণে ইংরেজিশিক্ষায় বঞ্চিত আমাদের অধিকাংশ, আমাদের সর্বসাধারণ, আমাদের প্রকৃত দেশ সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশনের দ্বারাও উপেক্ষিত ; অথচ এমনই দৈব বিড়ম্বনা, সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশন সেই দেশের নামে অবহেলার অভিযোগ আনিয়াছেন।

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ বাংলার বৈজ্ঞানিক পরিভাষাসংকলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য নানা শাখায় বিভক্ত হওয়ায় কার্য যথোচিতরূপে অগ্রসর হইতেছে না। এই কার্যে সাহিত্যপরিষদের সহিত সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশনের যোগ দেওয়া কর্তব্য। বাংলায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রচার, সাময়িক পত্র প্রকাশ, স্থানে স্থানে যথানিয়মে বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা করা আবশ্যিক। নিজের উপযোগিতা উপকারিতা সর্বতোভাবে প্রমাণ করা আবশ্যিক। তবেই দেশের সহিত সভার দান-প্রতিদানের সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে, কেবলমাত্র বিলাপের দ্বারা তাহা হইতে পারে না। এমন-কি, রাজপ্রতিনিধির মধ্যস্থতা দ্বারাও বেশি কিছু হইবে না। রাজা সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশনের অর্থাগমের সুযোগ করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু তাহাকে সফল করিতে পারেন না।

যাহাই হোক, সায়াস অ্যাসোসিয়েশন যদি যথার্থ পথে কাজ করিতে অগ্রসর হন তবে তাঁহার ভৎসনা সহিতে আমরা প্রস্তুত আছি ; কিন্তু কাজও করিবেন না, চোখও রাঙাইবেন, দেশকে দূরে রাখিবেন অথচ সাহেবকে ডাকিয়া দেশের নামে নালিশ করিবেন, ইহার অপরূপ সৌন্দর্যটুকু আমরা দেখিতে পাই না।^১

১ তুলনীয় “বিজ্ঞান সভা”ঃ পরিশিষ্ট, রবীন্দ্র-রচনাবলী, বর্তমান খন্ড (প্রচলিত দ্বাদশ খণ্ড)

২

বর্তমানসংখ্যক ‘ভারতী’তে ‘ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ’ নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি যিনি লিখিয়াছেন, তিনি আধুনিক বাঙালি ইতিহাস-লেখকগণের শীর্ষস্থানীয়।^১ তাঁহার প্রস্তাবটির প্রতি পাঠকগণ মনোযোগ করিবেন।

ইতিহাসের সত্য মিথ্যা নির্ণয় করা বড়ো কঠিন। কথা সজীব পদার্থের মতো বাড়িয়া চলে; মুখে মুখে কালে কালে তাহার পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। সৃজনশক্তি মানুষের মনের স্বাভাবিক শক্তি—যে-কোনো ঘটনা, যে-কোনো কথা তাহার হস্তগত হয় তাহাকে সে অবিকৃত রাখিতে পারে না, কতকটা নিজের ছাঁচে ঢালিয়া তাহাকে গড়িয়া লয়। এইজন্য আমরা প্রত্যহই একটি ঘটনার নানা পাঠান্তর নানা লোকের নিকট পাইয়া থাকি।

কেহ কেহ এইরূপ প্রাত্যহিক ঘটনার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ইতিহাসের সত্যতা সম্বন্ধে আগাগোড়া সন্দেহ প্রকাশ করেন। কিন্তু একটি কথা তাঁহারা ভুলিয়া যান, ঐতিহাসিক ঘটনার জনশ্রুতি বহুতর লোকের মন হইতে প্রতিফলিত হইয়া আসে এবং সেই ঘটনার বিবরণে সাময়িক লোকের মনের ছাপ পড়িয়া যায়। তাহা হইতে ঘটনার বিশুদ্ধ সত্যতা আমরা না পাইতেও পারি কিন্তু তৎসাময়িক অনেক লোকের মনে তাহা কিরূপ প্রতিভাত হইয়াছিল সেটা পাওয়া যাইতে পারে।

অতীত সময়ের অবস্থা কেবল ঘটনার দ্বারা নির্ণয় হয় না, লোকের কাছে তাহা কিরূপ ঠেকিয়াছিল সেও একটা প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয়। অতএব ঐতিহাসিক ঘটনার জনশ্রুতিতে বাস্তব ঘটনার সহিত মানবমন মিশ্রিত হইয়া যে-পদার্থ উদ্ভূত হয় তাহাই ঐতিহাসিক সত্য। সেই সত্যের বিবরণই মানবের নিকট চিরন্তন কৌতুকাবহ এবং শিক্ষার বিষয়।

এই বিচিত্র জনশ্রুতি এবং জীর্ণ-উপকরণমূলক ইতিহাসে এমন অনেকটা অংশই থাকে যাহার প্রমাণ অপ্রমাণ ঐতিহাসিকের ব্যক্তিগত প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। দুই সাক্ষীর মধ্যে

কোন সাক্ষীকে বিশ্বাস করিব তাহা অনেক সময়ে কেবলমাত্র বিচারকের স্বভাব ও পূর্বসংস্কারের দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। ইংরেজ মিথ্যা বলে না, ইংরেজ জজ ইহা কতকটা স্বভাবত এবং কতকটা টানিয়াও বিশ্বাস করেন ; এই প্রবৃত্তি ও বিশ্বাস -বশত তাঁহারা অন্যদেশীয়দের প্রতি অনেক সময়ে অবিচার করিয়া থাকেন, তাহা ইংরেজ ব্যতীত আর-সকলেই অনুভব করিতে পারেন।

ইতিহাসে এইপ্রকার ব্যক্তিগত সংস্কারের লীলা যখন অবশ্যস্বাভাবী, তখন এই কথা সহজেই মনে উদয় হয়, আমরা ক্রমাগত বিদেশীয় ঐতিহাসিকের বিজাতীয় সংস্কারের দ্বারা গঠিত ইতিহাসপাঠে পীড়ন কেন সহ্য করিব। আমরা যে-ইতিহাস সংকলন করিব, তাহাও যে বিশুদ্ধ সত্য হইবে এ আশা করি না ; কিন্তু ইতিহাসের যে-অংশ প্রমাণ অপেক্ষা ঐতিহাসিকের মানসিক প্রকৃতির উপর বেশি নির্ভর করে, সে-অংশে আমাদের স্বজাতীয় প্রকৃতির সৃজনকর্তৃত্ব আমরা দেখিতে চাই।

তাহা ছাড়া ইতিহাস একতরফা না হইয়া দুইতরফা হইলে সত্যনির্ণয় সহজ হয়। বিদেশী ঐতিহাসিক এক ভাবে সাক্ষী সাজাইবেন এবং স্বদেশী ঐতিহাসিক অন্য ভাবে সাক্ষী সাজাইবেন, তাহাতে নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষের কাজের সুবিধা হয়।

যাহা হউক, বিদেশীলিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাসকে বিনা প্রশ্নে বিনা বিচারে গ্রহণ ও মুখস্থ করিয়া, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ফার্স্ট প্রাইজ পাওয়া আমাদের গৌরবের বিষয় হইতেছে না। কোনো ইতিহাসই কোনোকালে প্রশ্ন ও বিচারের অতীত হইতে পারে না। যুরোপীয় ইতিহাসেও ভূরি ভূরি চিরপ্রচলিত দৃঢ়নিবদ্ধ বিশ্বাস নব নব সমালোচনার দ্বারা তিরস্কৃত হইতেছে। আমাদের দেশীয় ইতিহাস হইতে মিথ্যা বাহিতে গেলে তাহার উজাড় হইবার সম্ভাবনা আশঙ্কা করি।

লেখকমহাশয় আমাদের দেশীয় ইতিহাস সমালোচন ও সংকলনের জন্য একটি ঐতিহাসিক সভা স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন।

১ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

আমাদের দেশে সভাস্থাপনের প্রতি আমাদের বড়ো-একটা বিশ্বাস নাই। লেখকমহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে আমাদের দেশের মাটিতে শিব গড়িতে গিয়া কিরূপ লজ্জা পাইতে হয়, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। সভা নামক বড়ো শিব গড়িতে গিয়া আরো কি বড়ো প্রহসনের সম্ভাবনা নাই।

যে দেশে কোনো-একটি বিশেষ বিষয়ে অনেকগুলি লেখকের সুদৃঢ় উৎসাহ আছে, সেই দেশে উৎসাহী লোকেরা একত্র হইয়া বৃহৎ কার্য সম্পন্ন করিতে পারেন। যে দেশে উৎসাহী লোক

স্বল্প সে দেশে সভা করিতে গেলে ঠিক বিপরীত ফল ফলিবার সম্ভাবনা। কারণ, সে সভায় অধিকাংশ বাজে লোক জুটিয়া উৎসাহী লোকের উদ্যম খর্ব করিয়া দেয় মাত্র। আমরা লেখকমহাশয় ও তাঁহার দুই-চারিজন সহযোগীর স্বতন্ত্র চেষ্টার প্রতিই লক্ষ করিয়া আছি। তাঁহারা নিজেদের উৎসাহের উদ্যমে ভুলিয়া যাইতেছেন যে, দেশের লোকের অধিকাংশের মনে এ-সকল বিষয়ে অকৃত্রিম অনুরাগ নাই। অতএব তাঁহারা প্রথমে নিজের রচনা ও দৃষ্টান্ত -দ্বারা দেশে ইতিহাসানুরাগ বিস্তার করিয়া দিলে যথাসময়ে সভাস্থাপনের সময় হইবে। সমবেত চেষ্টার জন্য উৎসাহী অনুরাগী লোকমাত্রেরই মন কাঁদে। মানুষ কাজ করিবার যন্ত্র নহে- অন্য পাঁচজন মানুষের সহিত মিশিয়া পাঁচজনের সহানুভূতি, সমাদর ও উৎসাহ -দ্বারা বললাভ প্রাণলাভ করিতে হয়; জনহীন শূন্য সভায় একা দাঁড়াইয়া কেবলমাত্র কর্তব্য করিয়া যাওয়া বড়ো কঠিন। কিন্তু বাংলাদেশে যাঁহারা কোনো মহৎ কার্যের ভার লইবেন, লোকসঙ্গ লোকসাহায্যের সুখ তাঁহাদের অদৃষ্টে নাই।

বিনা আড়ম্বরে বিনা ঘোষণায় ‘ঐতিহাসিক চিত্রাবলী’ নামক যে কয়েকটি মূল্যবান ইতিহাসগ্রন্থ বাংলায় বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহাই আমাদের বিপুল আশার কারণ। যাঁহারা “সিরাজদৌল্লা” গ্রন্থখানি পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, সভার দ্বারা তেমন কাজ হয় না প্রতিভার দ্বারা যেমন হয়।

প্রাইমারি শিক্ষা

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে বাংলার উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম বিভাগ-অনুসারে চাররকমের গ্রাম্য উপভাষা চালাইবার প্রস্তাব হইয়াছে এ কথা সকলেই জানেন।^১

এ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিবার, কাগজে পত্রে তাহা নানাপ্রকারে বলা হইয়া গেছে; কিন্তু দেশের উৎকর্ষা ঘুচিতেছে না। আমাদের পক্ষে যুক্তি আছে বলিয়া যে জয়ও আমাদের দিকে, তাহা আশা করা কঠিন।

আমরা দেখিয়াছি গবর্ণমেন্টের কোনো প্রস্তাবে আমরা সকলে মিলিয়া অত্যন্ত বেশি আপত্তি করিলে প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করিতে গবর্ণমেন্ট যেন আরো বেশি নারাজ হন।

ইহার অনেকগুলো কারণ আছে। প্রথমত, আমরা যেটাকে অনিষ্ট বলিয়া মনে করি, সরকারের শাসননীতির পক্ষে যে-কোনো কারণে সেইটেই যদি ইষ্ট হয়, তবে আমাদের তরফের সমস্ত যুক্তিগুলো তাঁহাদের সংকল্পকেই সবল করিবে।

দ্বিতীয়ত, সরকারের ভয় হয়, পাছে আমাদের দোহাই শুনিয়ে কোনো সংকল্প হইতে নিরস্ত হইলে প্রজার কাছে প্রতিপত্তি নষ্ট হয়।

তৃতীয়ত, প্রবল পক্ষকে তর্কে পরাস্ত করিবার চেষ্টা করিলে তাঁহাদের কতদূর পর্যন্ত যে আত্মবিস্মৃতি ঘটে, সম্প্রতি তাহার প্রমাণ পাইয়াছি।

অতএব আমরা সকলে মিলিয়া আপত্তি তুলিয়াছি বলিয়া সেটা যে আমাদের পক্ষে আশাপ্রদ হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না।

১ তুলনীয়- ‘সফলতার সদুপায়’ প্রসঙ্গ- গ্রন্থপরিচয়, প্রচলিত রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড (সুলভ দ্বিতীয়)

না তুলিলেই যে বিশেষ আশার কারণ হইত, তাহাও বলিতে পারি না। হতভাগ্যের পক্ষে কোন্টা যে সৎপথ, তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

তথাপি মোটের উপর, কমিটির প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইলে যে ভয়ের কারণ আছে, আমার তাহা মনে হয় না। সেইটুকুই আমাদের সান্ত্বনা।

ভাবিয়া দেখো-না, চাষার ছেলে প্রাইমারি স্কুলে কেন যায়। ভালো করিয়া চাষার কাজ শিখিতে যে যায়, তাহা নহে। গুরুমশায় যে তাহার ছেলেকে কৃষিবিদ্যার ওস্তাদ করিতে পারে, এ কথা শুনিলে সে হাসিয়া উড়াইয়া দিবে।

তার পরে, প্রাইমারি স্কুলে পড়িয়া তাহার ছেলে ডাক্তারও হইবে না, উকিলও হইবে না, কেরানিও হইবে না। প্রাইমারির পরে যদি তাহার ছাত্রবৃত্তি পড়ার শখ থাকে, তবে উপভাষা ছাড়িয়া আবার তাহাকে সাধুভাষা শিখিতে হইবে।

যাই হোক, যে-চাষা তাহার ছেলেকে প্রাইমারি স্কুলে পাঠায়, তাহার একটিমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, তাহার ছেলে নিতান্ত চাষা না থাকিয়া কিঞ্চিৎপরিমাণে ভদ্রসমাজ-ঘেঁষা হইবার যোগ্য হয় ; চিঠিটা পত্রটা লিখিতে পারে, পড়িতেও পারে, জমিদারের কাছারিতে দাঁড়াইয়া কতকটা ভদ্রছাঁদে মোজারি করিতে পারে, গ্রামের মোড়লি করিবার যোগ্য হয়, ভদ্রলোকের মুখে শুনিতে পায় যে, “তাই তো রে, তোর ছেলেটা তো বলিতে-কহিতে বেশ।”

চাষা একটু সম্পন্ন অবস্থার হইলেই ভদ্রসমাজের সীমানার দিকে অগ্রসর হইয়া বসিতে তাহার স্বভাবতই ইচ্ছা হয়। এমন-কি, তাহার ছেলে একদিন হাল-লাঙল ছাড়িয়া দিয়া বাবুর চালে চলিবে এ সাধও তাহার মনে উদয় হইতে থাকে। এইজন্য সময় নষ্ট করিয়াও, নিজের ক্ষতি করিয়াও ছেলেকে সে পাঠশালায় পাঠায় অথবা নিজের আঙিনায় পাঠশালার পত্তন করে।

কিন্তু চাষাকে যদি বলা হয়, তোর ছেলেকে তুই চাষার পাঠশালায় পাঠাইবি, ভদ্রের পাঠশালায় নয়, তবে তাহার উৎসাহের কারণ কিছুই থাকিবে না। এরূপ স্থলে ছেলেকে পাঠশালায় পাঠাইবার উদ্দেশ্যই তাহার পক্ষে ব্যর্থ হইবে।

শুধু তাই নয়। পল্লীর মধ্যে চাষার পাঠশালাটা চাষার পক্ষে একটা লজ্জার বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে। কালক্রমে ভাগ্যক্রমে যে-চাষাত্ব হইতে তাহারা উপরে উঠিবার আশা রাখে, সেইটাকে বিধিমত উপায়ে স্থায়ী করিবার আয়োজনে, আর যেই হউক চাষা খুশি হইবে না।

ওষুধ বলিতে যেমন তিক্ত বা ঝাঁঝালো কিছু মনে আসে, তেমনই শিক্ষা বলিতে চাষা এমন একটা কিছু বোঝে যাহা তাহার প্রতিদিনের ব্যাপার-সংক্রান্ত নহে। তাহার কাছে শিক্ষার গৌরবই তাই।

তাহার ছেলে যদি এত করিয়া পাঠশালে গিয়া তাহাদের অভ্যস্ত গ্রাম্যভাষা এবং তাঁহাদের নিজের ব্যবসায়ের সামান্য দুটো কথা শিখিতে বসে, তবে সে-শিক্ষার উপরে চাষার অশ্রদ্ধা হইবেই।

চাষা সাধুভাষা ব্যবহার করিতে পারে না সত্য, কিন্তু সাধুভাষা যে তাহার অপরিচিত তাহা নহে। যাত্রায়, গানে, গ্রন্থশ্রবণে নানারূপেই সাধুভাষা তাহার কানে পৌঁছিয়া থাকে, ভদ্রদের সঙ্গে কথা কহিবার সময় সেও যথাসাধ্য এই ভাষার মিশাল চালাইতে চেষ্টা করে।

তাহার ছেলেকে বিশেষ শিক্ষার দ্বারা যখন সেই ভদ্রভাষা ভুলাইবার চেষ্টা করা হইবে, তখন চাষা যে তাহা বুঝিবে না তাহা নহে, বুঝিয়া যে খুশি হইবে তাহাও বলিতে পারি না।

‘observer, thinker and experimenter’ কাহাকে বলে তাহা চাষা বুঝে না, কিন্তু ভদ্র এবং অভদ্র কাহাকে বলে তাহা সে বুঝে। অতএব যাহা কিছুই বুঝে না তাহার প্রলোভনে, যাহা বুঝে তাহার আশা প্রসন্ন মনে বিসর্জন দিবে, চাষা এতবড়ো চাষা নহে।

এই-সকল কারণে আশা করিতেছি, চাষার সদ্বুদ্ধি চাষাকে এবং দেশকে শিক্ষাকর্মিটির গুণ্ডবাণ হইতে রক্ষা করিবে।

পূর্বপ্রশ্নের ও অনুবৃত্তি

বৈশাখের ভাঙারে যে-প্রশ্ন^১ তোলা হইয়াছিল অর্থাৎ আমাদের দেশের পল্লিক উদ্যোগগুলির সঙ্গে দেশের প্রাকৃতসাধারণের যোগ রক্ষার উপায় কী- দেশের নানা বিশিষ্ট লোকের^২ কাছ হইতে তাহার উত্তর পাওয়া গেছে।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যাঁহারা লিখিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের দেশের আধুনিক উদ্যোগগুলির উপকারিতা সম্বন্ধে একমত নহেন, তবু মোটের উপর তাঁহাদের উত্তরগুলির মধ্যে কোনো অনৈক্য নাই।

তাঁহারা সকলেই এই কথা বলেন যে, প্রাকৃতসাধারণকে আমাদের পব্লিক উদ্যোগে আহ্বান করা এখন চলে না। আগে তাহাদের শিক্ষার ভালো বন্দোবস্ত করা চাই।

তাহার কারণ ইঁহারা বলিতেছেন, দেশ বলিতে কী বুঝায় তাহা দেশের সাধারণ লোকে বুঝে না, এবং দেশের হিত যে কেমন করিয়া করিতে হইবে তাহাও ইহাদের বুদ্ধিতে আসিবে না। অতএব, ইন্সকুল করিয়া এবং অন্য পাঁচরকম উপায়ে ইহাদের শিক্ষার গোড়াপত্তন করিয়া দেওয়া চাই।

কথাটা একটা বড়ো কথা, প্রথমে এ বিষয়ে সমাজে একটা মতের স্থিরতা হওয়া চাই, তার পরে কাজে লাগিতে হইবে। ভাণ্ডারের পরীক্ষায় এটা দাঁড়াইতেছে যে, মতের মিল হইয়াছে। কিন্তু কর্তব্যসম্বন্ধে মতের মিল হওয়া সহজ, উপায় সম্বন্ধে মিল হওয়াই কঠিন।

তবু কাজ আরম্ভ করিতে হইলে কাজের কথা পাড়িতেই হইবে, কোথায় কী বিঘ্ন আছে তাহা স্পষ্ট করিয়া ভাবিয়া না দেখিলে চলিবে না।

আমরা দেখিতেছি, গবর্নমেন্ট আমাদের দেশের প্রাকৃতসাধারণের শিক্ষার একটা বিশেষ বন্দোবস্ত করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। ইহাও দেখিতেছি, সেইসঙ্গে তাঁহারা ভারি একটা দ্বিধার মধ্যে পড়িয়া গেছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন, দেশের লোক রোগে এবং দুর্ভিক্ষে একেবারে অবাধে মারা পড়িতেছে। ইহাতে তাঁহাদের শাসনকার্যের একটা ভারি কঠিন সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। প্রজার অন্নবস্ত্র এবং প্রাণটা বাঁচানো কেবল যে প্রজার হিত তাহা নহে, তাহা রাজারও স্বার্থ।

কর্তারা মনে করিতেছেন, চাষারা যদি আর-একটু ভালো করিয়া চাষ করিতে শেখে এবং স্বাস্থ্য বাঁচাইয়া চলিবার উপদেশ পায়, যদি সাধারণ হিসাবপত্রটা লিখিয়া জমিদার ও মহাজনের অন্যায়ে প্রবঞ্চনার হাত এড়াইতে পারে, তবে তাহাতে দেশের যতটুকু শ্রীরক্ষা হইবে, তাহাতে প্রজার লাভ এবং রাজারও লাভ। অতএব গোড়ায় তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা চাই।

কিন্তু শিক্ষা-জিনিসটাকে একদিকে একবার শুরু করিয়া দিলে তার পরে তাহাকে গণ্ডি টানিয়া কমানো শক্ত। বিদেশী রাজার পক্ষে সেটা একটা বিষম ভাবনা। প্রজা বাঁচিয়া-বর্তিয়া থাকে, এটা তাঁহার একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু বাঁচার চেয়েও যদি বেশি অগ্রসর হইয়া পড়ে, তবে সেটা তাঁহার প্রয়োজনের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না।

এইজন্য প্রাইমারি শিক্ষার প্রস্তাবে কর্তৃপক্ষের নানারকম দুশ্চিন্তার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। তাঁহারা ভাবিতেছেন খাল কাটিয়া বেনো জল ঢোকানো কাজটা ভালো নয়- শিক্ষার সুযোগে আমাদের দেশের ভদ্রলোকের ঢেউটা যদি চাষার মধ্যে প্রবেশ করে, তবে সে একটা বিষম ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি করা হইবে।

১

প্রশ্নকর্তা

সুরেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়

২ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, হিরেন্দ্রনাথ দত্ত, আশুতোষ চৌধুরী, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, পৃথ্বীশচন্দ্র রায়, বিপিনচন্দ্র পাল-ভাণ্ডার, বৈশাখ ১৩১২

অতএব চাষাদের শিক্ষাকে এমন শিক্ষা করা চাই, যাহাতে মোটের উপর তাহারা চাষাই থাকিয়া যায়। তাহারা যেন কেবল গ্রামের ম্যাপটাই বোঝে; পৃথিবীর ম্যাপ চুলায় যাক, ভারতবর্ষের ম্যাপটাও তাহাদের বুঝিবার প্রয়োজন নাই। তা ছাড়া তাহাদের ভাষা শিক্ষাটা প্রাদেশিক উপভাষার বেড়া ডিঙাইয়া না যায়, সেটাও দেখা দরকার।

অতএব প্রথমেই দেখিতেছি, আমরা চাষাদের শিক্ষালাভ হইতে দেশের যে সুবিধাটা আশা করিতেছি, কর্তৃপক্ষ স্বভাবতই সেটাকে আনন্দের বিষয় বলিয়া মনে করিতে পারেন না।

আমাদের দেশহিতৈষীরা যদি মনে করেন, সরকারের কর্তব্য দেশের সাধারণ লোকদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং আমাদের কর্তব্য তৎসম্বন্ধে রেজোল্যুশন পাস করা, তবে এ কথাটা আমাদের মনে রাখিতেই হইবে যে, সরকারের হাতে শিক্ষার ভার দিলে সে-শিক্ষার দ্বারা তাঁহারা তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধনেরই চেষ্টা করিবেন, আমাদের উদ্দেশ্য দেখিবেন না। তাঁহারা চাষাকে গ্রামের চাষা রাখিবার জন্য ব্যবস্থা করিবেন, তাহাকে ভারতবর্ষের অধিবাসী করিয়া তুলিবার জন্য ব্যস্ত হইবেন না।

শিক্ষা যদি নিজের হাতে লই, তবেই নিজের মতলবমত শিক্ষা দিতে পারিব- ভিক্ষাও করিব, ফরমায়েশও দিব, এ কখনো হয় না। ইংরাজিতে একটি চলতি কথা আছে, দানের ঘোড়ার দাঁত পরীক্ষা করিয়া লওয়াটা শোভা পায় না।

আমাদের নিজের শিক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা নিজেরা করিব, এ কথা তুলিলেই আপত্তি এই উঠে যে, আমাদের পাঠশালার শিক্ষায় অল্পের সংজ্ঞান কেমন করিয়া হইবে। সরকার যদি এমন কথা বলেন, সরকারি বিধানের ছাঁচে বিদ্যালয় না বানাইলে সেখানকার উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে আমরা উমেদারির বেলা আমল দিব না, তবে আমরা কী উপায় করিব।

এই প্রশ্নের সদুত্তর অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। উত্তর দিবার পূর্বে প্রশ্নের বিষয়টাকে পরিষ্কার করিয়া সম্মুখে ধরা যাক।

প্রথম কথা- দেশের কাজে দেশকে যথার্থভাবে নিযুক্ত করিতে হইলে গোড়ায় সাধারণকে শিক্ষা দিতে হইবে।

দ্বিতীয় কথা- শিক্ষার যদি একটা প্রধান উদ্দেশ্য এই হয় যে, দেশের লোককে দেশের কাজে যোগ্য করা, তবে স্বভাবতই শিক্ষার প্রণালী সম্বন্ধে সরকারের সঙ্গে আমাদের মতের মিল হইবে না।

তৃতীয় কথা- যদি তাহা না হয় তবে পরের বাঁধা-চালে কতকগুলো বিদ্যালয় বানাইয়া বিদেশের শাসনে স্বদেশের সরস্বতীকে জিজির পরাইলে বিশেষ ফললাভ প্রত্যাশা করা চলিবে না। শিক্ষাপ্রণালীকে সকল প্রকারেই স্বদেশের মঙ্গলসাধনে উপযোগী করিবার জন্য দেশের বিদ্যালয়কে সরকারের শাসন হইতে মুক্তি দেওয়া দরকার।

শেষ কথা- তাহার বাধা এই যে, অল্পের দায়ে বিদ্যা সরকারের দ্বারে বাঁধা পড়িয়াছে। সে বন্ধন না কাটিলে বিদ্যাকে স্বাধীন করিব কী উপায়ে।

সত্য কথা বলিতে গেলে, বাধা যে শুধু এইমাত্র, তাহা নহে। দেশের যে-কোনো একটা মঙ্গলসাধনের ভার নিজের হাতে লইতে গেলে যে পরিমাণে ত্যাগস্বীকারের প্রয়োজন, আমরা যে ততদূর প্রস্তুত আছি, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু যদি-বা প্রস্তুত হই, তবে গোড়াতেই যে বিঘ্নটা আছে, সেটা ভাবিয়া দেখা দরকার। এ সম্বন্ধে যাঁহারা চিন্তা করেন ও চিন্তা করা উচিত বোধ করেন, তাঁহাদের কাছ হইতে ইহার বিচার প্রার্থনা করি। আমার একান্ত অনুরোধ এই যে, দেশকে ভালো করিয়া শিক্ষা দেওয়া উচিত, এই কথা বলিয়া ক্ষান্ত না হইয়া শিক্ষার কিরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে, দেশের হিতৈষিগণ ‘ভাঙারে’ তাহারই আলোচনা উপস্থিত করুন।

বিজ্ঞানসভা

স্বর্গগত মহাত্মা মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় গবর্নমেন্টের উৎসাহে ও দেশের লোকের আনুকূল্যে একটি বিজ্ঞানসভা স্থাপন করিয়া গেছেন।

দেশে বিজ্ঞানপ্রচারই এই সভার উদ্দেশ্য।

আমাদের দেশের লোকহিতকরী সভাগুলির মতো এ সভাটি নিঃস্ব নয়। ইহার নিজের চালচুলা আছে। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে, দেশে বিজ্ঞানচর্চার তেমন ভালোরকম সুযোগ জুটিতেছে না। প্রেসিডেন্সি কলেজে সম্প্রতি কিছু বন্দোবস্ত হইয়াছে, কিন্তু সেখানে আমরা

পরাদীন, তাহার 'পরে আমরা অধিক ভরসা রাখি না। আমাদের ছেলেদের যে বুদ্ধিশুদ্ধি কিছুই নাই, সেখান হইতে এমন খোঁটা খাইবার সম্ভাবনা আমাদের আছে।

বিজ্ঞানচর্চাসম্বন্ধে দেশের এমন দুরবস্থা অথচ এই বিদ্যাদুর্ভিক্ষের মাঝখানে বিজ্ঞানসভা তাঁহার পরিপুষ্ট ভাণ্ডারটি লইয়া দিব্য সুস্থভাবে বসিয়া আছেন।

সেখানকার হলে মাঝে মাঝে লেকচার হইয়া থাকে জানি- সেটা কলেজের লেকচারের মতো- তেমন লেকচারের জন্য কোনো বিশেষ বন্দোবস্তের বিশেষ প্রয়োজন নাই।

যাহা হউক, এটুকু নিঃসন্দেহ যে, বিজ্ঞানসভা নাম ধরিয়া একটা ব্যাপার এ দেশে বর্তমান এবং তাহার যন্ত্রতন্ত্র-অর্থসামর্থ্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে আছে।

আমাদের যাহা নাই, তাহার জন্য আমরা রাজদ্বারে ধন্য দিয়া পড়ি এবং চাঁদার খাতা লইয়া গলদঘর্ম হইয়া বেড়াই- কিন্তু যাহা আছে, তাহাকে কেমন করিয়া কাজে লাগাইতে হইবে, সে দিকে কি আমরা দৃষ্টিপাত করিব না। আমাদের অভাবের মাঝখানে এই যে বিজ্ঞানসভা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, ইহার কি ঘুম ভাঙাইবার সময় হয় নাই।

আমাদের দেশে অধ্যাপক জগদীশ, অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র দেশবিদেশে যশোলাভ করিয়াছেন, বিজ্ঞানসভা কি তাঁহাদিগকে কাজে লাগাইবার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করিতেছেন। দেশের বিজ্ঞানসভা দেশের বিজ্ঞানবীরদের মুখের দিকে তাকাইবেন না? ইহাতে কি তাঁহার লেশমাত্র গৌরব বা সার্থকতা আছে।

যদি জগদীশ ও প্রফুল্লচন্দ্রের শিক্ষাধীনে দেশের কয়েকটি অধ্যবসায়ী ছাত্রকে মানুষ করিয়া তুলিবার ভার বিজ্ঞানসভা গ্রহণ করেন, তবে সভা এবং দেশ উভয়েই ধন্য হইবেন।

স্বদেশে বিজ্ঞান প্রচার করিবার দ্বিতীয় সদুপায়, স্বদেশের ভাষায় বিজ্ঞান প্রচার করা। যতদিন পর্যন্ত না বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের বই বাহির হইতে থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত বাংলাদেশের মাটির মধ্যে বিজ্ঞানের শিকড় প্রবেশ করিতে পারিবে না।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় প্রভৃতি কয়েকজন বিজ্ঞানপণ্ডিত, দেশের ভাষায় দেশের লোকের কাছে বিজ্ঞানের পরিচয় দিতে উদ্যত হইয়াছেন। বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে সেজন্য তাঁহাদের নাম থাকিয়া যাইবে। কিন্তু বিজ্ঞানসভা কী করিলেন।

দেশের প্রতিভাবান্ ব্যক্তিদিগকে ও সুযোগ্য অনুসন্ধিৎসুদিগকে বিজ্ঞানচর্চার সুযোগ দান করা, ও দেশের ভাষায় সর্বসাধারণের পক্ষে বিজ্ঞানশিক্ষাকে সুগম করিয়া দেওয়া, বিজ্ঞান

প্রচারের উদ্দেশে বিজ্ঞানসভার এই দুটি মস্ত কাজ আছে; ইহার মধ্যে কোনোটাই তিনি করিতেছেন না।

কেহ যেন না মনে করেন যে, আমি বিজ্ঞানসভার সম্পাদক প্রভৃতিকে এজন্য দায়ী করিতেছি। মন্দিরে প্রদীপ জ্বলাইয়া রাখিবার ভার তাঁহাদের উপরে আছে মাত্র। কিন্তু সভা যে আমাদের সকলের। ইহা যদি সমস্ত আয়োজন উপকরণ লইয়া নিষ্ফল

হইয়া পড়িয়া থাকে, তবে সেজন্য আমরা প্রত্যেকেই দায়ী। ইহাকে কাজে লাগাইবার কর্তা আমরা সকলেই, কোনো ব্যক্তিবিশেষ নহে।

আমরা স্বকীয় শাসনের অধিকার লইবার জন্য রাজদ্বারে প্রার্থনা করিতেছি। কিন্তু বিজ্ঞানসভার ৬৪৬ মতো ব্যাপারগুলি দেশের জমি জুড়িয়া নিষ্ফল হইয়া পড়িয়া থাকিলে প্রতিদিন প্রমাণ হইতে থাকে যে, আমরা স্বকীয় শাসনের অধিকারী নহি। কারণ, যে অধিকার আমাদের হস্তে আছে তাহাকে যদি ব্যর্থ করি, তবে যাহা নাই তাহাকে পাইলেই যে আমরা চতুর্ভুজ হইয়া উঠিব এ কথা স্বীকার করা যায় না।

এই কারণে বিজ্ঞানসভার মতো কর্মশূন্য সভা আমাদের জাতির পক্ষে লজ্জার বিষয়। ইহা আমাদের জাতির পক্ষে নিত্য কুদৃষ্টান্ত ও নিরুৎসাহের কারণ।

আমার প্রস্তাব এই যে, বিজ্ঞানসভা যখন আমাদের দেশের জিনিস, তখন ইহাকে হাতে লইয়া ইহার দ্বারা যতদূর পর্যন্ত সম্ভব দেশের কাজ করাইয়া, স্বজাতির অন্তত একটা জড়তা ও হীনতার প্রত্যক্ষ প্রমাণকে দূর করিয়া দিতে যেন কিছুমাত্র বিলম্ব না করি।^১

ইতিহাসকথা

আমাদের দেশে লোকশিক্ষা দিবার যে দুটি সহজ উপায় অনেকদিন হইতে প্রচলিত আছে, তাহা যাত্রা এবং কথকতা। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে প্রকৃতির মধ্যে কোনো শিক্ষাকে বদ্ধমূল করিয়া দিবার পক্ষে এমন সুন্দর উপায় আর নাই।

আজকাল শিক্ষার বিষয় বৈচিত্র্যলাভ করিয়াছে— একমাত্র পুরাণকথার ভিতর দিয়া সকল প্রকার উপদেশ চালানো যায় না। অথচ শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত দলের মধ্যে ভেদ যদি যথাসম্ভব লোপ করিয়া দেওয়াই শ্রেয় হয়, তবে যাহারা শিক্ষা হইতে বঞ্চিত তাহাদের মধ্যে এমন অনেক জ্ঞান প্রচার করা আবশ্যিক যাহা লাভ করিবার উপায় তাহাদের নাই।

একেবারে গোড়াগুড়ি ইস্কুলে পড়িয়া সেই-সকল জ্ঞানলাভের প্রত্যাশা করা দুরাশা। সাধারণ লোকের ভাগ্যে ইস্কুলে পড়ার সুযোগ তেমন করিয়া কখনোই ঘটবে না। তা ছাড়া ইস্কুলে-পড়া জ্ঞান প্রকৃতির মধ্যে যথেষ্ট গভীরভাবে প্রবেশ করে না।

ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিলে আমাদের দেশে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে যে জ্ঞানের বৈষম্য সব চেয়ে বেশি করিয়া অনুভব করা যায়, তাহা ইতিহাসজ্ঞান। স্বদেশে ও বিদেশে মানুষ কি করিয়া বড়ো হইয়াছে, প্রবল হইয়াছে, দল বাঁধিয়াছে, যাহা শ্রেয় জ্ঞান করিয়াছে তাহা কী করিয়া পাইয়াছে, পাইয়া কি করিয়া রক্ষা করিয়াছে, সাধারণ লোকের এ-সমস্ত ধারণা না থাকাতে তাহারা শিক্ষিতলোকের অনেক ভাবনা-চিন্তার কোনো অর্থ খুঁজিয়া পাইতেছে না এবং তাহাদের কাজকর্মে যোগ দিতে পারিতেছে না। পৃথিবীতে মানুষ কী করিয়াছে ও কী করিতে পারে, তাহা না জানা মানুষের পক্ষে শোচনীয় অজ্ঞতা।

কথা এবং যাত্রার সাহায্যে জনসাধারণকে ইস্কুলে না পড়াইয়াও ইতিহাস শেখানো যাইতে পারে। এমন-কি, সামান্য ইস্কুলে যতটুকু শিক্ষা দেওয়া সম্ভব, তার চেয়ে অনেক ভালো করিয়াই শেখানো যাইতে পারে।

আজকাল যুরোপে ঐতিহাসিক উপন্যাস ও নাটক ইতিহাসশিক্ষার প্রকৃষ্ট উপকরণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ইতিহাসকে কেবল জ্ঞানে নহে, কল্পনার দ্বারা গ্রহণ করিলে তবেই তাহাকে যথার্থভাবে পাওয়া যায়- এ কথা সকলেই স্বীকার করেন।

সেই কল্পনার সাহায্যে সরলভাবে জ্ঞানদানের প্রণালী, জ্ঞানের বিষয়কে হৃদয়ের সামগ্রী করিয়া তুলিবার উপায় আমাদের দেশে অনেকদিন হইতেই চলিত আছে- যুরোপ আজ সেইরূপ সরস উপায়ের দিকে ঝোঁক দিয়াছে, আর আমরাই কি আমাদের জ্ঞানপ্রচারের স্বাভাবিক পথগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া কল্পনালোকবর্জিত ইস্কুলশিক্ষার শরণ লইব।

১ তুলনীয় প্রসঙ্গকথা (১)-রবীন্দ্র-রচনাবলী, বর্তমান খণ্ড (প্রচলিত দ্বাদশ খণ্ড)

আমার প্রস্তাব এই যে, ইতিহাসকে কথা ও যাত্রার আকারে স্থান ও কালের উজ্জ্বল বর্ণনার দ্বারা সজীব সরস করিয়া দেশের সর্বত্র প্রচার করিবার উপায় অবলম্বন করা হউক। আমরা আজকাল কেবল মাসিক কাগজে ও ছাপানো গ্রন্থে সাহিত্যপ্রচারের চেষ্টা করিয়া থাকি- কিন্তু যদি কোনো কথা বা যাত্রার দল ইতিহাস ও সাহিত্য দেশের সর্বত্র প্রচার করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করেন, তবে প্রচুর সার্থকতা লাভ করিবেন। আজকালকার দিনে কেবলমাত্র পৌরাণিক

যাত্রা ও কথা আমাদের সম্পূর্ণ উপযোগী নহে। ইতিহাস, এমন-কি, কাল্পনিক আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া আমাদের লোকশিক্ষা বিধান করিতে হইবে।

যদি বিদ্যাসুন্দরের গল্প আমাদের দেশে যাত্রায় প্রচলিত হইতে পারে, তবে পৃথ্বীরাজ, গুরুগোবিন্দ, শিবাজি, আকবর প্রভৃতির কথাই বা লোকের মনোরঞ্জন না করিবে কেন। এমন-কি, আনন্দমঠ রাজসিংহ প্রভৃতির ন্যায় উপন্যাসই বা সুগায়ক কথকের মুখে পরম উপাদেয় না হইবে কেন।

স্বাধীন শিক্ষা

দেশের শিক্ষাকে বিদেশী রাজার অধীনতা হইতে মুক্তি দিবার জন্য কী উপায় করা যাইতে পারে, এই প্রশ্ন ‘ভাঙারে’ উঠিয়াছে।

যতদিন বিদ্যালয়ের উপাধিলাভের উপরে অনলাভ নির্ভর করিবে, ততদিন মুক্তির আশা করা যায় না এই কথাই সকলে বলিতেছেন।

কিন্তু কথাটা কেবল উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধেই খাটে, তাহা আমাদের মনে রাখিতে হইবে। পাড়াগাঁয়ে প্রাকৃতগণ যে শিক্ষালাভের জন্য ছেলেকে পাঠশালায় পাঠায়, সে শিক্ষার দ্বারা গবর্নমেন্টের চাকরি কেহ প্রত্যাশা করে না।

আমাদের দেশে এই পাঠশালা চিরকাল স্বাধীন ছিল। আজও এই-সকল পাঠশালার অধিকাংশ ব্যয় দেশের লোক বহন করে; কেবল তাহার উপর আর সামান্য দুই-চার-আনার লোভে এই আমাদের নিতান্তই দেশীয় ব্যবস্থা পরের হাতে আপনাকে বিকাইয়াছে।

এই প্রাথমিক পাঠশালার চেয়ে উপর পর্যন্ত উঠে অথচ কলেজ পর্যন্ত পৌঁছে না এমন একদল ছাত্র আছে, সাধারণত ইহারাও সরকারি চাকরির দাবি করিতে পারে না। ইহারা অনেকেই সদাগরের আপিসে, জমিদারের সেরেস্তায়, ধনিগৃহের দপ্তরখানায়, গৃহস্থের বাজার-সরকার প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করে।

কিন্তু দেশে ইহাদের শিক্ষার তেমন ভালো ব্যবস্থা নাই। পূর্বে ছাত্রবৃত্তি স্কুল ইহাদের কতকটা উপযোগী ছিল। কিন্তু মাইনর স্কুল এখন ছাত্রবৃত্তিকে প্রায় চাপিয়া মারিল। ইংরেজি শিক্ষাই যে-সব স্কুলের প্রধান লক্ষ্য এবং কলেজই যাহার গম্য স্থান, সে-সকল স্কুলে কিছুদূর পর্যন্ত পড়িয়া পড়াশুনা ছাড়িয়া দিলে না বাংলা না ইংরেজী না কিছুই শেখা হয়।

অতএব যাহারা পাঠশালা পর্যন্ত পড়ে এবং যাহারা নানাপ্রকার অভাব ও অসুবিধা বশত তাহার চেয়ে আর-কিছুদূর মাত্র পড়িবার আশা করিতে পারে, দেশ তাহাদের শিক্ষার ভার নিজের হাতে লইলে বাধার কারণ তো কিছুই দেখা যায় না।

গুণতি করিয়া দেখিলে কলেজে পাস-করা ছাত্রদের চেয়ে ইহাদের সংখ্যা অনেক বেশি হইবে। এই বহুবিস্তৃত নিম্নতন শ্রেণীর শিক্ষা আমরা যদি উপযুক্তভাবে দিতে পারি, তবে দেশের শ্রী ফিরিয়া যায় সন্দেহ নাই।

ইহাদের শিক্ষা গোড়া হইতে এমনভাবে দিতে হইবে যাহাতে লোকহিত কাহাকে বলে তাহা ইহারা ভালো করিয়া জানিতে এবং জীবিকা উপার্জনের জন্য হাতে-কলমে সকল রকমে তৈরি হইয়া উঠিতে পারে। পাঠশালায় শিশুবয়সে যে-সকল ভাব, জ্ঞান ও অভ্যাস সঞ্চার করিয়া দেওয়া যায়, বড়োবয়সে বজ্রতার দ্বারা তাহা কখনোই সম্ভবপর হয় না।

যাই হোক, উচ্চশিক্ষায় দেশের লোকের পক্ষে গবর্মেণ্টের প্রতিযোগিতা করিবার যে-সকল বাধা আছে নিম্নশিক্ষায় তাহা নাই।

কিন্তু এতবড়ো দেশব্যাপী কাজের ভার আমাদের কাছে নিজের হাতে গ্রহণ করিতে হইবে, এ কথা বলিলেই বিজ্ঞ ব্যক্তির হতাশ হইয়া পড়েন। অথচ তাঁহারা ইহাও জানেন, এ কাজ সরকারের হাতে দিলে কিভারগার্টেনের ধুয়া ধরিয়া নিতান্ত ছেলেখেলা হইতে থাকিবে এবং লাভের মধ্যে ম্যাকমিলন কোম্পানির উদরপূরণ হইবে। কিছু না-হউক, এ শিক্ষা আমরা যেমন চাই তেমন হইবে না, বরঞ্চ কতক অংশে বিপরীত হইবে।

অন্যত্র ইহা তো দেখিয়াছি দয়ানন্দের দল আপন সম্প্রদায়ের জন্য স্বচেষ্ঠায় বিদ্যালয় স্থাপন করিতেছে। আমাদের দেশেও এইরূপ চেষ্ঠা কী করিলে সাধ্য হইতে পারে এবং এই-সকল নিম্নতন বিদ্যালয়গুলিতে কী কী বিষয় কী নিয়মে শিক্ষা দিতে হইবে, সুধীগণ ‘ভাণ্ডার’ পত্রে তাহার আলোচনা করিলে সম্পাদক কৃতার্থ হইবেন।

শিক্ষার আন্দোলনের ভূমিকা

সমাজকে বিদ্যা শিখাইবার জন্য আমাদের দেশ কোনোদিন স্বদেশী বা বিদেশী রাজার আইনের বাঁধনে ধরা দেয় নাই। নিজের শিক্ষার ব্যবস্থা সমাজের লোক নিজেরাই করিয়াছে। সেই শিক্ষার ব্যবস্থা বলিতে যে কেবল টোল এবং পাঠশালাই বুঝাইত তাহা নহে, পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় এই ভারতবর্ষেই স্থাপিত হইয়াছিল। প্রাচীন ভারতে নালন্দা এবং

তক্ষশিলায় যে বিদ্যায়তন ছিল, তেমন বৃহৎ ব্যাপার এখনো কোথাও আছে কি না সন্দেহ। মিথিলা কাশী নবদ্বীপে ভারতের প্রাচীন বিদ্যার বিশ্ববিদ্যালয় রাজসাহায্য ব্যতিরেকেই চিরদিন চলিয়াছে।

বর্তমানকালে নানা কারণে শিক্ষালাভের জন্য আমাদেরকে বহুল পরিমাণে রাজার অধীনতা স্বীকার করিতে হইয়াছে। ইহাতে আমাদের যথোচিত শিক্ষালাভের কী পরিমাণ ব্যাঘাত ঘটিতেছে, তাহা আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু সমাজ আত্মহিতসাধনের শক্তি হইতে যে প্রত্যহ ভ্রষ্ট হইতেছে, ইহাই আমি সর্বাপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় বলিয়া জ্ঞান করি। আমাদের যে-পাঠশালা যে-টোল অনায়াসে স্বদেশের মাটি হইতে রস আকর্ষণ করিয়া দেশকে চিরদিন ফলদান করিয়া আসিয়াছে, সেই আমাদের স্বকীয় পাঠশালা ও টোলগুলিও ক্রমশই রাজার গলগ্রহ হইয়া উঠিয়া আত্মপোষণের স্বাধীন শক্তি হারাইতেছে। মোগলসাম্রাজ্যসূর্য যখন অস্তমিত হইল, তখন সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিদ্যার ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয় নাই। স্বভাবের নিয়মে একদিন ইংরেজকেও নিশ্চয় এ দেশ হইতে বিদায় হইতে হইবে, তখন তাঁহাদের অন্তর্জীবী টোল-পাঠশালাগুলি ভিক্ষান্নের জন্য আবার কাহার দ্বারে হাত পাতিতে যাইবে।

শক্তিলাভই সকল লাভের শ্রেষ্ঠ; কারণ, তাহা কেবলমাত্র খাদ্যলাভ নহে, তাহাই মনুষ্যত্বলাভ। নিজের হিতসাধনের শক্তি যখন অভ্যাসের অভাবে, সুযোগের অভাবে, সামর্থ্যের অভাবে সমাজ হারাইতে বসে তখন সে ক্ষতি কোনোপ্রকার বাহ্য সমৃদ্ধির দ্বারা পূরণ করা যায় না। দেশে কতখানি রেল পাতা হইয়াছে, টেলিগ্রাফের তার বসানো হইয়াছে, কলের চিমনি উঠিয়াছে, তাহা লইয়া দেশের গৌরব নহে। সেই রেল সেই তার সেই চিমনির সঙ্গে দেশের শক্তির কতটুকু সম্বন্ধ তাহাই বিচার্য। ইংরেজের আমলে ভারতবর্ষে আজ যতগুলি ব্যাপার চলিতেছে, তাহার ফল আমরা যেমনই ভোগ করি-না কেন, সেই চালনায় আমাদের স্বকীয় অধিকার কতই যৎসামান্য। সুতরাং ইহার অধিকাংশই আমাদের পক্ষে স্বপ্নমাত্র; যখনই জাগ্রত হইব তখনই সমস্ত বিলুপ্ত হইবে।

কিন্তু আমাদের বর্তমান অবস্থায় দেশের সকল কর্ম করিবার স্বাধীনতা দেশের লোকের থাকিতে পারে না। বিদেশী রাজার কর্তৃত্ব স্বভাবতই কতকগুলি বিষয়ে আমাদের শক্তিকে সংকীর্ণ করিবেই। ইংরেজ আমাদের অস্ত্র হরণ করিয়াছে, সুতরাং অস্ত্রপ্রয়োগ করিবার অভ্যাস ও শক্তি ভারতবর্ষের লোককে হারাইতে হইতেছে। বিদেশী আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা

করিবার শক্তি ইংরেজ এ দেশের লোকের হাতে রাখিবে না। এমন আরো অনেকগুলি শক্তি আছে যাহার উৎকর্ষসাধনে ইংরেজ স্বভাবতই আমাদের সাহায্য করিবে না, বরঞ্চ বাধা দিবে।

তথাপি, স্বদেশের মঙ্গলসাধন করিবার স্বাধীনতা আমাদের হাত হইতে সম্পূর্ণ হরণ করা কাহারও সাধ্য নাই। যে যে স্থানে আমাদের সেই স্বাধীনতার ক্ষেত্র আছে, সেই-সকল স্থানেও আমরা যদি জড়ত্ববশত বা ত্যাগ ও কষ্ট-স্বীকারে অনিচ্ছাবশত নিজের স্বাধীনশক্তিকে প্রতিষ্ঠিত না করি, এমন-কি, আমাদের বিধিদত্ত স্বাভাব্যকে গায়ে পড়িয়া পরের হাতে সমর্পণ করি, তবে দেবে-মানবে কোনোদিন কেহ আমাদেরকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

এই কথা লইয়া বাংলাদেশে কিছুদিন আলোচনা চলিতেছিল- এমন-কি, দেশের বিদ্যাশিক্ষাকে স্বাধীনতা দিবার চেষ্টা কেহ কেহ নিজের সাধ্যমত সামান্যভাবে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই আলোচনা এবং সেই চেষ্টা সম্বন্ধে সাধারণের মনের ভাব ও আনুকূল্য কিরূপ ছিল, তাহা কাহারও অগোচর নাই।

ইতিমধ্যে বঙ্গবিভাগ লইয়া একটা আন্দোলনের ঝড় উঠিল। রাগের মাথায় অনেকে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যে-পর্যন্ত না পার্টিশন রহিত হইবে সে-পর্যন্ত তাঁহারা বিলাতি দ্রব্য কেনা রহিত করিবেন। সে সময়ে কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, পরের উপরে রাগ করিয়া নিজের হিত করিবার চেষ্টা স্থায়ী হয় না, আমরা পরাধীনজাতির মজ্জাগত দুর্বলতাবশত মুঞ্চভাবে বিলাতি জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছি, যদি মোহপাশ বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বদেশীবস্তুর অভিমুখে ফিরিতে পারি তবে স্বদেশ একটি নূতন শক্তি লাভ করিবে। যে-সকল দ্রব্য ত্যাগ করিব, তাহা অপেক্ষা যে-শক্তিলাভ করিব তাহার মূল্য অনেক বেশি। এক শক্তি আর-এক শক্তিকে আকর্ষণ করে-বলিষ্ঠভাবে ত্যাগ করিবার শক্তি বলিষ্ঠভাবে অর্জন করিবার শক্তিকে আকর্ষণ করিয়া আনে। এ-সকল কথা যদি সত্য হয়, তবে পার্টিশনের সঙ্গে বিদেশীবর্জনকে জড়িত করা শ্রেয় নহে। মনে আছে, এই আলোচনাও তখন অনেকের পক্ষে বিরক্তির কারণ হইয়াছিল।

তাহার পরে মফস্বল বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদের প্রতি কর্তৃপক্ষ এক ন্যায়বিগর্হিত সুবুদ্ধিবিবর্জিত সার্কুলার জারি করিলেন। তখন ছাত্রমণ্ডলী হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া পণ করিতে বসিলেন যে, আমরা বর্তমান যুনিভার্সিটিকে ‘বয়কট’ করিব; আমরা এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিব না, আমাদের জন্য অন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হউক।

অবশ্য এ কথা আমরা অনেকদিন হইতে বলিয়া আসিতেছি যে, দেশের বিদ্যালয় সম্পূর্ণ দেশীয়েদের আয়ত্তাধীন হওয়া উচিত। গম্ভীরভাবে দৃঢ়ভাবে সেই ঐচ্ছিক বুঝিয়া দেশের শিক্ষাকে

স্বাধীন করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়া দরকার। কিন্তু এই চেষ্টা যদি কোনো সাময়িক উত্তেজনা বা ক্ষণিক রাগারাগির দ্বারা প্রবর্তিত হয়, তবে নিশ্চিত হওয়া যায় না।

অনেক সময় প্রবর্তক কারণ নিতান্ত তুচ্ছ এবং সাময়িক হইলেও তাহার ফল বৃহৎ ও স্থায়ী হইয়া থাকে। জগতের ইতিহাসে অনেক বিশাল ব্যাপারের প্রারম্ভ দীর্ঘ কাল ধরিয়া একটা আকস্মিক ক্ষণিক আঘাতের অপেক্ষা করিয়া থাকে ইহা দেখা গেছে। শিক্ষা সম্বন্ধে ও অন্যান্য নানা অভাবের প্রতিকার সম্বন্ধে এ দেশের স্বাধীন শক্তি ও স্বাধীন চেষ্টার উদ্‌বোধন সম্ভবত বর্তমান আন্দোলনের প্রতীক্ষায় ছিল, অতএব এই উপলক্ষকে অবজ্ঞা করিতে পারা যায় না।

তথাপি, স্থায়ী মঙ্গল যে উদ্যোগের লক্ষ্য, আকস্মিক উৎপাতকে সে আপনার সহায় করিতে আশঙ্কা বোধ না করিয়া থাকিতে পারে না। যে দেশ আপনার প্রাণগত অভাব অনুভব করিয়া কোনো ত্যাগসাধ্য ক্লেশসাধ্য মঙ্গল-অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে পারে নাই, পরের প্রতি রাগ করিয়া আজ সেই দেশ যে স্থায়ীভাবে কোনো দুষ্কর তপশ্চরণে নিযুক্ত হইবে, এরূপ শ্রদ্ধা রক্ষা করা বড়োই কঠিন। রাগারাগির স্তীম চিরদিন জ্বালাইয়া রাখিবে কে এবং রাখিলেই বা মঙ্গল কী। গ্যাস ফুরাইলেই যদি বেলুন মাটিতে আছাড় খাইয়া পড়ে, তবে সেই বেলুনে বাস্তুবাড়ি স্থাপনের আশা করা চলে না।

আজ যাঁহারা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিতেছেন, আমাদের এখনই আস্ত একটি বিশ্ববিদ্যালয় চাই, কালই সেখানে পরীক্ষা দিতে যাইব, তাঁহাদিগকে দেশীয় বিদ্যালয়প্রতিষ্ঠার স্থায়ী সহায় বলিয়া মনে করিতে সাহস হয় না। এমন-কি, তাঁহারা ইহার বিঘ্নস্বরূপ হইতেও পারেন।

কারণ, তাঁহারা স্বভাবতই অসহিষ্ণু অবস্থায় রহিয়াছেন। তাঁহারা কোনোমতেই ধৈর্য ধরিতে পারিতেছেন না। প্রবলক্ষমতামালা পক্ষের প্রতি রাগ করিয়া যখন মনে জেদ জন্মে, তখন অতি সত্বর যে অসাধ্য সাধন করিবার ইচ্ছা হয় তাহা ইন্দ্রজালের দ্বারাই সম্ভব। সেই ইন্দ্রজাল ক্ষণকালের জন্য একটা বৃহৎ বিভ্রম বিস্তার করে মাত্র, তাহার উপর নির্ভর করা যায় না।

কিন্তু মায়ার ভরসা ছাড়িয়া দিয়া যদি যথার্থ কাজের প্রত্যাশা করা যায়, তবে ধৈর্য ধরিতেই হইবে। ভিত্তি হইতে আরম্ভ করিতে হইবে, ছোটো হইতে বড়ো করিতে হইবে। অনিবার্য বিলম্বকর হইলেও কাজের নিয়মকে স্বীকার করিতেই হইবে।

ছোটো আরম্ভের প্রতি ধৈর্য রক্ষা করা যথার্থ প্রীতির লক্ষণ। সেইজন্য শিশুকে মানুষ করিয়া তুলিতে পিতৃমাতৃস্নেহের প্রয়োজন হয়। যথার্থ স্বদেশপ্রীতি প্রবর্তনায় যখন আমরা কোনো কাজ

আরম্ভ করি, তখন ক্ষুদ্র আরম্ভের প্রতিও আমরা অন্তরের সমস্ত স্নেহ ঢালিয়া দিতে পারি। তখন কেবলই এই ভয় হইতে থাকে, পাছে অতিরিক্ত প্রলোভনের তাগিদে তাড়াহুড়া করিয়া সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়।

কিন্তু বিপক্ষপক্ষের প্রতি স্পর্ধা করিয়া যখন আমরা কোনো উদ্যোগে প্রবৃত্ত হই তখন আমাদের বিলম্ব হয় না। তখন আমরা এক মুহূর্তেই শেষকে দেখিতে চাই, আরম্ভকে দুই চক্ষে দেখিতে পারি না। সেইজন্য আরম্ভকে আমরা কেবলই বার বার আঘাত করিতে থাকি।

দেশীয় বিদ্যালয়প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে প্রথম হইতেই আমাদের এই-যে আঘাতকর অধৈর্যের লক্ষণ দেখা যাইতেছে, ইহাই আমাদের আশঙ্কার বিষয়। কাজের সূত্রপাত হইতেই আমরা বিবাদ শুরু করিয়াছি। আমাদের যাঁহার যতটুকু মনের-মতো না হইতেছে, যাঁহার যে পরিমাণ কল্পনাবৃত্তি অপরিতৃপ্ত থাকিতেছে, তিনি তাহার চতুর্গুণ আক্রোশের সহিত এই উদ্যোগকে আঘাত করিতেছেন। এ কথা বলিতেছেন না, "আচ্ছা, হউক, পাঁচজনে মিলিয়া কাজটা আরম্ভ হউক ; কোনো জিনিস যে আরম্ভেই একেবারে নিখুঁতসুন্দর এবং সর্ববাদিসম্মত হইয়া উঠিবে, এরূপ আশা করা যায় না; কিন্তু এমন কোনো ব্যাপারকে যদি খাড়া করিয়া তোলা যায় যাহা চিরদিনের মতো জাতীয় সম্বল হইয়া উঠে, তবে সমস্ত জাতির সুবুদ্ধি নিশ্চয়ই ক্রমে ক্রমে তাহাকে নিজের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া তুলিবে।"

বাংলাদেশে স্বদেশী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য যে-সকল সভা-সমিতি বসিয়াছে, তাহার মধ্যে নানা মতের, নানা বয়সের, নানা দলের লোক সমবেত হইয়াছেন। ইঁহারা সকলে মিলিয়া যাহা-কিছু স্থির করিতেছেন, তাহা ইঁহাদের প্রত্যেকেরই সম্পূর্ণ মনঃপূত হইতে পারে না। এই-সকল সমিতির সঙ্গে বর্তমান লেখকেরও যোগ ছিল। প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের যে শিক্ষাপ্রণালী ও নিয়ম নির্ধারিত হইয়াছে, লেখকের যদি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিত তবে ঠিক সেরূপ হইত না সন্দেহ নাই ; কিন্তু তাহা লইয়া লেখক বিবাদ করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি কাজ আরম্ভ হওয়াকেই সকলের চেয়ে বেশি মনে করেন। যদি তাঁহার মনোমত প্রণালীই বাস্তবিক সর্বোৎকৃষ্ট হয়, তবে কাজ আরম্ভ হইলে পর সে প্রণালীর প্রবর্তন যথাকালে সম্ভবপর হইবে, এ ধৈর্য তাঁহাকে রক্ষা করিতেই হইবে।

সাধারণের সম্মানভাজন শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের আদর্শরচনাসমিতির সভাপতি ছিলেন। তিনি যেরূপ চিন্তা, শ্রম ও বিচক্ষণতা সহকারে আদর্শরচনা কার্যে সহায়তা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেই

হইবে। সর্ববিষয়ে তাঁহারসহিত মতের মিল বা না হউক, তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হইতে অন্তত আমার তো কোনো আপত্তি নাই।

কারণ, কাজের বেলা একজনকেই মানিতেই হইবে। পাঠশালায় ডিবেটিং ক্লাবকে সর্বত্র বিস্তার করা চলে না। সকলে মিলিয়া বাদবিতণ্ডা এবং পরস্পরের প্রত্যেক কথার অন্তহীন সমালোচনা, এ কেবল সেইপ্রকার বৈঠকেই শোভা পায় যাহার পরিণাম কেবল তর্ক। আমাদের তর্কের দিন যদি গিয়া থাকে, আমাদের কাজের সময় উপস্থিত হইয়া থাকে তবে প্রত্যেকেই প্রধান হইবার চেষ্টা না করিয়া বিনয়ের সহিত একজনের নায়কতা স্বীকার করিতেই হইবে।

শিক্ষাচালনায় নায়কপদ দেশ কাহাকে দিবে তাহা এখনো স্থির হয় নাই, কিন্তু তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য নহে। বর্তমান লেখকের মনে সন্দেহ নাই যে, এই শিক্ষাব্যাপারের কাণ্ডারীপদ হইতে যদি কোনো কারণে গুরুদাসবাবু অবসর গ্রহণ করেন, তবে ইহার উপর হইতে দেশের শ্রদ্ধা চলিয়া যাইবে।

নূতন বিদ্যালয়ের প্রবর্তনব্যাপারে গুরুদাসবাবুকে প্রধান স্থান দিবার নানা কারণ আছে। তাহার মধ্যে একটি গুরুতর কারণ এই যে, দেশের বর্তমান আন্দোলনব্যাপারে তাঁহাকে একেবারে অভিভূত করিতে পারে নাই; তিনি এই আন্দোলনের সুবিধাটুকুর প্রতি লক্ষ রাখিয়া ইহার আঘাতের প্রতি অমনোযোগী হইবেন না। কোটালের জোয়ারে নৌকাকে কেবল অগ্রসর করে তাহা নহে, ডুবাইতেও পারে। প্রবল জোয়ারের বেগ হইতে আত্মরক্ষার জন্য সবলে হাল বাগাইয়া ধরা চাই। ভাসিয়া যাওয়াই লক্ষ্য নহে, গম্যস্থানে পৌঁছানোই লক্ষ্য, আন্দোলনের উত্তেজনায় এ কথা আমরা বারংবার ভুলিয়া থাকি। আপাতত কর্তৃপক্ষের প্রতি স্পর্ধা প্রকাশ করিয়া আমাদের ক্ষুব্ধ হৃদয়ের তৃপ্তি হইতে পারে; কিন্তু কার্যসিদ্ধিতেই আমাদের চিরন্তন কল্যাণ এ কথা যাঁহারা এক মুহূর্ত ভোলেন না দেশের সংকটের সময় তাঁহাদের হাতেই হাল ছাড়িয়া দিতে হয়। যখন রাগের মাথায় সর্বস্ব খোয়াইয়া মকদ্দমা জিতিবারই জেদ জন্মায়, তখনই শান্তচিত্ত প্রবীণ অভিভাবকের প্রয়োজন। সম্প্রতি আমরা সমস্ত স্বীকার করিয়া স্পর্ধা প্রকাশ করাকেই আমাদের চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করিতেছি, এমন অবস্থায় যদি দেশের কোনো স্থায়ী মঙ্গলকর কর্মকে সফলতার দিকে লইয়া যাইতে হয়, তবে গুরুদাসবাবুর মতো লোকের প্রয়োজন। স্পর্ধা প্রকাশের জন্য সভা উত্তম, সংবাদপত্রও উত্তম, কিন্তু জাতীয় বিদ্যালয় নৈব নৈব চ।

যাহাই হউক, আমাদের সংকল্পিত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে অথবা তাহা ভাঙিয়া চুরিয়া যাইবে তাহা জানি না। যদি দেশ যথার্থভাবে এ কাজের জন্য প্রস্তুত না হইয়া থাকে, যদি আমরা এক উদ্দেশ্য করিয়া আর-একটা জিনিস গড়িবার আয়োজন করিয়া থাকি, তবে আমাদের জল্পনা-কল্পনা বৃথা হইয়া যাইবে। সেজন্য ক্ষোভ করা বৃথা। ইহা নিঃসন্দেহ, দেশ যদি বাঁচিতে চায়, তবে আজ না হউক কাল পুনরায় এ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে। এখন যদি আমাদের আয়োজন পণ্ডা হয়, তবে যথাকালে ভবিষ্যৎ উদ্যোগের সময় এই প্রয়াসের ইতিহাস শিক্ষাপ্রদ হইবে।